সেই অজানার খোঁজে

দ্বিতীয় খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ সন

শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া

ব্লক
মডার্ণ প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯ ।

সেই অজানার খোঁজে

১

কলম হাতে নিয়ে অনুভব করছিলাম পাঠকের কাছে লেখক কতটা দায়বদ্ধ। হাওড়া থেকে হরিদ্বারের দীর্ঘ পথ-যাত্রায় যে মানুষটিকে আবিষ্কারের আনন্দে তাঁকে পাঠকের সামনে হাজির করেছিলাম সেই গৃহী তান্ত্রিকসাধক কালী-কিংকর অবধূত শত সহস্রজনের হৃদয়ের অন্তঃপুরে এ-ভাবে পৌঁছুবেন আমি ভাবি নি। এই মানুষকে নিয়ে তাঁদের এখন অনেক প্রশ্ন অনেক কৌতূহল অনেক দাবি। তাঁর সকাশে উপস্থিত হবার আশ্চর্য তাগিদ। এই তাগিদের স্রোত ব্যাহত করার অধিকার আমার নেই জেনেও চুপ করে ছিলাম। আর অসহায় বোধ করছিলাম। তাঁদের শত শত চিঠির উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকাটা তৃষ্ণার জলের হদিস দিয়েও উৎসটিকে গোপন করে রাখার মতো।

···কলকাতার বে-সরকারি কলেজের এক অতি সাধারণ মাস্টারের ছেলের এমন বিচিত্র জীবনে পা ফেলার ইতিবৃত্ত অনুসরণ করে প্রৌঢ় প্রহরে দেব-ভূমি তারকেশ্বরে তাঁর জীবনের যে অত্যাশ্চর্য নাটকটি আমার সামনেই পরি-ণতির মোহনায় এসে সম্পূর্ণ হয়েছিল—তারপর কোন্নগরের বাড়িতে এসে যে-কথাগুলো আমার কথার জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমার বুকের তলায় তা সোনার অক্ষরে খোদাই হয়ে গেছল।

···আমি বলেছিলাম, আমাকে একটু পথ দেখান।

তার একটু আগে অবধূতের প্রায় অক্ষয়-যৌবনা গৃহিণী কল্যাণী দেবীর মুখে সংশয়-শূন্য ঈশ্বর-বিশ্বাসের এক অনির্বচনীয় রূপ দেখেছিলাম। সহজ দ্বিধাশূন্য গলায় সেদিন তিনি বলেছিলেন, যা ঘটে, কেউ কেউ ভাবতে পারেন তার পিছনে তাঁর বাহাদুরি আছে (কটাক্ষ স্বামীর প্রতি), কিন্তু যিনি ঘটালেন আর ঘটনার শেষ করলেন, তিনি হাসেন।

কল্যাণী দেবী ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরে আমার ওই আরজি।

মনে আছে, পেটো কার্তিক তার বাবার পা টিপছিল আর হাঁ করে তাঁর শ্রীমুখ দেখছিল। আয়েস করে মাংসের বড়া তল করে ড্রিঙ্ক-এর গেলাসে

একটা বড় চুমুক দিয়ে অবধূত ফিরে প্রশ্ন করেছিলেন, তার মানে ? কি পথ ?

আমি বলেছিলাম, বিশ্বাসের পথ, শান্তির পথ।

অবধূত চুপচাপ চেয়েছিলেন একটু। বলেছিলেন, শান্তি জিনিসটা যার যার মনের কাঠামোর ওপর নির্ভর করে···কিন্তু আপনি কোন্ বিশ্বাসের কথা বলছেন ?

বলেছিলাম, আপনাদের যা বিশ্বাস। ঈশ্বরে বিশ্বাস।

শুনে আবার খানিক চেয়েছিলেন। তারপর হেসেছিলেন। বলেছিলেন, শুনুন, আমার স্ত্রীকে দেখে আমার বিচার করবেন না। আমার মতো টানা-পোড়েনের মধ্যে দুনিয়ায় কতজন আছে জানি না।···অনেকে চোখ বুজে বিশ্বাস করে ঈশ্বর আছে। অনেকে চোখ বুজে অবিশ্বাস করে ঈশ্বর নেই, কিন্তু ঈশ্বর আছে কি নেই এই সন্ধান কতজনে করে ?

এই কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সেই রাতে আমার মনে হয়েছিল অবধূতের দু'চোখ কোথায় কোন্ দূরে উধাও। গলার স্বর আরো গভীর। নিজেই সে-কথার জবাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি করি। করছি।···ঘটনার সাজ দেখে দেখে প্রশ্ন করি, কে ঘটায় ? কেন ঘটে ? কে সাজায় ? কে করে ? জবাব পাই না।···আমি খোঁজ করছি। খুঁজে যাচ্ছি। ঈশ্বর আছে কি নেই আমি জানি না।

···একজনের জীবন-মহিমার বিচিত্র পথে বিচরণের ইতিবৃত্ত নয়, দ্বার-ভাঙার কাঁকুরঘাটির মেয়ে পার্বতী প্রসাদের সদ্য-জাত হারানো সন্তানকে পাঁচ বছর বাদে ফিরে পাওয়ার রোমহর্ষক প্রহসনও নয়—এই-সব রোমাঞ্চকর ঘটনার নিয়ামক হিসেবে অগণিত ভক্তজন যাঁকে ঈশ্বরের এক জাগ্রত অংশ বলে জানে, বিশ্বাস করে—স্বয়ং সেই মানুষই এমন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, এমন খবর কি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার মতোই হৃদয়ের সম্পদ নয় ? শুধু এটুকু মনে রেখেই বিগত প্রসাদ পূজা-বার্ষিকীতে সেই অজানার খোঁজে রূপায়ণের ভিতর দিয়ে অবধূতকে এই জিজ্ঞাসার জীবন-দর্শনে এনে কাহিনীর যবনিকা টেনে দিয়েছিলাম।

·· পাঠকের কাছে দায়বদ্ধ লেখকের সেই যবনিকা আর একদফা তুলতে

হবে ভাবি নি।

কিন্তু ভাবা উচিত ছিল। কলকাতায় ফেরার আগে ঠাট্টার ছলে অবধূত যা বলেছিলেন তাতে হোঁচট একটু খেয়েছিলাম বইকি। আলতো করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এতদিনে লেখার মতো জমজমাট কিছু রসদ পেলেন ভাবছেন বোধহয়?

আমার উদ্দেশ্য তিনি অনেক দিনই বুঝেছেন। হরিদ্বার থেকে ফেরার পরেও দেড় বছর ধরে সঙ্গ করছি, তাঁর মতো চতুর মানুষের আমার লক্ষ্য কি তা না বোঝার কথা নয়। তারকেশ্বরে বসে এ-নিয়ে তিনি ঠাট্টাও করেছিলেন, নিঃস্বার্থ উপকার করা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আপনার লেখা যখন ছাপার অক্ষরে বই হয়ে বেরুবে আমাকে কি তার রয়েলটির ভাগ দেবেন?

অর্থাৎ, এক বছরের ওপর ধরে আমার মগজে যে রূপ আকার নিচ্ছে তা তিনি ভালোই জানতেন।

প্রশ্নটা শুনে একটু খটকা লেগেছিল, জিগ্যেস করেছিলাম, কেন বলুন তো, আপনার আপত্তি আছে?

তাঁর সকৌতুক জবাব, না, আমার আর আপত্তি কি। তবে, রহু ধৈর্যং··· আমার পরামর্শ যদি শোনেন কিছুকাল অপেক্ষা করুন, নইলে মুশকিলে পড়ে যেতে পারেন।

বিদায় নেবার আগে কল্যাণীও সামনে ছিলেন। মুশকিল কি হতে পারে ভেবে না পেয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম।—কিছু বুঝতে পারছেন?

হেসে জবাব দিয়েছেন, ওঁর কথা সব-সময় বুঝিও না, তা নিয়ে ভাবি ও না। তবে ওঁর অনেক বাজে কথা অনেক সময় ফলে যেতে দেখেছি, বলছেন যখন কিছুদিন অপেক্ষাই করুন।

অবধূতের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিছুদিন অপেক্ষা করব বলতে কতদিন?

তিনি স্মিত মুখেই জবাব দিয়েছিলেন, আমি তো কিছুদিন বলি নি, কিছু-কাল বলেছি···

শুনে একটু হতাশ আমি।—এখনই তো মুশকিলে ফেললেন দেখছি, তবু কতকাল ?

—এই ধরুন যখন আমি আর কল্যাণী থাকব না।

মুখের ওই হাসি দেখে আমার ভিতরটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। কাল-নির্দেশ আরো অহিষ্ণুতার কারণ। সঙ্গে সঙ্গে আমার তির্যক প্রশ্ন, কাল রাতে বললেন আপনি সন্ধানী, খোঁজ করছেন—কিন্তু এখন তো দেখি বেশ সর্বজ্ঞ ভবিষ্যতদ্রষ্টার মতো কথা বলছেন—আপনি আমার থেকে তিন বছরের বড় আর কল্যাণী আমার থেকে ছ'বছরের ছোট—আপনারা দুজনে না থাকার পরেও আমি থাকব এমন গ্যারান্টি দিচ্ছেন কি করে ?

—যাঃ কলা! জোরেই হেসে উঠেছিলেন।—একটা সহজ কথারও কি-ভাবে অন্য অর্থ হয়ে যায় দেখুন, যখন থাকব না মানে কি মরে যাওয়া! ধরুন, আপনি লেখা থেকে রিটায়ার করলেন, তার মানে কি আপনি মরে গেলেন ? তখন নেই মানে আপনি আর কর্মের মধ্যে নেই—

তাতেও আমি বিরত হই নি।—আপনার বা কল্যাণীর শিগগীরই সেই-রকম না থাকার অবস্থা আসছে ভাবছেন ?

জবাবে হাসি মুখে অবধূত স্ত্রীর দিকেই ঘুরে তাকিয়েছিলেন।—কি গো, আমি তোমার কোন্ হুকুমের দাস আর কি-জন্যে এখনো আমাদের বেশ কিছুদিন এখানে পড়ে থাকা—ভদ্রলোককে বলে দেব নাকি ?

—থাক, আর বলতে হবে না, সব-সময়ে আমাকে কর্ত্রী বানিয়ে বাহাদুরি!

আগেও দেখেছি এ-রকম মুখ-ঝামটা অবধূত ভারী প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন। আমারও ভিতরটা যে প্রসন্ন হয়ে ওঠে অস্বীকার করি কি করে। কল্যাণীর বয়েস এখন বাহান্ন। কিন্তু দেহশ্রী আর সুঠাম স্বাস্থ্য এখনো বত্রিশের জাদু-কাঠামোয় বন্দী। আমার বিবেচনায় এ-ও রমণীর এক দুর্লভ যোগ-বিভূতির মহিমা। তাঁকে ছেড়ে দুচোখ আবার অবধূতের মুখের ওপরেই সন্ধানী হয়ে উঠেছিল। জিগেস করেছিলাম, এই সৎপরামর্শ কেন, কি-রকম মুশকিলে পড়ার কথা বলছেন ?

আবারও হেসে উঠেছিলেন।—আপনি অল্পেতে ঘাবড়েও যান দেখছি, সে-রকম কিছু না। আচ্ছা আমার একটা কথার জবাব দিন, ভাবলে তার

মধ্যেই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। আপনি তো কত চরিত্র দেখেছেন, কত রকমের মানুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, আজ পর্যন্ত এমন একটি মানুষ দেখেছেন যে প্রাণের আনন্দ থেকে বলে, পরম শান্তিতে আছি, কোনো খেদ নেই, কোনো ক্ষোভ নেই, দুঃখ জমা দেবার মতো শোক জমা দেবার মতো কোনো আশ্রয়ের দরকার নেই—দেখেছেন এমন একজনও ?

জানি দেখি নি। তবু নিরীহ মুখ করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনাদের দু'জনকে ছাড়া ?

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি। এমন হাসি, যে কল্যাণী দেবীও হাসি মুখে ভুরু কুঁচকে বলে উঠেছিলেন, বাবারে বাবা, হাসি শুনলে কাক-চিলেও ভয়ে পালায় !

হাসি থামিয়ে শেষে উনি বলে উঠেছিলেন, এতদিন ধরে এত দেখাশোনা বোঝার পর আপনার মুখে এই কথা ! আরে মশাই আমাদের দুজনের একজন তো সেই ষোল বছর বয়েস থেকেই তার খেদ ক্ষোভ শোক দুঃখ তার শিবঠাকুর কংকালমালী ভৈরবের ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে বসে আছেন, উপপতি ছেড়ে এখন তার পতির ঘরে যাবার জন্য হাঁসফাঁস দশাখানা এই মুখ দেখে আপনি বুঝবেন কি করে ? নেহাত ওই পতিটিরই আর এক চক্রান্তের কলে আটকে গেছে তাই··· ।

কল্যাণীর আবির গোলা মুখ, সঙ্গে উষ্ণ মন্তব্য, জিভের যদি একটুও লাগাম থাকত—

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হাসিমুখে আমার দিকে ফিরে অবধূত বলেছিলেন, আর ভক্তজনের দেওয়া আধা-ঈশ্বরের খোলস পরে এই হতভাগা কি টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়ে আছে সে-তো কাল রাতেই বললাম আপনাকে !

এই বিগত প্রসঙ্গ আটাত্তর সালের শেষের দিকের। এর পরেও দীর্ঘ চার বছরের ওপর অর্থাৎ তিরাশি সালের গোড়ার দিকে পর্যন্ত এই দম্পতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ঘনিষ্ঠ যোগ বলতে খুব ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হতো এমন নয়। চোখের যোগ থেকে মনের যোগ বেশি ছিল। পরস্পরের খবরাখবর রাখতাম। পেটো কার্তিকের যাতায়াতের ফলে সেটা আরো

সহজ হতো। পেটো কার্তিক আবার অনেকসময় তার বাবা অথবা মাতাজীর ওপর রাগ করেও আমার এখানে চলে আসত। লক্ষ্য করে দেখেছি মাতাজীর থেকেও তার বাবার ওপর অভিমান একটু বেশি। বলে মাতাজীর হলো গিয়ে অধ্যাত্ম তেজের ঘর, অনেক কঠিন ব্যাপার, ভয়ে নাক গলাইনে। আর বাবা হলেন গিয়ে একখানা সূর্যের মতো, ছোট-বড় সক্কলকে কিরণ দিচ্ছেন। আমাদের সুখ-দুঃখের শরিক—সকলে সেইজন্য বাবার থেকে সুবিধেও বেশি নেয়।

একবার হঠাৎ এক সন্ধ্যায় চলে আসতে মুখ দেখেই মনে হয়েছিল রাগের ব্যাপার ঘটেছে কিছু। খবর জিজ্ঞেস করতে মুখের ওপর জবাব, আমার কি কারো ভালো মন্দের খবর রাখার অধিকার আছে ?

পরে শুনলাম একশ দুই জ্বর নিয়েও বাবা গত মঙ্গলবার শ্মশানে গেছেন। এমনিতে যেতেন না, কার কি ক্রিয়া-কাজ করার কথা ছিল। সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, পরের শনি বা মঙ্গলবারে করলেও হতো। কিন্তু সেই লোক ঠিক সন্ধ্যায় এসে হাজির। দোষের মধ্যে বাবার খুব জ্বর বলে পেটো কার্তিক তাকে হটিয়ে দিয়েছিল। সে-ব্যাটা এমনি ত্যাঁদড় যে বাড়ি ফিরেই বাবাকে ফোন। বাবা ফের তাকে আসতে বলে শ্মশানে যাবার জন্যে তৈরি হলেন, আর জ্বরের জন্যে হোক বা যে-জন্যে হোক খুব রেগে গিয়ে মাতাজীকে হুকুম করলেন, পেটোকে কান ধরে এখানে নিয়ে এসো। বাবা হঠাৎ-হঠাৎ বেশ রেগে যান বটে, কিন্তু ঠাট্টা করা ছাড়া কানটান ধরার কথা কখনো বলেন না। ডাকতে এসে মাতাজীই ইশারায় তাকে বুঝিয়ে দিলেন বাবা দারুণ রেগে আছে। পেটো আর ধারে কাছে থাকে; সোজা সটকান। বাবা রাগেন কমই আর রাগ জল হতে সময়ও লাগে না। শ্মশানের ক্রিয়াকাজ সেরে রাত চারটেয় বাড়ি ফিরেছেন। পেটো স্বপ্নেও ভাবে নি পরদিন পর্যন্ত বাবার মাথায় রাগ চড়ে থাকতে পারে। সকালে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই প্রথম কথা, ফের এ-রকম হলে তোকে নিয়ে আর আমার পোষাবে না, তোকে নিজের রাস্তা দেখতে হবে।

বলতে বলতে দুঃখে অভিমানে পেটো কার্তিক কেঁদে ফেলেছিল।—বলুন তো, এতদিন বাদে আমাকে কিনা এই কথা ! কুকুরেরও তো তার মনিবের

ভালো-মন্দ দেখার অধিকার আছে—আমি কি কুকুরের অধম। যাক, দু'চারটে দিন আপনার এখানেই পড়ে থাকব, দয়া করে চাট্টি করে খেতে দেবেন, তার মধ্যে নিজের ব্যবস্থা কিছু করতে পারি ভালো, না পারলে যে-দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব—

আমি কেবল শুধিয়েছিলাম, এখানে যে এসেছ বাড়িতে বলে এসেছ?

—আমার কে আছে যে বলে আসব, টাকা পয়সা যা আমার কাছে ছিল পুঁটলি করে মাতাজীর ঘরের তাকের ওপর রেখে এসেছি।

রাতে আর কিছু বোঝাতে চেষ্টা করি নি, তাতে কেবল গোঁ আর অভিমান বাড়বে।

অবধূতের কোন্নগরের বাড়িতে ফোন এসেছে, কিন্তু এতদিনের মধ্যে বার পাঁচেকও সে-ফোন ধরতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। ধৈর্যও থাকে না। একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, শেষ হতে রাত বারোটা। ভাবলাম এ-সময় একবার চেষ্টা করে দেখা যাক যদি পেয়ে যাই। ভদ্রলোকের জ্বর শুনেছি, তার ওপর পেটো যা বলছে একটু ভাবনার কথাই। ও-বাড়ির রাত বারোটা কিছুই না। কল্যাণী দেবী শুনেছি এখন তাঁর মায়ের মতোই রাতে দু-আড়াই ঘণ্টার বেশি ঘুমোন না, আর অবধূতের তো ঘুমের ব্যাঘাত বলে কোনো কথাই নেই।

অত রাত বলেই হয়তো চট করে পেয়ে গেলাম। উনিই ধরলেন। জিজ্ঞেস করেছি, খুব জ্বর নিয়ে শ্মশানে গেছিলেন শুনলাম, এখন কেমন?

জবাবে হা-হা হাসি।—ভালো আছি, এত রাতে আমার শরীরের জন্য চিন্তা না কার্তিকের জন্য?

ভণিতা বাদ দিয়ে আমাকে কার্তিকের মতলব বলতেই হয়েছে।—ও দু'চারদিন আমার এখানে থেকে নিজের ব্যবস্থা দেখবে, আর ব্যবস্থা কিছু না হলে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে বলছে।

আবারও হাসি।—আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন, দু'চারদিন ছেড়ে কাল সকালেই দেখুন কি করে।

দেখেছি। সকালে চা জলখাবারের সময়েই তার উসখুস ভাব। আমার প্রস্তাব, চলো তোমাকে নিয়ে একটু বাজারে ঘুরে আসি, আছ যখন বাজারে

ভালো-মন্দ কি পাওয়া যায় দেখি—

আমতা-আমতা মুখ।—আমি ভাবছি সার রোদ চড়ার আগে চলেই যাই···

অবাক-ভাব দেখাতেই হয়।—কোথায় ?

রাগত জবাব।—কোথায় আর, কোন্নগর ছাড়া আমার যাবার আর কোন্ চুলো আছে ? মাথাটা একেবারে চিবিয়ে খেয়ে দিয়েছেন সার—বুঝলেন ? যাকে বলে ব্রেন ওয়াশিং, এত আরামে শুয়েও কাল সমস্তটা রাত ভালো ঘুম হলো না—সেই আগেরদিন হলে এই ব্রেন কেবল জ্বলত, আর এখন কিনা কেবল মনে হচ্ছে এ-ভাবে চলে এসে ডবল অন্যায় করলাম। যাই হোক, আপনি ফাঁক-মতো বাবাকে একটু সমঝে দেবেন সার, আমার সঙ্গে এমন ব্যাভার করলে কোন্‌দিন নিজের গলায় ব্লেড দিয়ে বসব !

আমার নিরীহ গোছের পরামর্শ, তুমি নিজেও তো বলতে পারো···

—পারি বই কি, মওকা পেলে আমি কিছু বলতে ছাড়ি ! নিজেই তো দেখেছেন, বাবার তখন সমস্ত মুখ যেন হাসিতে গলে গলে যায়।

ও চলে যাবার পর গত রাতে অবধূতের গলার প্রত্যয়ের সুরটুকু আবার মনে পড়েছে। বলেছিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন, দু'চার দিন ছেড়ে কাল সকালেই দেখুন ও কি করে।

আর পেটো কার্তিক সম্পর্কে সেই পুরনো কথাই আবার মনে হয়েছে। আজকের এই কার্তিক নয়, পাঁচ বছর আগে যা ছিল অমন হাজার হাজার বেকার বোমাবাজ পেটো কার্তিক শহর শহরতলী আর মফঃস্বল শহরে ছড়িয়ে আছে। ধরে ধরে এদের সক্কলকে যদি অবধূতের কাছে পাঠানো যেত !···সেবারে তারকেশ্বরে যাবার সময়েও ট্রেনে দেখেছি অভাবী খেটে খাওয়া মানুষের জন্য ওর বুকের তলায় কত দরদ। বিনা প্রয়োজনে ট্রেনের হকারদের কাছ থেকে এটা কিনছে ওটা কিনছে, তারপর ট্রেন থেকে নেমেই সব বিলিয়ে দিচ্ছে। যারা বেচল তারা খুশি, যারা পেল তারাও খুশি।

প্রসঙ্গ থেকে দূরে এসেছি। আগেই বলেছিলাম, প্রাসঙ্গিক ঘটনার ভিতর দিয়ে কালীকিংকর অবধূতের জীবন-দর্শন আর জীবন-জিজ্ঞাসা আমার অনুভবগোচর হয়েছিল সেই আটাত্তর সালে। তারপর যতবার লিখব বলে

মন স্থির করে বসতে চেষ্টা করেছি ততবার অবধূতের হাসি-ছোঁয়া সতর্ক-বাণী একটা বাধার মতো উঠেছে। উনি বলেছিলেন, রহু ধৈর্যং, আমার পরামর্শ যদি শোনেন কিছু-কাল অপেক্ষা করুন, নইলে মুশকিলে পড়ে যেতে পারেন।

কি মুশকিল আমি ভেবে পাই নি। কিন্তু ওই পলকা নিষেধেও হয়তো কান দিতাম না যদি না কল্যাণী বলতেন, ওঁর অনেক বাজে কথা অনেক সময় ফলে যেতে দেখেছি, বলছেন যখন কিছুদিন অপেক্ষাই করুন।

…কালীকিংকর অবধূতকে নিয়ে 'সেই অজানার খোঁজে' কাহিনী বিস্তারে নেমেছি আরো দীর্ঘ দিন পরে—পঁচাশি সালের প্রসাদ পূজা বার্ষিকীতে। আমার বিবেচনায় আর অপেক্ষা করার মতো কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। অবধূতের সেই হাসি-ছোঁয়া সতর্ক বাণী আর কোনোরকম বাধা হয়ে ওঠে নি। ততদিনে অর্থাৎ তিরাশি সালের শুরু পর্যন্ত ওই একটি পুরুষ আর একটি রমণীর জীবনের অনেক অতীত অধ্যায় আমার কাছে অনাবৃত হয়েছে। নতুন ঘটনার সংযোজনও কম দেখি নি। রমণীটি অর্থাৎ কল্যাণীর ভিতরের সঠিক রূপটি আজও বোধহয় আমি নিজের বিচার-বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে আসতে পারি নি। অনেক সময় মনে হয়েছে পেটো কার্তিকের কথাই ঠিক।…বলেছিল, মাতাজীর হলো গিয়ে আধ্যাত্ম তেজের ঘর, অনেক কঠিন ব্যাপার। আর বাবা হলেন গিয়ে একখানা সূর্যের মতো, ছোট-বড় সক্কলকে কিরণ দিচ্ছেন—আমাদের সুখ-দুঃখের শরিক।…হ্যাঁ, পরের অধ্যায়ে মাতাজী কল্যাণীর অধ্যাত্ম তেজের কিছু হদিশ আমিও পেয়েছি বইকি। কিন্তু 'সেই অজানার খোঁজে' লিখতে বসে আমি কেবল আমাদের সুখ দুঃখের শরিক কালীকিংকরের দর্শন আর জিজ্ঞাসার চিত্রটাতেই মনোনিবেশ করেছিলাম। অর্থাৎ সেই আটাত্তর সালের পরের কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতা সেই অধ্যায়ে টেনে আনি নি। কারণ আগেও বলেছি।…রোমাঞ্চকর সব ঘটনার নিয়ামক হিসেবে অগণিত ভক্তজন যাঁকে ঈশ্বরের এক জাগ্রত অংশ বলে জানে, বিশ্বাস করে—স্বয়ং যেই মানুষই এমন সন্ধান-অভিসারী, যিনি বলেন, ঈশ্বর আছে কি নেই আমি জানি না, আমি খোঁজ করছি, খুঁজে যাচ্ছি। শুধু এটুকু মনে রেখেই 'সেই

অজানা'র খোঁজের কাহিনী বিস্তার করেছিলাম। শুধু এই খবরটুকু মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার মতো সম্পদ ভেবেছিলাম।

কিন্তু পৌঁছে দেবার পর কি হলো?

প্রশ্ন প্রশ্ন প্রশ্ন প্রশ্ন।

ফোন-গাইড থেকে আমার ঠিকানা বার করে, পাবলিশার আর প্রসাদ পত্রিকা থেকে ঠিকানার হদিস নিয়ে, অথবা লোকমুখে জেনে নিয়ে কেবল প্রশ্ন আর প্রশ্ন, প্রশ্ন আর প্রশ্ন।—কালীকিংকর অবধূত কোথায়? কল্যাণী মাতাজী কোথায়? আমরা বড় বিপন্ন, অবধূতজীকে আমাদের বড় দরকার। কল্যাণী মাতাজীকে যে আমাদের বড় দরকার। কোন্নগর চষেও তাঁদের হদিস পাচ্ছি না কেন? বাড়ির হদিস পেলেও সেটা শূন্য ভাঙা-চোরা অবস্থায় পড়ে আছে কেন? অথচ তাঁরা যে নেই এমন কথাও তো কেউ বলছেন না! বরং বলছেন, আছেন কোথাও—ওই লেখকের কাছেই খোঁজ করুন, মনে হয় একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন।

প্রশ্নবাণে আমি জর্জরিত। আকুতি দেখে আমি দিশেহারা। চিঠির জবাব না পেয়ে তাঁদের অনেকে বাড়িতে এসে হানা দিয়েছেন। ত্রিবেণী শ্রীরামপুর নদীয়া মুর্শিদাবাদ বহরমপুর এমন কি বারাণসী লক্ষ্ণৌ হরিদ্বার থেকে পর্যন্ত এক-একটি দম্পতি ছুটে এসেছেন। সকলের মুখেই এক কথা এক আকুতি, অবধূতজী কোথায়? কেমন করে তাঁর সন্ধান পাব। তাঁকে যে বড় দরকার।

আমার বুকের তলায় কত যে মোচড় পড়েছে তার হিসেব দিতে পারব না।

তখনই অবধূতের সেই হাসি-ছোঁয়া নিষেধের সার বুঝেছি। কি মুশকিলে পড়ার কথা তিনি বলেছিলেন মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। তাঁর হালকা কথার সূত্র ধরে তখনো যদি একটু গভীরে ডুব দিতে পারতাম, ওই নিষেধের তাৎপর্য বোঝা তো জল-ভাত ব্যাপার ছিল! আর প্রকারান্তরে তিনি সেটা বলেও দিয়েছিলেন।...আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এই সৎ পরামর্শ কেন, কি-রকম মুশকিলে পড়ার কথা বলছেন? জবাবে তিনি হাসি মুখে ফিরে প্রশ্ন করেছিলেন, আজ পর্যন্ত এমন একটি মানুষ দেখেছেন যে প্রাণের আনন্দ থেকে বলে পরম শান্তিতে আছি, কোনো খেদ নেই

কোনো ক্ষোভ নেই, দুঃখ জমা দেবার মতো, শোক জমা দেবার মতো কোনো আশ্রয়ের দরকার নেই—দেখেছেন এমন একজনও ?

···হ্যাঁ রসিকতার ছলে এই মুশকিলে পড়ার কথাই অবধূত বলেছিলেন, আর মনে হয় কল্যাণীও সেটা বুঝেছিলেন। পরম শান্তিতে কেউ নেই। দুঃখ জমা দেবার মতো শোক জমা দেবার মতো কোনো আশ্রয়ের দরকার নেই এমন কেউ নেই। অন্যের কথা কেন, দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের যাদু-শক্তি ধরে, একমাত্র ছেলের জন্য সমস্ত ভারত ঘুরে এমন মানুষ তো একদিন আমি আর আমার স্ত্রীও খুঁজে বেড়িয়েছি! আমার সেই লেখা থেকে পাঠক সে-রকম শক্তিধর কোনো একজনের হদিস পেয়েছেন ভেবেছেন—সকলে না হোক, যাঁরা বিপন্ন, যাঁরা শোক দুঃখ বা সংকট জমা দেবার মতো আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁরা ভেবেছেন। কালীকিংকর অবধূতকে তাঁরা খুঁজছেন। এমন লোকের সংখ্যা যে কত আমার ধারণা ছিল না, কিন্তু অবধূতের ছিল।

এ-ভাবে বিপর্যস্ত হবার ফলে একটা চিন্তা আমার মাথায় এসেছিল। এত বছর ধরে আমাকে ওই লেখা থেকে বিরত রেখে অবধূত আমার মুশকিলে পড়া ঠেকিয়েছেন না নিজের গা বাঁচিয়েছেন ? কিন্তু পরে আরো ভেবে মনে হয়েছে ওটা নিজেরই বিমূঢ় চিন্তা। ওই মানুষ কোনোদিন ছলনার আশ্রয় নেন নি, যদি নিয়েও থাকেন সেটা তাঁর লোকের মঙ্গল করার কৌশল। পাঠকের মনে থাকতে পারে ট্রেনে হরিদ্বারের পথে তার অন্তর্দৃষ্টি দেখে আমরা যখন অনেকটাই অভিভূত, আর চৌদ্দ বছর দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে আমাদের একমাত্র ছেলে চলে গেছে শুনে তাঁর মুখখানাও যখন বিষণ্ণ গম্ভীর, আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার হাতে এলে আপনি কিছু করতে পারতেন ? সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাথা নেড়েছিলেন, বলেছিলেন, কিচ্ছু পারতাম না মা, কেউ পারত না।

···কল্যাণীর মা, তারাপীঠের ভৈরবী মা মহামায়ার শিক্ষাই অবধূতের পরবর্তী জীবনের সব থেকে বড় পুঁজি। ওই মায়ের কাছ থেকেই তাঁর দৃষ্টির সাধনা অধিগত। এই দৃষ্টি চালনার ভিতর দিয়ে মানুষের অন্তঃ-স্তলের অনেকটাই তাঁর চোখে ধরা পড়ে। রোগ ব্যাধি শুধু নয়, শোকতাপ

পরিতাপের ছায়াও তিনি দেখতে পান। কপাল আর লক্ষণ দেখেও অনেক কিছু নির্ভুল আঁচ করতে পারেন। হাত দেখা বা জ্যোতিষী বিদ্যাও ওই মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। আর সব থেকে বড় পাওয়া মায়ের আয়ুর্বেদ-নিষ্ঠ চিকিৎসাবিদ্যা। এই থেকে অবধূত নিজেও দ্রব্যগুণে বিশ্বাসী। লোকের মন আর মানসিকতা বুঝে তাঁকে তাবিচ-কবচও দিতে দেখেছি। এইসবের সঙ্গে অসাধারণ বুদ্ধি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নিষ্ঠা আর আত্মপ্রত্যয়ের যোগ ঘটলে যা হয়—কালীকিংকর অবধূত কেবল তাই। নিজে তিনি কোনোদিন অলৌকিকের পিছনে ছোটেন নি। কত সময় হেসে বলেছেন এ-সবের কোনো কিছুর মধ্যে অলৌকিকের ছিটে ফোঁটাও নেই—আমি যা পারি আর করি তার সবটাই শিক্ষা আর নিষ্ঠার সাধনার ফল, এই শিক্ষা আর নিষ্ঠা থাকলে ইচ্ছে করলে আপনিও পারেন—সকলেই পারে।

···কিন্তু মানুষ তাঁর কাছে যতটুকু পেয়েছে, বিশ্বাসে আর ভক্তিতে তাতেই তাঁকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী ধরে নিয়েছে। তারাই তাঁকে গড-ম্যানের আসনে বসিয়েছে। সেই গড-ম্যান নিজের গড খুঁজে বেড়াচ্ছেন, ঘটনার সাজ দেখে দেখে তাঁর প্রশ্ন, কেন ঘটে কে ঘটায়, কে সাজায় কে করে—এই বৈচিত্র্যটুকুর দাগ রেখে যাবার তাগিদেই কালীকিংকর অবধূতকে আমি পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছিলাম। সঙ্গে আমার না-বোঝা পেটো কার্তিকের ভাষায় তাঁর আধ্যাত্ম তেজের ঘরের স্থির-যৌবনা স্ত্রী কল্যাণীকেও। কারণ আমার বিবেচনায় একজনকে বাদ দিলে অন্যজন অসম্পূর্ণ।

···কিন্তু পাঠকও তাঁদের ভক্তজনের পথেই চলেছেন। শোক দুঃখ ভয় তাপ জমা দেবার জন্য তাঁদের খুঁজছেন। তাঁরাও তাঁদের গড-ম্যান গড-মাদারের আসনে বসিয়েছেন। দুজনের মধ্যে অলৌকিক শক্তির রূপ দেখেছেন। তাঁরা একেবারে মিথ্যে ভাবছেন এমন বলার ধৃষ্টতাও আমার নেই। কারণ, অলৌকিক না হোক যুক্তির বাইরে শক্তির রূপ পরে এঁদের মধ্যে আরো দেখেছি। যা-ই হোক, পাঠকের অন্বেষণ বা অনুসন্ধিৎসার আড়ালে রাখার মতো কালীকিংকর অবধূত মানুষটি আমার নিজস্ব সম্পদ নন। যে-পর্যন্ত আমি জানি সেই পর্যন্ত তাঁকে চেনা বা জানার সমান অধিকার তাঁদেরও। পাঠকের কাছে লেখক দায়-বদ্ধ। সেটা স্বীকার করেই অবধূতের

জীবনের আর একটি বিস্তৃত অধ্যায় (শেষ অধ্যায় কিনা জানি না) পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।
সেইসঙ্গে দিব্যাঙ্গনা স্থির-যৌবনা আধ্যাত্ম তেজের ঘরের মেয়ে কল্যাণী-কেও। কারণ, একজনকে ছেড়ে আর একজন যে কত অসম্পূর্ণ সেটা ততদিনে আমি ঢের বেশি অনুভব করতে পেরেছি।

২

সম্ভব হলে অথবা অবধূতের বাড়ি কোন্নগরে না হয়ে কলকাতায় হলে এক বুধবার বাদ দিয়ে রোজই আমি হয়তো তুই এক ঘণ্টার জন্য তাঁর ডেরায় গিয়ে বসে থাকতাম। বুধবার নয় কারণ সেদিন তিনি কোনো কেস নেন না। ওই একটা দিন সকালে তাঁর ওষুধের গাছগাছড়া শিকড়-বাকড় লতাপাতার স্তূপের মধ্যে বসে কাটে। আর তুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত কাটে ওষুধ তৈরির তদারকিতে। ভৈরবী মা মহামায়ার সেই যোগানদার লোকটি, যার নাম হারু, এ-ব্যাপারে সে-ই এখন অবধূতের ডানহাত। মা-ই বলে দিয়েছিলেন একে ছাড়িস না, তোর ওর তুজনেরই উপকার হবে। ছাড়েন নি। এই হারুরও এখন বয়েস হয়েছে, অবধূতের থেকে কিছু ছোট। কিন্তু দেহের বাঁধুনি দিব্বি শক্ত-পোক্ত এখনো। কোন্নগরে এসে বসবাসের শুরু থেকেই সে আছে। কাছাকাছির মধ্যে তার জন্যেও টালির ঘর তুলে দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় আসার ফলে গাছগাছড়া শেকড়-বাকড় লতাপাতা ফল-ফলাদি সংগ্রহের জন্য আর তাকে বনে-বাদাড়ে ঘুরতে হয় না। এখানে এ-সব কাঁচা মালের ব্যবসার অনেক ঘাঁটি আছে। হারুর অধীনে আবার ঝাড়াই বাছাইয়ের ঠিকে লোক আছে তুজন। এ ব্যাপারে তারও অভিজ্ঞ চোখ কম সজাগ নয়। এছাড়া ওষুধ তৈরির জন্য মাঝ-বয়সী কবিরাজ আছেন একজন। কিন্তু এখানে তাঁর বিদ্যে ফলাবার কোনো সুযোগ নেই। নির্দেশের নিক্তি মেপে তাঁকে কাজ করতে হয়। বুধবারটা অবধূতের এ-সবের তদারকিতেই কাটে। বাড়ির

পিছনের অঙিনার শেষ মাথায় বড়সড় আউট-হাউসটা তাঁর ল্যাবরেটারি। অবধূত প্রথম যেদিন আমাকে সেই ল্যাবরেটারি দেখাতে নিয়ে যান, কল্যাণী দেবী আলতো সুরে আমাকে সতর্ক করেছিলেন, ওই ল্যাবরেটারি থেকে হামেশা চেলা বিছেটিছেও বেরোয়, একটু সাবধানে দেখবেন।

বক্রেশ্বরে ভৈরবী মায়ের সব ওষুধের দাম ছিল শুনেছি চার আনা। এখানে সব ওষুধের দাম এক টাকা। এ-সম্বন্ধে অবধূত আর কল্যাণী দেবীর সামনেই পেটো কার্তিকের বিরস মন্তব্য শুনেছি, বাবার কি বিবেচনা বলুন তো, যে দিন পড়েছে, সব-কিছুর দাম বাড়ছে, ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কেবল বাবার ওষুধের দাম—লোকজনের মাইনে ধরলে বেশির ভাগ ওষুধেই এক টাকার বেশি খরচ পড়ে—যারা গরিব তারা না-হয় এক টাকাই দিল, কিন্তু নানা জায়গা থেকে গাড়ি ঘোড়া হাঁকিয়ে কত বড়লোকও তো আসে, তাদের কাছ থেকেও এক টাকা নেবার কি মানে হয়?

ওঁরা দুজনেই হাসছিলেন। হুল ফুটিয়ে অবধূত বলেছেন, ওষুধের দাম যা-ই হোক তুই যে লোকের ট্যাঁক বুঝে আরো ফী আদায় করিস?

পেটো কার্তিক লজ্জা পাওয়ার কারণ কল্যাণী দেবী ব্যক্ত করেছেন। পুরনো যারা তারা ওষুধের দামও জানে, যে-যার সাধ্য মতো প্রণামী কত দেবে তা-ও জানে। কিন্তু নতুন রোগীও তো হরদম আসে। কার্তিককেই তারা চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, ওষুধের দাম কত। কার্তিক তখন অম্লান বদনে ওষুধের এক টাকা দাম জানিয়ে বাবার প্রণামীর কথাটা বলে। বলে, ওষুধের কোনো দাম নেই, বিনে পয়সার ওষুধই বলতে পারেন। তারপর গরিব মনে হলে বলে, এক-টাকা দু'টাকা যা পারেন ভক্তিভরে বাবার পায়ে প্রণামী রেখে মনে মনে প্রার্থনা করে যান। মাঝারি অবস্থার লোক মনে হলে কার্তিক এক-টাকা দু'টাকাকে পাঁচ-টাকা দশ-টাকায় তুলে একই কথা বলে। আর বড় অবস্থার লোক মনে হলে প্রণামী অর্থাৎ টাকার অঙ্ক মোটে মুখেই আনে না। বলে, ওষুধের আবার দাম কি, ওই ওষুধের বাক্সে একটা টাকা ফেলে রেখে চলে যান—

গাড়ি হাঁকিয়ে যারা আসে এক টাকা শুনে স্বাভাবিক ভাবেই তারা

অবাক হয়। অনেকে সেই কাঠের বাক্সে এক টাকার জায়গায় দশ-বিশ টাকা ফেলতে যায়। কার্তিক তক্ষুনি হা-হা করে উঠে বাধা দেয়, ওষুধের ওই এক টাকাই দাম, তার বেশি এক টাকাও নয়, আর দিয়ে তৃপ্তি যদি পেতে চান যত খুশি বাবার পায়ে প্রণামী ফেলে যান - যা দেবেন সবই আবার বাবার মারফৎ দরিদ্রনারায়ণের কাছেই পৌঁছে যাবে।

দু'দশ টাকার জায়গায় তখন দু'শ পাঁচশও প্রণামী পড়তে দেখা যায়।

জব্দ হয়েও পেটো কার্তিক কটকট করে প্রতিবাদ জানাতে ছাড়ে না। আমাকেই সালিশ মানে, টাকা যা-ই আদায় করে দিই তার কতটুকু আমাদের ভোগে আসে জিজ্ঞেস করুন তো? বাবার সিগারেট আর ড্রিংক তো ভক্ত গৌরী সেনেরা জোগায়, মাতাজীর তো নিজেরই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দেওয়া ছাড়া নেওয়া নেই—ও-দিকে খোঁজ নিয়ে দেখুন বাবার নামে কোনো ব্যাঙ্কে পাঁচ টাকার অ্যাকাউন্টও নেই—তাহলে এত যে টাকা আসে সে-সব যায় কোথায়? ফি মাসে খরচের টাকা তুলতে মায়ের চেক ভাঙানোর জন্য আমাকে ব্যাঙ্কে যেতে হয় বুঝলেন—বাবার টাকার কোনো হিসেব নেই।

পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে 'সেই অজানার খোঁজে' প্রথম পর্বের কাহিনীতে বিয়ের আগে কল্যাণীর বিত্ত সম্পর্কে মোটামুটি কিছু হিসেব দাখিল করা হয়েছিল। তার বাবার কলকাতা আর রামপুরহাটের বিশাল বাড়ি আর জমি-জমা বিক্রি করে কল্যাণীর নামে ছ'লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ব্যাঙ্কে মজুত ছিল। সুদে আসলে সেই টাকা বেড়ে চলেছিল। আর বক্কো-মুনির থানের কংকালমালী ভৈরবের নির্দেশে তাঁর পুলিশ অফিসার শিষ্য মোহিনী ভট্চায সেই টাকা থেকে কিছু তুলে কোন্নগরের এই বাড়ি করে এখানে এঁদের স্থিতি করে দিয়ে গেছলেন। বাকি টাকা কল্যাণীর নামেই মজুত ছিল। সেই টাকার অঙ্ক এখন কতোয় দাঁড়িয়েছে আমার ধারণা নেই। পেটো কার্তিককে মাতাজী তাঁর বিত্তের হিসেব দিতে গেছেন বলে মনে হয় না, কিন্তু ব্যাঙ্কের কাজ-কর্ম তার মারফতই হয় যখন, তার মোটামুটি ধারণা থাকা স্বাভাবিক। তা নাহলে সে বলে কি করে মাতাজীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কিন্তু বাড়ির খরচ এখনো এই টাকা থেকেই আসে শুনে আমি

একটু অবাকই বটে। বলেছিলাম, এবারে আমি কার্তিকের দিকে, এত টাকা দিয়ে কি করেন হিসেব দিন—

অম্লান বদনে অবধূত জবাব দিয়েছেন, প্রণামীর টাকা সবই তো কার্তিকের পকেটে জমা পড়ে, ও তার মধ্যে কতটা ফাঁক করে আমি জানব কি করে?

—শুনলেন মা—বাবার কথা শুনলেন? আমি পাঁচটা টাকা সরালেও ওনার যেন জানতে বুঝতে বাকি থাকে! অভিমানাহত চাউনি আবার আমার দিকে।—চিনির বলদ চিনি খায় না চিনির বস্তাই কেবল টানে?

অবধূতের নিরাসক্ত টিপ্পনী, বেশি না হোক একটু একটু চিনি খাস সেটা স্বীকার কর্।

কার্তিকের অসহায় মুখ, যেন আমার সামনে চোর প্রতিপন্ন করা হচ্ছে তাকে।—মা, আপনি এখনো কিছু বলছেন না? বরাদ্দ হাত-খরচের এক পয়সাও বেশি নিই আমি?

কল্যাণী হাসছিলেন। উসকে দিয়েছেন।—তুই এত বোকা কেন, টাকাগুলো কোথা দিয়ে পাখা মেলে উড়ে যায় সে-হিসেব এঁকে দিয়ে দিলেই তো পারিস।

আমারও এ-টুকুই জানার কৌতূহল। এক হরিদ্বারে যাতায়াতের পথেই তো পায়ে হাজার কয়েক টাকা প্রণামী পড়তে দেখেছিলাম। আর এই দেড় দু'বছর ধরেও কম দেখছি না। এ-দিকে দামী সিগারেট আর মদের খরচ অন্যের ঘাড়ে, আর সংসারের খরচও শুনছি কল্যাণীর জমা টাকা থেকে। তাহলে টাকাগুলো যায় কোথায়!

স্ত্রীর কথা শুনেই অবধূত ব্যস্ত হয়ে বাধা দিয়েছেন, থাক, আর হিসেব দিতে হবে না, তোমার খাতিরে মেনেই নিলাম কার্তিক বরাদ্দ থেকে খুব বেশি টাকা হাপিস করে না—

আমার দিকে ঘুরে বসে কার্তিক পোড়া দাগের মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলেছে, মায়ের পরোয়ানা পেয়ে গেছি যখন বাবার টাকার হিসেব শুনুন তাহলে।...যদি কখনো শোনেন কারো যক্ষ্মা-টক্ষ্মা হয়েছে, হাসপাতালে সীট পাচ্ছে না, উপযুক্ত পথ্য পাচ্ছে না—এখানে কোন্নগরে বাবার ঠিকানা দিয়ে দেবেন, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যদি শোনেন কোনো

বিধবার ছেলে স্কুলে পড়তে পারছে না বা পরীক্ষার ফী দিতে পারছে না, তাকে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। বিশ তিরিশ চল্লিশ টাকা করে মাসে মাসে হাজার বারোশ' টাকা মনি-অর্ডার যায় কিনা এখানকার পোস্ট-অফিস থেকে সে-খবরও নিতে পারেন। যদি শোনেন টাকার জন্য কোনো গরিব ঘরের মেয়ের বিয়ে আটকে যাচ্ছে, চোখ বুজে তাকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন, ধার করে হলেও তার টাকা এসে যাবে—

অবধূত ধমকে উঠেছেন, তুই থামবি এখন। হাসি মুখে আমার দিকে ফিরেছেন, ভালো পাব্লিসিটি অফিসার জুটেছে আমার—

কার্তিক গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে, আরো কত রকমের লোককে এখানে পাঠাতে পারেন তার একটা ফুল লিস্ট আপনাকে সময় মতো দিয়ে দেব।

গটগট করে ঘর ছেড়ে প্রস্থান। আমি অন্য দুজনের কাকে ছেড়ে কাকে দেখি। অবধূতের কাঁচুমাঁচু মুখ। আর কল্যাণীর প্রসন্নসুন্দর মুখখানা দেখে সেই প্রথম আমার মনে হয়েছিল স্বামী নিয়ে তাঁর সব থেকে বড় গর্ব এই কারণেই।

হালকা সুরে অবধূত নিজেকেই নস্যাৎ করতে চেয়েছেন।—এক-দিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর মানুষ বড় সরল, বুঝলেন। চোখের ওপর ভাঁওতাবাজী দেখেও ওপর-ওপর যা দেখে তাই ধরে নিয়ে বসে থাকে। রামকৃষ্ণ ঠাকুর ফতোয়া দিলেন, কামিনী আর কাঞ্চন সব থেকে বড় বন্ধন, মন থেকে ত্যাগ করো। সেই ত্যাগের মহড়া কত সময়ে কত জনে দেখছে, কিন্তু মন থেকে হলো কিনা সেটা কত জনে জানছে? আঙুল দিয়ে স্ত্রীকে দেখিয়ে বললেন, ওই কামিনীর বন্ধন ত্যাগ করতে গিয়ে কতবার নাজেহাল হয়ে ফিরে এলাম সে-তো আপনিও জানেন, কিন্তু লোকে ভাবে, আ-হা, কি মুক্ত মনের অধিকারী—এমন দিব্যাঙ্গনা রূপসী স্ত্রীকে রেখে বিবাগী হয়ে কতবার ঘর ছাড়ল ঠিক নেই। ফিরে আসাটা কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে কিনা তা ওই উনিই সব থেকে ভালো জানেন, কিন্তু লোকের ভুল ভাঙাতে তাঁরও আপত্তি—

কল্যাণীর সমস্ত মুখ রাঙা। বলে উঠেছেন, নিজের সম্পর্কে তোমার এই ব্যাখ্যা কে শুনতে চেয়েছে?

—কেউ না, কেউ না—ভাঁওতাবাজীর জিতের মজাটাই এঁকে বলছি। আমার দিকে ফিরেছেন।—তারপর শুনুন, আর এক সর্বনেশে বন্ধন হলো গিয়ে কাঞ্চন। এখানেও ভাঁওতাবাজীর জিত এমন যে আমার স্ত্রীর কাছেও তা বড় আনন্দের ব্যাপার। কিনা, কাঞ্চনের মোহ নেই, টাকা যা পাই বিলিয়ে দিই। কিন্তু কোন্ জোরের ওপর তা করি সেটা কারো চোখে পড়ে না। একটা ছেলেপুলে নেই যে চিন্তা থাকবে, ওর (স্ত্রীকে দেখিয়ে) যা আছে পায়ের ওপর পা তুলে খেয়ে পরেও তার বেশিরভাগ পড়ে থাকবে—দেহ ছাড়লে পর টাকা ট্রান্সফার করা যায় এমন কোনো ব্যাঙ্কও অন্য জগতে নেই—এমন কি এখানশ্ার নেশা আর ভালো খাওয়া-দাওয়ার রসদও ভক্তরা জুটিয়ে দিচ্ছে, তাহলে আমি টাকা দিয়ে করব কি? লোকের টাকা লোককে বিলোচ্ছি, দাতাকর্ণ নাম হচ্ছে আমার—কাঞ্চন মোহমুক্ত মানুষ হয়ে বসে আছি—পৃথিবীটা কেমন মজার জায়গা ভাবুন একবার, সর্বত্র ভাঁওতাবাজীর জয়!

...এই ভাঁওতাবাজীর বিরাট এক জয়ের নজির আমি নিজের চোখে দেখেছি। প্রথমে বুঝি নি কেবল অবাক হয়েছি। পরে এই মানুষের কথা থেকেই বোঝা গেছে আক্ষরিক অর্থে সমস্ত ব্যাপারটা ভাঁওতাবাজীই বটে। কিন্তু সেটা জানা আর বোঝার পরেও এই মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়েছে।

ঘটনাটা বলি।

মন টানলে হঠাৎ এক-এক সময় যেমন এসে উপস্থিত হই তেমনি এসে গেছলাম। এই হঠাৎ আসার মধ্যেও দিন বাছাইয়ের ব্যাপার আছে। বুধবার বাদ কারণ গল্প করার সুবিধে থাকলেও সেদিন তাঁর মন পড়ে থাকে ওষুধ তৈরির দিকে। শনি মঙ্গলবারে আসি না কারণ রাতে সেই দুদিন তিনি শ্মশানে বসেন বলে বহু-রকমের আর্জি নিয়ে লোকে বিকেল পর্যন্ত তাঁর দ্বারস্থ হয়। রবিবারও বাদ কারণ লোকের ভিড়ে বেলা তিনটে-চারটের আগে সেদিন তাঁর খাওয়া-দাওয়ারও ফুরসৎ মেলে না। বিকেলের দিকে ওই একটা দিনই কোথাও না কোথাও তাঁর আবার সফরসূচীও থাকে। অ্যাপয়েন্টমেণ্ট অনুযায়ী কেউ না কেউ এসে ধরে নিয়ে যায়। তাই

আমার হঠাৎ-আসাটাও সোম বৃহস্পতি আর শুক্র এই তিনদিনের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা। সেই দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। দেড় মাসের মধ্যে দেখা হয় নি তাই মন টানছিল। বিকেলের আগেই চলে এসেছিলাম।

এলে খুশির অভ্যর্থনা পেয়ে থাকি। অবধূত অনেক আগন্তুককেই হতাশ করেন, অর্থাৎ দু'চার কথায় বিদায় করে দ্যান, অন্যদিন আসতে বলেন। সেদিন লক্ষ্য করলাম কথার ফাঁকে ফাঁকে অবধূত নিজের হাতঘড়ি দেখছেন। জিজ্ঞেস করলাম, কারো আসার কথা আছে নাকি ?

অবধূত হেসে জবাব দিলেন, বড়সড় এক বোয়ালমাছ জালে পড়ার কথা, দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে যাবে।

—তাহলে সরে পড়ি ?

সরে পড়বেন কেন, জাঁকিয়ে বসে মজা দেখুন, মৃত্যুর ছায়া সামনে দুলছে এমন কোটিপতি মানুষ ক'জন দেখেছেন ?

আমি উৎসুক।—আপনি সেই ছায়া সরাবেন ?

হাসিমুখে জবাব দিলেন, আমি কিছুই করব না, কিন্তু সরলে ক্রেডিটটা আমার হবে, আর তার ফলে ভদ্রলোকের কয়েক লাখ টাকার ভার কমবে।

কয়েক লাখ শুনে আমি থ। বাবার এ-ভাবে বলাটা পেটো কার্তিকের একটুও পছন্দ হলো না। হড়বড় করে বলে উঠল, বিশ্বাস করবেন না সার, বাঁচলে ভদ্রলোক বাবার জন্যেই বাঁচবে, গত মঙ্গলবার বাবা সমস্ত রাত ধরে শ্মশানে বসে ওই ভদ্রলোকের জন্য কাজ করেছেন—

অবধূত হালকা সুরে ধমকে উঠলেন, এখানে বসে কে তোকে সর্দারির বচন ঝাড়তে বলেছে, তোর 'স্যার' রাতে কি খেয়ে যাবেন সে ব্যবস্থা কিছু করেছিস ?

এর মধ্যে এক-প্রস্থ চা জল-খাবারের পর্ব শেষ হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম, না না, আমি সন্ধ্যার আগেই পালাব, আপনি আর এ হুজুগ তুলবেন না—

কিন্তু বাবার ইচ্ছে বুঝেই চেলাটি অন্তর্ধান করেছে। অবধূত বললেন, মোটে তো আসেন না আজকাল, ড্রাইভার সঙ্গে আছে একটু রাত হলেই

বা, আপনাকে দেখেই মনে পড়েছে একটা ভালো জিনিস মজুত আছে, তাছাড়া একখানা ঢাউস বোয়াল মাছ জালে পড়বে এমন মওকার দিনে এসে গেছেন যখন আপনাকে এখন ছাড়ি! সেলিব্রেট করার চোটে রাতে বাড়িতে যদি ফিরতে না-ই পারেন, একটা ফোন করে দিলেই তো হলো।

অগত্যা ঢাউস বোয়াল সম্পর্কে আমার কৌতূহল। ভদ্রলোক মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী। তেল ঘি মাখন চীজ ইত্যাদির মস্ত কারবার। তার গলার পাশে বাঁ-দিকের কাঁধ জুড়ে ক্যান্সার। বায়পসিতে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। তারপর থেকে চিকিৎসার উৎসব চলেছে। ডাক্তারদের শেষ কথা, অপারেশন করে দেখা যেতে পারে কতদূর ছড়িয়েছে, এ-ছাড়া আর কিছু করার নেই। আত্মীয় পরিজন শুধু নয়, রোগীও বুঝেছে বাঁচার আশা শতেকে একভাগও নেই। অপারেশনের ফলে মৃত্যু ত্বরান্বিত হতে পারে, এ ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না, রোগী আর তার আত্মীয় পরিজনদের এটাই বিশ্বাস। এখন দৈব নির্ভর। অবধূতের নাম শুনে তাঁর এখানে এসে হত্যা দিয়ে পড়েছে। কিছু যদি করতে পারেন তারা চিরকাল তাঁর হুকুমের দাস হয়ে থাকবে। ···ভদ্রলোক এসে তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়েছিল। অবধূত বললেন, মৃত্যুর থেকেও মৃত্যু-ভয় কত বেশি ভয়ংকর যদি দেখতেন—

ইনি দু'বার করে বলেছেন ঢাউস বোয়াল জালে পড়বে—আমি ভুলি নি। আমার ভিতরে একটা অবাঞ্ছিত সংশয়ের আঁচড় পড়েছে। মৃত্যু অবধারিত জেনেও কাউকে তিনি কোনোরকম স্বার্থের জালে জড়াতে পারেন এ আর আমি এখন কল্পনাও করতে পারি না। পেটো কার্তিকের মুখেও শুনেছি দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের আশা নিয়ে কত লোকই বাবার কাছে আসে, হাজার ছেড়ে লাখ টাকা খরচ করতে রাজি এমন পয়সাঅলা লোককেও এখানে এসে বাবার পা জড়িয়ে ধরতে দেখেছে। কিন্তু বাবা বিষণ্ণমুখে দু'হাত জোড় করে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে তাদের বিদায় করেছে। ফল কিছু হোক না হোক শেষ চেষ্টা হিসেবে যাগ-যজ্ঞ করার জন্যও কত লোক দশ-বিশ হাজার টাকা নিয়ে সাধাসাধি করেছে। কিন্তু কিছু করা সম্ভব নয় বুঝলে বাবা তাদের প্রার্থনার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, নিজেরা প্রার্থনা করুন আর চিকিৎসার অন্য রাস্তা আছে কিনা খুঁজুন—

পথ থেকে থাকলে তিনিই হদিস দেবেন, আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।
শুনে কত ভালো লেগেছিল আমিই জানি। কিন্তু এই লোকই কোটিপতি ক্যান্সার রোগী হাতে পেয়ে বোয়াল মাছ জালে পড়ার কথা বলছেন কেন ভেবে পেল্লাম না। সন্দেহ বড় বিচ্ছিরি জিনিস। কখন কোন্ ফাঁক দিয়ে হুল ফোটায়, আঁচড় কাটে বলা যায় না।
জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এই কোটিপতি ব্যবসায়ীর জন্য শ্মশানে গিয়ে বসেছিলেন ?
মুচকি হেসে জবাব দিলেন, বসেছিলাম।
—কিন্তু আপনি নিজেই তো বলেন অলৌকিক কিছুতে আপনি বিশ্বাস করেন না ?
—করি না তো।
—তাহলে এ ভদ্রলোককে জালে ফেলছেন কি করে ?
অবাক ভাব।—আমি ফেলছি আপনাকে কে বলল ! তার নিজের ভাগ্যই তাকে জালে টানবে মনে হচ্ছে। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, আমি অলৌকিকে বিশ্বাস করি না মানে কি ? মানুষের অঘটনকে ঘটিয়ে দেবার, বা ঘটনাকে অঘটনের দিকে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু তা বলে কি আমার বিদ্যা বুদ্ধির অগম্য কিছু কি ঘটছে না ? হামেশাই ঘটছে। সেটাকে অলৌকিক বলব কেন—এ-সবের পিছনে আমার অজানা কোনো সায়েন্স বা কোনো শক্তি কাজ করছে না, এ আমি জোর করে বলব কি করে ? আপনাকে তো বলেছি কেন ঘটে কে ঘটায় সেই খোঁজই আমি করে বেড়াচ্ছি !
অপ্রিয় কথাটা মুখে আপনিই এসে গেল।—তাহলে এই যে ভদ্রলোক আজ আপনার জালে পড়তে যাচ্ছেন সেটা আপনি ঘটাচ্ছেন না ?
হাসতে লাগলেন। তারপর বেশ মিষ্টি করে বললেন, আমাকে আপনি যে একটি ঠগ ভাবছেন সেটা আপনার চোখে মুখে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।··· কিন্তু আপনার দোষ নেই, লোকের হিতের জন্য মওকা বুঝে একটু-আধটু অ্যাকটিং তো আমাকে করতেই হয়—
গাড়ির শব্দ কানে আসতে থেমে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে

তাকালেন। ছুটো ঝকঝকে গাড়ি এসে বাঁশের গেটের সামনে দাঁড়ালো। একটা এয়ার কন্‌ডিশনড বিলিতি গাড়ি। অবধূত বললেন, এরপর আপনার খানিকক্ষণ কেবল নির্বাক দর্শকের ভূমিকা, হেসেটেসে ফেলে আমাকে ডোবাবেন না যেন—

মুহূর্তের মধ্যে মিষ্টিমুখে গাম্ভীর্যের মাধুর্য দেখলাম। এর কতটা খাঁটি কতটা মেকি বোঝা দায়। কয়েক মুহূর্তের আগের মানুষ নন যেন আর। ছু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে। চৌকি ছেড়ে উঠে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোলেন। পরনে সিল্কের রক্তাম্বর ধুতি, গায়ে তেমনি রক্তাম্বর ফতুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। সর্বাঙ্গে লালের জেল্লা। যে মানুষের সঙ্গে এতক্ষণ আলাপে মগ্ন ছিলাম এ যেন আর সেই মানুষ নন্।

এয়ার কন্‌ডিশন গাড়ি থেকে ছুজন লোক ধরাধরি করে এক প্রৌঢ়কে নামালো। আমি জানলায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছি। বছর বাহান্ন-তিপান্ন হবে বয়েস। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ। বাঁ-দিকের ঘাড় কাঁধ জুড়ে চামড়া-ওঠা দগদগে পোড়া ঘায়ের মতো। সেখানে ছুটো ফোলা-ফোলা লাল মাংসখণ্ড। মনে হয়, ডিপ-রে'র দরুন জায়গাটার ওই চেহারা হয়েছে। মোটাসোটা মোটেই নয়, রোগের প্রকোপে বরং শীর্ণ দোহারা চেহারা। তার পিছনে যে মহিলাটি নামলেন, তাঁর মুখখানা মিষ্টি, নাকে মস্ত একটা জ্বলজ্বলে হীরের নাকছাবি—কিন্তু মেদবহুল স্থূল বপু। সামনের এয়ার কন্‌ডিশন গাড়ি থেকে এরা ছুজন নামলেন। অন্যেরা অর্থাৎ পিছনের গাড়ি থেকে নেমে রোগীকে ধরে নিয়ে আসছে।

আমারও মনে হলো রোগীর মুখে মৃত্যুর স্পষ্ট ছায়া দেখছি।

অবধূত ছু'হাত জুড়ে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন।

তিনি ছু'তিন হাত পিছিয়ে আসতে কোটিপতি রোগীটি মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে অবধূতের ছু'পা জড়িয়ে ধরলেন। পায়ের ওপর নিজের কপাল ঘষতে লাগলেন। মহিলাটি ভদ্রলোকের স্ত্রী হবেন। তিনিও আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ঘরের হাওয়া স্তব্ধ কয়েক মুহূর্তে। এ-দিকের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পেটো কার্তিক থেকে থেকে গলা বাড়াচ্ছে।

অবধূত দু'চোখ বুজে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু বাদে তাকালেন। সঙ্গের লোকদের বললেন, সারাওগিজীকে ধরে তুলুন—

অল্প বয়স্ক যে দুটি ছেলে তাঁকে ধরাধরি করে তুলল, পরে শুনেছি তারা ভদ্রলোকের ছেলে। আর অপেক্ষাকৃত বয়স্ক তৃতীয় জন তাদের মামা। কোটিপতি রোগীর নাম রতনলাল সারাওগি।

অবধূতের নির্দেশে ছেলেরা তাঁকে সামনের সোফায় বসিয়ে দিল। মহিলাকে বললেন, মা আপনি ওঁর পাশে ওই সোফাতেই বসুন।

আদেশ পালন করেন কৃপা প্রার্থনার ভঙ্গীতে তিনি দু'হাত জোড় করে রইলেন। তৃতীয় ভদ্রলোক আর ছেলেরা অন্য সোফায় বসতে অবধূত আমার দিকে ফিরলেন।—দাঁড়িয়ে কেন, বসুন—

আমি চৌকিতে বসতে পরিচয় দিলেন, ইনি আমার বিশেষ আত্মজন, আর আপনাদেরও শুভার্থী জানবেন।

বলতে বলতে ঘরের কোণের টেবিলটার কাছে গিয়ে কিছু কাগজপত্র বার করে নিয়ে আমার পাশে এসে বসলেন। একটা ভাঁজ করা কাগজ ছেলেদের একজনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ওঁর বায়পসি রিপোর্টটা রাখুন—

রতনলাল সারাওগি ঈষৎ অসহিষ্ণু আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না, কি দেখলেন বলে ফেলুন, কোনো আশা নেই তো?

খুব কোমল গলায় অবধূত বললেন, উতলা হবেন না, কোনো আশা না থাকলে আপনাদের এখানে আসার জন্য আমি অপেক্ষা করতাম না, লোক পাঠিয়ে খবর দিতাম আসার দরকার নেই।

প্রত্যেকের মুখ আমি লক্ষ্য করছি। বিশেষ করে রোগী আর তাঁর স্ত্রীর মুখ। এমন আকুতি-ভরা আশার কারুকার্য এ-যাবত কেবল একজনের মুখে দেখেছি। আমার স্ত্রীর মুখে। একমাত্র ছেলের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হবে এমন আশা আর আশ্বাস তিনিও একজনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। পরের বিপরীত হতাশার মূর্তি এখনো আমার চোখে লেগে আছে।

শ্যালক ভদ্রলোকটি সাগ্রহে বলে উঠলেন, মঙ্গলবারের শ্মশানের কাজের ওপর সব নির্ভর করছে বলেছিলেন, সে কাজ সফল হয়েছে তাহলে ? আদেশ পেয়েছেন ?

অবধূত জবাব দিলেন না। ফুলস্ক্যাপের তিন পাতা জোড়া নিজের কষা অঙ্কগুলো মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। ঘরের আবহাওয়া আশ্চর্য-রকম থমথমে। অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুলে রোগীর দিকে তাকালেন। বললেন, আপনার জন্মের তারিখ সময় সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে···।

ভদ্রলোক বিড়বিড় করে জবাব দিলেন, আমার পিতাজীর কাজে ভুল হবার কথা নয়, এ-সব ব্যাপারে তিনি খুব পার্টিকুলার ছিলেন—

হ্যাঁ, আমার হিসেবের সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে।

তার পরেই যে চিত্রটা দেখলাম, ভোলার নয়। অবধূতের হু'চোখ রতন সারাওগির মুখের ওপর অপলক। এক মিনিট যায় হু'মিনিট যায় তিন মিনিট যায় চোখের পাতা পড়ে না। ভদ্রলোকের সমস্ত ভিতরটা যেন আঁতি-পাতি করে দেখে নিচ্ছেন তিনি। সেই দেখার একাগ্রতায় অবধূতের সমস্ত কপাল মুখ ঘেমে উঠেছে। কিন্তু চোখে পলক পড়ছে না। রতনলাল সারাওগি এ-দৃষ্টি সহ্য করতে পারছেন না। বার বার চোখ নামিয়ে নিচ্ছেন, চিবুক নিজের বুকে ঠেকছে। অবধূতের বিস্ময়কর চাউনির এই অন্তর্ভেদী দিকটা আগেও লক্ষ্য করেছি, হঠাৎ-হঠাৎ যেন সব-কিছু দেখে নেবার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—কিন্তু এমন দীর্ঘ-মেয়াদি দৃষ্টি সঞ্চালনের কশাঘাত আর দেখেছি বলে মনে হয় না। আমার মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক না এই দৃষ্টির আঘাতে মূর্ছা যান অথবা ঘুমিয়ে পড়েন।

ফতুয়ার হাতা দিয়ে কপালের আর মুখের জবজবে ঘাম মুছলেন। তাঁর থমথমে গলা শুনে ঘরের সকলে ছেড়ে আমিও সচকিত। হু'চোখ এখন ওই শ্যালক ভদ্রলোকের মুখের ওপর।—হ্যাঁ, আদেশ পেয়েছি। উনি ভালো হয়ে যাবেন। রোগ নির্মূল হবে। সেজন্য কি করতে হবে পরে বলছি। রোগীর দিকে ফিরে তাকালেন, কিন্তু আরো যা জেনেছি সেটা আপনার জানা আর শোনা দরকার—আপনার স্ত্রী আর ছেলেদের মুখ চেয়ে আপনার সাধ্য মতো প্রতিকার করাও দরকার।

জবাবে রতনলাল সারাওগি আকূতির আবেগে দু'হাত জোড় করে তাঁর দিকে তাকালেন।

অবধূতের গলার স্বর অনুচ্চ কিন্তু জলদগম্ভীর।—আপনার ব্যবসার তেল ঘি মাখন খেয়ে হার্টের রোগে এ পর্যন্ত তিনশো সাতাশি জন লোক মারা গেছে, আর কত হাজার লোক পেটের রোগে ভুগেছে আর ভুগছে তার হিসেবও আমি চেষ্টা করলে বার করতে পারি···এর জবাবদিহি আপনি কি করে করবেন?

ঘরের মধ্যে একটা বাজ পড়লেও বোধহয় এত চমকের ব্যাপার হতো না। রোগী নিয়ে যারা এসেছে তারা নির্বাক বিমূঢ় বিবর্ণ। বেশ একটু সময় নিয়ে দু'হাত জোড় করেই রতনলাল সারাওগি বললেন, আমার কারবার মুঙ্গেরে, সেখান থেকে ফিনিশড প্রোডাক্ট সব জায়গায় চালান যায়, সুস্থ থাকলে আমি নিজে গিয়ে দেখাশুনো করতাম, এই অসুখটার পর আমার ছেলেরা মাঝে মাঝে যায়, আর সেখানে আমার তিন ভাই প্রোডাকশন দেখে···আর পাঁচ জন ব্যবসাদার যেভাবে কারবার চালায় আমরাও ঠিক সেভাবেই চালাচ্ছি—

ঈষৎ কঠিন গলায় অবধূত প্রশ্ন করলেন, আপনাদের জ্ঞানত কোথাও কোনোরকম ভেজালের ব্যাপার থাকছে না—কোনোরকম কারচুপি থাকছে না?

অসুস্থ ভদ্রলোক ঘামতে লাগলেন। নাকের হীরের জ্যোতিতে তাঁর স্ত্রীর থলথলে মুখ রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। ভদ্রলোকের শ্যালকের মুখ অতিরিক্ত গম্ভীর। মন্তব্যের সুরে বললেন, আপনি যা বললেন সে-রকম হলে তো এদের এত দিনের ব্যবসা উঠে যাবার কথা।

অবধূতের দু'চোখ তার দিকে ঘুরল। চাউনি নয়, দৃষ্টির চাবুক তার মুখের ওপর যেন কেটে কেটে বসতে লাগল। কথাগুলো একটা একটা করে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল।—আমার প্রশ্নের জবাব আপনার ভগ্নিপতি দিতে পারেন নি···আপনি দিতে পারেন? এঁদের হয়ে হলপ করে বলতে পারেন আপনাদের জ্ঞানত কোনোরকম ভেজাল বা কারচুপি থাকছে না?

বিপাকে পড়েও ভদ্রলোক দমে গেলেন না। জবাব দিলেন, ইনি তো বললেন আর পাঁচ জনের মতো করেই ব্যবসা চালিয়ে আসছেন, বিপজ্জনক কিছু করছেন না।

অবধূত আরো খানিক চেয়ে থেকে রতনলাল সারাওগির দিকে ফিরলেন। খুব কোমল অথচ স্থির গলায় বললেন, আপনাদের সম্পর্কে আমার প্রাথমিক বিচারেই ভুল হয়ে গেছে দেখছি, জ্ঞানত আপনারা যখন কোনো গলদের মধ্যেই নেই, আমি কোন্ প্রতিকারের রাস্তা ধরে এগবো···ভুলের জন্য ক্ষমা চাইছি, আপনার জন্য কিছু করা আমার ক্ষমতায় কুলবে না। ছেলেদের বললেন, এঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলুন—

প্রত্যেকের মুখ বিবর্ণ পাংশু। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে মহিলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে তাঁর ভাই এবারে বলে উঠলেন, কিন্তু আপনি যে একটু আগে বললেন, শ্মশানে কাজে বসে আপনি আদেশ পেয়েছেন···উনি ভালো হয়ে যাবেন!

অনুচ্চ কঠিন গলায় অবধূত জবাব দিলেন, আদেশ পেয়েছি, কিন্তু সেটা কোনোরকম মিথ্যের সঙ্গে বেসাতি করার আদেশ নয়! ওঁর ভালো হবার একটাই শর্ত, সেটা সত্যের কাছে বিনীত সমর্পণ, কিন্তু গোড়াতেই আপনারা সেই সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছেন!

রোগ জর্জরিত রতনলাল সারাওগি এবারে দু'হাতে জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন।—আমাকে ক্ষমা করুন বাবা, দয়া করুন, এ-ব্যবসায় ষোল-আনা সৎ রাস্তায় কেউ চলে না, আমিও চলি নি···কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার তেল ঘি মাখন খেয়ে তিনশ সাতাশিজন মারা গেছে এ আমি জানতাম না, এখনো ভাবতে পারছি না···আপনি প্রতিকারের উপায় বলুন, আমি সব করতে প্রস্তুত। আমাকে দয়া করুন—

অবধূতের কঠিন মুখ আবার নরম কোমল। বললেন, বসুন। আপনার তেল ঘি মাখন খেয়ে তিনশ সাতাশিজন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে সে-জন্য অবশ্য কেবল আপনাকে দায়ী করা ঠিক নয়।···পৃথিবীর সেরা নির্ভেজাল তেল ঘি মাখনও হার্ট পেশেন্টের কাছে বিষ, না জেনে আর জেনেও হাজার হাজার লোক এই বিষ খেয়ে মরছেও। এটা আপনি ইচ্ছে করলেও ঠেকাতে

পারবেন না।

সকলেরই এবারে একটু আশান্বিত মুখ।

নির্লিপ্ত মুখে অবধূত বলে গেলেন, ভালো হয়ে মাস চারেকের মধ্যে স্ত্রী আর ছেলেদের নিয়ে মুঙ্গেরে আপনার কারবারের জায়গায় যেতে পারবেন। সেখানে গিয়ে আপনার প্রথম কাজ হবে, আপনার মোট মুনাফা চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেলেও কোথাও কোনোরকম ভেজাল বা কারচুপির ব্যাপার থাকবে না তার পাকা ব্যবস্থা করা। এতে আপনি কক্ষনো আর এতটুকু অপোস করবেন না—এটা আমার প্রথম শর্ত।

রতনলাল সারাওগির রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখে আশার আলো।—আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার কারবারের জায়গায় যাব—আপনি এ-কথা এমন জোর দিয়ে বলতে পারলেন! যদি তাই হয়, আমি যাব—নিশ্চই যাব! চার ভাগের এক ভাগ লাভ কেন, ব্যবসা তুলে দেব তবু আর কোনোদিন ভেজাল বা কারচুপির রাস্তায় যাব না—আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি!

অবধূত হাসলেন, ব্যবসা তোলার দরকার হবে না, এখন দ্বিতীয় শর্ত শুনুন, আমি ইনকাম ট্যাক্সের লোক নই জেনে খুব খোলা মনে জবাব দেবেন।...এক নম্বর দু নম্বর মিলিয়ে আমি যদি ধরে নিই আপনার কোটি টাকার ওপর আছে তাহলে কি খুব ভুল হবে? আপনার বাড়ি ঘর জমি-জমা আর ব্যবসার অ্যাসেট বাদ দিয়ে বলছি—

প্রশ্নটা এমনি চাঁছাছোলা গোছের স্থূল যে আমি সুদ্ধু বিড়ম্বনা বোধ করছি। রতনলাল সারাওগি ব্যাধির প্রকোপে জীবন সম্পর্কে হতাশ, কিন্তু মানুষ আদৌ নির্বোধ নন। চুপচাপ চেয়ে রইলেন একটু। তারপর ঠাণ্ডা গলায় ফিরে প্রশ্ন করলেন, আপনার অনুমান ঠিক হলে আমাকে কি করতে হবে বলুন?

অবধূতের মুখে সংকোচের আঁচড়ও পড়ে নি। নির্লিপ্ত গম্ভীর।—আজ থেকে আড়াই তিন মাসের মধ্যে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা একমত হয়ে যদি ঘোষণা করেন আপনার দেহে ওই ব্যাধির আর চিহ্নমাত্র নেই, তাহলে আপনার নগদ যা আছে তার দশ পারসেণ্ট এখানকার দুটো ক্যান্সার হাসপাতালে দান করতে হবে, কোনোরকম প্রচারের দান নয়, নিঃশব্দে

নিঃস্বার্থ দান—এমন কি আমাকেও জানাবার দরকার নেই, সময় হলে দুই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের হাতে আপনি টাকাটা তুলে দেবেন—এই টাকায় তাদের অভাব দূর হবে না, কিন্তু কিছু কাজ হবে।

অবধূতের চোখ-কান-কাটা প্রশ্ন এই মীমাংসায় এসে থামবে রতনলাল সারাওগি বা তাঁর পরিজনেরা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শ্যালকের ভ্রূকুটি তো স্পষ্টই হয়ে উঠেছিল। অবধূত তাঁর বক্তব্য শেষ করার পর সকলে নির্বাক।

রোগক্লিষ্ট ভদ্রলোকের নীরব বিস্ময়টুকু বোধহয় আমি আঁচ করতে পারছি। ...অবধূত বলেছেন, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বয়ং তিনি মুঙ্গেরে যাবেন তাঁর কারবার দেখতে আর সমস্ত রকমের দুর্নীতি দূর করতে।...অবধূত আরও বলেছেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা একমত হয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত ঘোষণা করার পর তাঁর নগদ টাকার এক দশমাংশ হাসপাতালে দান করতে হবে। এই কাল-ব্যাধি থেকে মুক্ত হবার আগে কোনো কড়ার বা শর্তের কথা এখনও পর্যন্ত অন্তত বলেন নি। তবু রতনলাল সারাওগির মুখে আশার আলোই বেশি স্পষ্ট।—আমি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাব আপনি এতটাই শিওর হয়ে এই নির্দেশ দিচ্ছেন?

সিওর না হলে আপনাকে এ সব কথা বলে আমার লাভ কি—সম্পূর্ণ আরোগ্য হবার আগে তো শর্ত মানার কোনো দায় নেই আপনার।

...হ্যাঁ এই কারণেই শর্তের তাৎপর্য দশগুণ হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোক আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু এর আগে আপনার জন্য কি করতে হবে?

অবধূতের অবাক মুখ।—আমার জন্যে আপনার আবার কি করতে হবে, যা করার সে তো আমি আপনার জন্য করব! তাহলে আরো একটু স্পষ্ট করে শুনুন, আপনাকে ভালো করে তোলাটাই আমার ষোল আনা স্বার্থ, কারণ, আপনার সামনে আমি অন্য জীবন দেখতে পাচ্ছি, আপনি নীরোগ হলে এরপর বহুজনের মঙ্গল—এটাই আমার সব থেকে বড় স্বার্থ, এছাড়া আমার আর কোনো স্বার্থ নেই। শ্যালক ভদ্রলোকটির দিকে আঙুল তুলে বললেন, আমি আপনার আর্থিক সঙ্গতির কথা তোলার

সঙ্গে সঙ্গে আপনার ওই সম্বন্ধীর মুখে সন্দেহের আঁচড় পড়তে দেখেছি, তাই খুব বিনীতভাবে একটা কথা আপনাদের জানিয়ে আরো নিশ্চিন্ত করে রাখি, আপনাদের অনেক টাকা থাকতে পারে কিন্তু আমাকে দিতে পারেন এমন ঐশ্চর্যের কানা-কড়িও আপনাদের নেই।

সকলে এমন কি ছেলে দুটিও হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনার আকৃতি প্রকাশ করল। রতনলাল ক্লান্ত টানা সুরে বললেন, আমরা বড় অধম বাবা, এক কোটি নয়, আমার প্রায় দেড় কোটি টাকা আছে, আপনাকে কথা দিচ্ছি সুস্থ হয়ে উঠলে পনরো লক্ষ টাকার চেক আমি দুই হাস-পাতালে পাঠিয়ে দেব—কোনো পাবলিসিটি চাইব না—আমার ছেলেদের নামে শপথ করে আপনাকে আমি এই কথা দিচ্ছি।···কিন্তু আমাকে আপনি দয়া করুন, আপনার ক্রিয়াকাজের জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু আমাকে করতে দিন।

বিমনার মতো অবধূত একবার আমার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। অনুক্ত কৌতুকটুকু বুঝতে বাকি থাকল না। অর্থাৎ, কেমন জমিয়ে তুলেছি দেখে নিন—

রতনলাল সারাওগির দিকে ফিরলেন, আমার ক্রিয়াকাজের মধ্যে আপনা-দের কেবল দুটি কাজ করার আছে—

ভদ্রলোক আর মহিলা হাত জোড় করেই আছেন।

—প্রথম কাজ, এই মুহূর্ত থেকে আপনাদের সকলকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে আপনি সেরেই গেছেন, দেহের কষ্ট যেটুকু আছে তা-ও শিগগীরই চলে যাবে। আপনি ভালো হয়ে গেলে সকলে কি করবেন না করবেন সেই আলাপ আলোচনাও নিজেদের মধ্যে করতে পারেন। মনে কোনো যদি রাখবেন না, স্থির জেনে রাখবেন আপনি ভালো হয়ে যাবেনই।

বিশ্বাস করা সহজ নয়, কিন্তু এমন জোরের কথার পর না করাটাও যেন কঠিন।

কিন্তু অবধূতের পরের নির্দেশ এঁদের ছেড়ে আমাকেও বিচালত করেছে। দুই ছেলে আর তাদের মামার দিকে চেয়ে বললেন, আজ বেস্পতিবার,

যে দুজন বড় ডাক্তার অপারেশনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন কালকের মধ্যেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যে বড় নার্সিং-হোমে তাঁরা অ্যাটাচড এই রবিবারের মধ্যেই এঁকে সেখানে ভর্তি করে দিন। উঠে টেবিল থেকে পঞ্জিকাটা নিয়ে আবার বসলেন। পাঁচ-সাত মিনিট ধরে দিন-ক্ষণ দেখলেন। পঞ্জিকা বন্ধ করে আবার ওই তিনজনের দিকেই তাকালেন। —সার্জনদের বলে দেবেন সামনের সতেরো তারিখ থেকে বাইশ তারিখের মধ্যে সকালে অপারেশন হবে।

এত আশ্বাসের পর হঠাৎ যেন মৃত্যুর পরোয়ানা সামনে তুলে ধরা হলো। শ্রীমতী সারাওগি আঁতকেই উঠলেন।—অপারেশন! অপারেশন করতে হবে!

—শুনুন, এরপর থেকে আমি ধরে নেব আপনাদের সব ভাবনা-চিন্তা আমার কাছে জমা দিয়েছেন—সার্জন কেবল অপারেশনই করবে কিন্তু দায়িত্ব আমার—অপারেশনের দিনে আমি নিজে নার্সিংহোমে উপস্থিত থাকব—আর উনি সুস্থ হলে আমি নিজে গিয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব, এ নিয়ে আপনারা আর কোনো কথা বলে ওঁর বা নিজেদের মন দুর্বল করবেন না। যা বললাম সেই ব্যবস্থা করুন—করে আমাকে খবর দেবেন। আপনারা একবারও ভাববেন না সার্জন কিছু করছেন—এটাই আপাতত ক্রিয়া-কাজ—যাঁর নির্দেশে এটা হচ্ছে সে আমিও নই, সার্জনও নন। আপনারা খুব নিশ্চিন্ত মনে এঁকে নিয়ে বাড়ি চলে যান, আর যা বললাম তাই করুন—সব থেকে বড় সার্জনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আর তাদের পরামর্শ মতো সব থেকে ভালো নার্সিংহোমে দেবেন।

বিধাতার নির্দেশ কাকে বলে জানি না। কিন্তু আমার কাছে এই নির্দেশ তেমনি অমোঘই মনে হলো।

ওঁরা চলে গেছেন। সন্ধ্যা হয়-হয়। আমি সামনে বসে অবধূত যেন ভুলেই গেছেন। নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছেন। ভাবছেন কিছু। কপাল মুখ ঘামে জবজব করছে। পায়ে পায়ে কল্যাণী ঘরে ঢুকলেন। আলো জ্বালতে অবধূত আত্মস্থ একটু। কল্যাণী দুই এক পলক দেখলেন তাঁকে। বেরিয়ে গিয়ে একটা তোয়ালে হাতে ফিরলেন। নিঃসংকোচে তাঁর কপাল ঘাড়

আর কনুই থেকে হাত দুটো নিজের হাতে বেশ করে মুছে দিলেন। আমার মনে হলো দু'চোখ ভরে দেখার মতোই এটুকু। অবধূত হেসে বললেন, কপাল ভালো থাকলে আমার স্ত্রীর সেবাও জোটে দেখলেন তো?

—তোমার ভিতরের অবস্থা জানলে উনি বুঝতেন কেন জোটে।—শোনো, এই শেষ, নিজেকে তুমি আর এ'রকম টানা হেঁচড়ার মধ্যে ফেলবে না।

অবধূতের মুখের হাসি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। বললেন, আমি নিজেকে টানা হেঁচড়ার মধ্যে ফেললাম না তুমি উৎসাহ দিয়ে আমাকে উসকে দিলে?

মহিলা আমার দিকে ফিরলেন।—কেমন জ্বালায় দেখুন, তিনদিন আমার পিছনে লেগে থেকে আমার ভিতর থেকে কথা টেনে বার করলেন, আর এখন কিনা আমি উৎসাহ দিয়ে উসকে দিলাম।

অবধূত সানন্দে নিজের ফর্মে ফিরলেন।—যাক দেবী, টানা ক'টা দিনের ধকলের আজ নিষ্পত্তি, এরপর আমার মাথায় লাঠি পড়বে কি গলায় ফুলের মালা - তোমার ঈশ্বর জানেন, এখন পেটোকে আমাদের বোতল গেলাস নিয়ে অসতে বলো, আর অতিথির মুখ চলার মতো তুমি কি দিতে পারো দেখো—আপাতত সব ভাবনা চিন্তা রসাতলে পাঠিয়ে মনে মনে কেবল তোমাকেই জাপটে ধরে থাকি।

আমার সামনে এ-সব কথাতেও কল্যাণীকে আজকাল আর তেমন লজ্জা পেতে দেখি না। আমার দিকে চেয়ে টিপ্পনীর সুরে বললেন, বাংলাভাষায় আপনার আর কি দখল, ওঁর হাতে ছেড়ে দিলে ভাব-ভাষা দুই-ই উল্টো-দিকে দৌড়বে।

মাথা চুলকে অবধূত ত্রুটি সংশোধনের সুরে বললেন, আ-হা, উনি কি তা বলে ধরে নিলেন ওঁর সামনেই তোমাকে জাপটে ধরে থাকব—এই জাপটে ধরার অর্থ তোমার স্বস্তি-বচন আঁকড়ে ধরে থাকা।

কল্যাণী হেসে বললেন, বুড়ীকে নিয়ে রঙ্গ-রসের কথা কেউ লেখেও না পড়েও না, তবু এঁকে দেখে লোক হাসাবার জন্যেও আপনি কিছু লিখতে চেষ্টা করুন।

অবধূত প্রায় গর্জন করে উঠলেন, খবরদার! কতদিন বলেছি তোমার নিজেকে বুড়ী বলাটা আমার সব থেকে বেশি অসহ্য!

কল্যাণী হাসতে হাসতে চলে গেলেন। হাসছি আমিও। কিন্তু এই প্রায়-বৃদ্ধ বয়সেও একটা সত্যি কথা কবুল করতে আপত্তি নেই। বয়েস যা-ই হোক এমন সুঠাম সৌষ্ঠবের সঙ্গে বার্ধক্যের যোগের কল্পনা আমার মনেও আসে না।

পেটো কার্তিক বোধহয় সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তিন মিনিটের মধ্যে ট্রে-তে সরঞ্জাম সাজিয়ে হাজির। সে-সব সামনে রেখে মেঝেতে তার বাবার পায়ের সামনে বসে গেল। অবধূত গম্ভীর মুখে বললেন, পা টিপতে হবে না, খাবার কি আছে ছাখ্—

—মা পাঁপড় ভাজছেন, তারপর মাছ ভাজা আর মেটের চচ্চড়ি আসছে। একখানা পা নিজের কোলের কাছে টেনে নিল।

—পা টিপতে হবে না বললাম যে!

পেটো কার্তিক ভ্রূক্ষেপ না করে তার কাজ শুরু করে দিল। তারপর ঘরের দেওয়ালকে শুনিয়ে বলল, আরামের জন্য টিপতে হবে না বুঝেছি, আমি নিজে আনন্দ পাবার জন্য টিপছি।

অবধূত হাসতে লাগলেন।—হারামজাদার ট্যাকটিকসটা লক্ষ্য করেছেন, কি ব্যাপার বোঝার জন্য ক'দিন ধরে ওর মায়ের পিছনে ঘুর ঘুর করছে—কিন্তু সেখানে তো দু-কথার পর তিন কথাতেই ধমক, এখন আপনার জেরা শুরু হবে বুঝেই এসে পা টিপতে বসে গেল—

পেটো কার্তিক হেসে ফেলে আমাকেই সালিশ মানল, বলল, শুনুন সার এই কেস্‌টা আসার পর থেকে বাবাকে চিন্তিত দেখছি, কেবল ভাবছেন আর ভাবছেন, পাতার পর পাতা কি-সব অঙ্ক আর হিসেব করে চলেছেন, মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করছেন, মঙ্গল বুধ পর পর দু'দিন শশ্মানে গিয়ে বসলেন—যা সচরাচর করেন না, যে মা কোনো চিন্তা-ভাবনার ধার ধারেন না তাঁকেও বাবার জন্য চিন্তিত দেখছি—আজ সকালে মায়ের সঙ্গে কথা বলার পর বাবাকে কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে হলো—এখন আপনিই বলুন সার, ভাবনা হয় না?—এত বছরের মধ্যে আর একবার

মাত্র বাবাকে খুব অস্থির হতে দেখেছিলাম, সে অবশ্য এর থেকেও ঢের বেশি—

এবারে অবধূত সত্যি সত্যি একটা দাবড়ানি দিয়ে উঠলেন, এই ! ফের মুখ খুলবি তো তোকে আমি সত্যিই ঘর থেকে বার করে দেব ! মুখ দেখে মনে হলো পেটো কার্তিক বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছিল। জিভ কেটে সামলে নিয়ে নিজের হু'কান একবার মলে আবার পা টেপায় মন দিল।

আর একবার ঢের বেশি অস্থিরতার কি কারণ ঘটেছিল সে-কৌতূহল আপাতত বড় নয়। একটু আগে যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি দেখলাম পেটো কার্তিকের এ-কথার পর সে-সম্পর্কেই দ্বিগুণ কৌতূহল এখন। ক্যান্সার অপারেশনের ফতোয়া দেবেন একজন দেড়কোটিওয়ালা মানুষকে সেটাই এই লোকের অস্থিরতার বড় কারণ আমার একবারও মনে হলো না। কারণ শর্ত যা হলো তাতে ব্যক্তিগত লাভের কানা-কড়ি স্বার্থও নেই।

অবধূত ততক্ষণে হুজনের গেলাসই রেডি করেছেন। কল্যাণী দেবীও গরম পাঁপড় ভাজার থালা হাতে উপস্থিত। বললাম, ব্যাপারটা ভালো করে না জানা আর না বোঝা পর্যন্ত এ-সব পরম উপাদেয় জিনিসও সচ্ছন্দে তল্ হবে না···কার্তিক বলছিল এই একটা কেস নিয়ে আপনিসুদ্ধু উতলা হয়ে পড়েছিলেন !

শ্রীমতি সুন্দর একটা ভ্রূকুটি করে কার্তিকের দিকে তাকালেন, তোর বুঝি সবেতে সর্দারির কথা না বললেই না ? তারপর আমার কথার জবাবে বললেন, আমি উতলা হয়েছিলাম ওর এত ভাবনা-চিন্তা দেখে···যাঁর কাজ তিনি করছেন করাচ্ছেন আর উনি ভেবে সারা একটা লোকের জীবন-মরণের দায়িত্ব নেবেন কি নেবেন না—

গেলাসে বড়-সড় একটা চুমুক দিয়ে অবধূত মিটি মিটি হাসছিলেন। মন্তব্য করলেন, কথাটা ঠিক বললে না, আমি ভাবছিলাম মন যা বলছে সেই সাহসের জমির ওপর শক্ত পায়ে দাঁড়াব, না কাপুরুষের মতো লোকটাকে সোজা মৃত্যুর রাস্তায় এগোতে দেব—

—ওই একই হলো, হুইয়ের কোনোটারই তুমি মালিক নও।

—কিন্তু মালিকের কাজখানা তো আজ সকালে তুমিই করলে, হুক্কার

ওভার বাউণ্ডারিখানা হাঁকিয়ে আমার হার-জিতের ফয়সলা করে দিলে।
—আমি ছাই করলাম। হাসি মুখে ঘর ছেড়ে প্রস্থান।
বার দুই গেলাসে চুমুক দিয়ে পাঁপড়ভাজা চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যাপারটা মাথায় নিয়ে আপনি পর-পর দু'দিন শ্মশানে গেছলেন ?
—গেছলাম তো…।
—নির্দেশ পাবার জন্যে ?
মাথা নাড়লেন। তাই।
—নির্দেশ পেলেন ?
—মনে তো হচ্ছে পেলাম, না হলে এতবড় ঝুঁকি নিই কি করে।
এবারে আমি বেশ চেপে ধরার সুরেই বললাম, এরপর আমি আপনার কোন্ কথা বিশ্বাস করব—নিজের মুখে অনেকবার বলেছেন আপনি কোনোরকম অলৌকিকে বিশ্বাস করেন না, আপনি যা করেন আর যা পারেন সেটা কেবল শিক্ষা অভ্যাস আর অধ্যবসায়ের ব্যাপারে—
অবাক মুখ।—ঠিকই তো বলি এর মধ্যে আপনি অলৌকিকের কি দেখ-লেন ?
ভদ্রলোক হা-হা করে হেসে উঠলেন। পা টেপা ভুলে পেটো কার্তিকও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে। গেলাস তুলে এক চুমুকে চার ভাগের তিন ভাগ শেষ করে তোয়ালেতে মুখ মুছলেন। তখনো হাসছেন। বললেন, শুনুন মশাই, আমি কখনো কোনো অলৌকিক নির্দেশ পাবার আশায় শ্মশানে যাই না, যাই নিজের মনঃসংযোগ করতে। নিজের মনকে সব-দিক থেকে গুটিয়ে এনে লক্ষ্যের দিকে স্থির করার মতো এমন জায়গা পৃথিবীতে আর নেই। আমার সবই ক্যালকুলেশনের ব্যাপার, অঙ্কের মতো মিলে না গেলে বুঝতে হবে গলদ আছে। শ্মশানে গিয়ে মন স্থির করে বসলে গলদ আছে কি নেই সেটা ধরা পড়ে। আর নির্দেশও তখন নিজের ভিতর থেকেই আসে।
কিছুটা স্বস্তি বোধ করছি। দু'দুবার শ্মশানে গেছলেন শুনেই ভাবছিলাম অলৌকিক কোনো ঘটনার ওপর নির্ভর করেই তিনি এমন এক রোগীকে অপারেশনে যাবার ফতোয়া দিয়ে বসেছেন। কিন্তু এমন জোর তিনি

কোথা থেকে কি করে পেলেন সেটা এখনো বোধের অতীত। কল্যাণী দেবী একটা বড় রেকাবিতে মাছভাজা নিয়ে ঘরে এলেন। অবধূত তখন নিজের গেলাসে বোতলের জিনিস ঢালছেন। ঠাট্টার সুরে কল্যাণী বললেন ক'দিন বাদে আজ যে ফুর্তি দেখছি ওই বোতল খালি হতে বেশি সময় লাগবে না—আপনার নিজের ভাগ আগেই সরিয়ে রাখুন।

অবধূত হাসি মুখে স্ত্রীকে জানান দিলেন, ইনি ভেবেছিলেন আমি কোনো অলৌকিক নির্দেশ পাবার আশায় পর পর দু'রাত শ্মশানে কাটিয়ে এসেছি।

কল্যাণী সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা যেন আমাকেই সমর্থন করলেন।—ভুল কি ভেবেছেন, বুদ্ধি বিবেচনার মধ্যে না আসা পর্যন্ত সব-কিছুই অলৌকিক, তুমি যদি কলম নিয়ে বসে এঁর মতো একটা গল্প লিখে ফেলতে পারো আমি তো হাঁ হয়ে বসে সেটাই অলৌকিক ভাবব।

মাছ ভাজার রেকাবি রেখে হাসি মুখে প্রস্থান করলেন। মনে মনে ভাবলাম, এই দিব্যাঙ্গনা প্রিয়দর্শিনীটি চারু-ভাষিণীও কম নন। এখনো আমার সমস্ত মন জুড়ে আছেন রতনলাল সারাওগি। এমন ফতোয়া দেবার মতো জোর অবধূত পেলেন কি করে সেটা আমার কাছে অলৌকিকের মতোই রহস্য-জনক। জিজ্ঞেস করলাম, এখন বলুন তো কোন্ জোরের ওপর নির্ভর করে লোকটাকে অপারেশনে পাঠাবার মতো রিস্ক আপনি নিতে পারলেন?

অবধূত হাসি মুখে পল্‌কা জবাব দিলেন, এর মধ্যে রিস্ক আবার কি দেখলেন, লোকটা বেঁচে গেলে দুটো হাসপাতাল পনেরো লক্ষ টাকা পাবে, আরো বহু লোকের উপকার হবে—আর না বাঁচলে তার ছেলেরা বড়জোর এখানে এসে ভাঁওতাবাজ বলে আমাকে গলা ছেড়ে গালাগাল করে যাবে—তাতে আমার মতো লোকের গায়ে কি বা ফোস্কা পড়বে?

একটুও বিশ্বাস হলো না। পেটো কার্তিকও দেখলাম অবিশ্বাসে মুখ মচকে জোরে জোরে পা-টেপা শুরু করেছে।

বললাম, এটুকুই কেবল সত্য হলে মনঃসংযোগ করার জন্য দু'দিন আপনি শ্মশানে গিয়ে বসতেন না, বা ক'টা দিন এত অস্থিরতার মধ্যে কাটাতেন না, বলতে বাধা থাকলে অবশ্য জোর করব না—

হৃষ্ট মুখে গেলাসে ছোট ছোট দু'তিনটে চুমুক দিয়ে খানিকটা ভাজা মাছ ভেঙে মুখে পুরলেন। তারপর গেলাসে আর একটা বড় চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ঠোঁটে ঝোলাতেই পেটো কার্তিক চট করে উঠে দাঁড়িয়ে লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে আবার পা নিয়ে বসে পড়ল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে অবধূত বললেন, আপনাকে বরাবর যা বলে এসেছি এ-ও তেমনি এক ঘটনার সাজ। কেউ ঘটালো, সাজালো। তারপর কারো না কারো ডাক পড়ার কথা, ঘুরে-ফিরে এই সাজের আসরে শেষে আমার ডাক পড়ল। তবে রতনলাল সারাওগিকে যদি জীবনে ফেরানো যায় সে বাহাদুরি আমার নয়, আমার শাশুড়ী মায়ের···বক্রেশ্বর শ্মশানের আমার সেই ভৈরবী মায়ের। কারণ লোকটাকে দেখা মাত্র প্রথমে আমি তাঁকে খরচের খাতাতেই ফেলে দিয়েছিলাম।

শুরুটাই আমার কাছে অলৌকিকের মতো ঠেকল, কারণ এর মধ্যে বহু-কালের নিরুদ্দিষ্ট সেই ভৈরবী মা এসে গেলেন কি করে! কিন্তু বাধা না দিয়ে রুদ্ধশ্বাসেই শুনছি।

···রতনলাল সারাওগির এই ব্যাধি তিন বছরের। কলকাতা বম্বে আর মাদ্রাজের কোনো বড় বিশেষজ্ঞকে দেখাতে বাকি রাখেন নি। গোড়া থেকেই রে-ট্রিটমেণ্ট শুরু হয়েছিল, তাই অমন বিশাল দগদগে ঘা। বিদেশে যাবার জন্যও প্রস্তুত হয়েছিলেন কিন্তু যাবতীয় রিপোর্ট দেখে সেখানকার বিশে-ষজ্ঞদের জবাব এসেছে করার কিছু নেই। সকলেই তিলে তিলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তার মধ্যেই একযোগে অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি কবি-রাজী হেকিমি দৈব সমস্ত চিকিৎসাই চলছিল।···এই দৈবের রাস্তা ধরেই কি করে তাঁরা অবধূতের সন্ধান পান। এয়ারকণ্ডিশন গাড়ি নিয়ে রতন-লালের দুই ছেলে এসে হাজির। টাকার জোরে তাদের কোনো চাহিদাই অপূর্ণ থাকে না। তাদের আর্জি বাবাকে একবার দেখতে যেতে হবে। কি ব্যাপার অবধূত শুনে বললেন, আমি তো ঈশ্বর নই বাবারা, গিয়ে কি করব।···তবে তোমাদের বাবাকে এখানে একবার নিয়ে এলে চোখের দেখা দেখতে পারি।

ছেলেরা জানালো, বাবাকে কলকাতা থেকে এতদূরে নিয়ে আসা সম্ভব

নয়, দয়া করে তাঁকেই একবার যেতে হবে, এ-জন্য তিনি যত টাকা চান পাবেন।

অবধূত হেসে বললেন, আমার একটা বদ স্বভাব কেউ আমাকে টাকা দেখালে আমি তাকে বেরুবার দরজা দেখিয়ে দিই, এখন তোমরা এসো বাবারা—

তারা চলে গেল। কিন্তু ওই উক্তিই যে একটা আকর্ষণের কারণ হবে তা কি ভাবতে পেরেছিলেন! পরদিনই সেই এয়ারকণ্ডিশন গাড়ি আর তার পিছনে আর একটা গাড়ি বাড়ির দোরে হাজির। রতনলাল সারাওগি তাঁর স্ত্রী, শ্যালক আর দুই ছেলে। ধরাধরি করে রোগীকে এই ঘরেই এনে বসানো হলো। তাঁকে দেখা মাত্র অবধূত একটা মৃতদেহ দেখলেন। এই দেখাটা যে প্রাথমিক অনুভূতির দেখা এটা পরে বুঝেছেন। রোগীর সম্পর্কে যা শুনেছেন আর প্রথম দর্শনে যা দেখলেন তাই থেকেই একটা ধারণা! কিন্তু তার পরেই রোগীর দিকে ভালো করে চেয়ে কিছু যেন একটা ব্যতি-ক্রম চোখে পড়ল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবী মায়ের একটা শিক্ষা হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেল।···বলেছিলেন, কপালে কানে আর নাকে এই এই চিহ্ন আর ছায়া না দেখলে মৃত দেহও সম্পূর্ণ মৃত নয় ধরে নিতে হবে, অর্থাৎ দেহে তখনো আত্মা উপস্থিত বুঝতে হবে। আর দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে মৃত্যু অবধারিত হলে ছ'মাস এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক বছর আগে থেকেও কপালে কানে আর নাকে সেই লক্ষণ স্পষ্ট হতে থাকে। ভৈরবী মায়ের কৃপায় সেই লক্ষণ অবধূত খুব ভালোই চেনেন। কিন্তু আশ্চর্য, রতনলাল সারাওগির কপালে কানে বা নাকে সেই লক্ষণ আদৌ দেখলেন না। তবু ভাবলেন, ভয়ংকর রকমের ক্যানসার যখন, সেই লক্ষণ আর চিহ্ন এখনো না পড়লেও শিগগীরই পড়বে। আবার মনে হলো, যে ব্যাধি তিন, বছরের মধ্যে তো শেষই হয়ে যাবার কথা।

মনসংযোগ করে দেখতে লাগলেন। যে ছায়া বা চিহ্ন পড়বে তার আভাসও অনেক সময় আগে থাকতে দেখতে পান। অবধূতের এই দৃষ্টি সঞ্চালনের কথায় এখন আর আমার অবিশ্বাস হয় না। হরিদ্বারের পথে ট্রেনে আমার স্ত্রীর মুখে নির্ভুল ভাবে শোকের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন।···এত বড়

ব্যাধি সত্ত্বেও রতনলাল সারাওগির সমূহ মৃত্যুর কোনো সম্ভাবনা তাঁর তো চোখে পড়ছে না।

অবধূতের হাত-টাত দেখার খুব একটা দরকার হয় না। সংশয়ে পড়লে তখন দেখেন। কিন্তু এর থেকে বড় সংশয় কি আর হতে পারে। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল বড় রকমের অস্ত্রোপচারের লক্ষণই কেবল দেখছেন। মৃত্যুর যোগ দেখছেন না। হাতের রেখাতেও তাই দেখলেন। সমূহ অস্ত্রোপচার জনিত রক্তক্ষয় আর ভোগ দেখছেন কিন্তু আয়ুরেখা দীর্ঘ সবল। কৌতূহল বাড়তেই থাকল। রোগীর জন্ম সন তারিখ সময় আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে তাঁর ছেলেদের একজন ঠিকুজি বার করে দিল। এ-রকম জায়গায় আসছে বলে সঙ্গে নিয়েই এসেছে।

নিবিষ্ট মনে দেখলেন।···বাহান্ন বছর মাত্র বয়েস কিন্তু আটাত্তরের আগে মৃত্যু যোগ নেই। সাধারণ হিসেবে তাঁর অন্তত চোখে পড়ছে না।

এরপর অবধূতের নিজের কৌতূহলই তুঙ্গে। ঠিকুজির নকল লিখে রাখলেন। কি ভেবে বায়োপসির রিপোর্টও চেয়ে রেখে দিলেন। তারপর জানালেন, এখানে হবে না, তাকে তাঁর আসনে গিয়ে বসতে হবে—আদেশ পেলে কিছু করার আছে কিনা জানাবেন।

···রতনলাল সারাওগি আর তাঁর স্ত্রী কি কারণে অভিভূত নিজেরাও জানেন না। আমার ধারণা অবধূতের দৃষ্টি সঞ্চালন দেখেই। সাধারণের কাছে সেটা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার মতোই ব্যাপার। এই চাউনি, দৃষ্টি কত যে বদলে যায় নিজের চোখেই দেখেছি। তখন সত্যিই মনে হয় দেহের অভ্যন্তরে যা-কিছু আছে তার সবটুকু দেখে নেবার ক্ষমতাও এই লোকের আছে। সেই ভাবে দেখে নেবার সময় ভরা শীতকালেও তাঁর কপাল আর মুখ ঘামতে থাকে। পরে জিজ্ঞেস করতে নিজেই বলেছেন, ওটা মনঃসংযোগের ধকল ছাড়া আর কিছু না, আর তার মধ্যে কিছুটা শো-বিজনেসেও আছে, লোকে অভিভূত হয়, তার ভিতরের দোষগুণ আরো বেশী ধরা পড়ে।

রতনলাল সারাওগি বললেন, আদেশের জন্য আসনে গিয়ে বসতে হবে বলছেন·· সে কোথায়?

এখানকারই শ্মশানে। আজ রোববার, মঙ্গলবার রাতে গিয়ে বসব···বুধ-বার হবে না, আপনি বেস্পতিবার বিকেলের দিকে ছেলেদের কাউকে পাঠিয়ে দেবেন।

চুপচাপ খানিক চেয়ে থেকে রতনলাল আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। বিড়বিড় করে বললেন, আমার ভাগ্য জানতে আমি নিজেই আসব। একটু থেমে আবার বললেন, এই এক রোগের কারণে এত দিনে কত লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে ঠিক নেই, কিন্তু আপনার কাছে আসার পর আমার ভিতর থেকে কেন একটু আশা হচ্ছে জানি না···।

অবধূতের ভিতরটা তক্ষুনি সজাগ আবার। ছু'চোখ একাগ্র। কপাল দেখ-ছেন, মুখ দেখছেন। সোজা জিজ্ঞেস করলেন, এটা আপনি নিজের মন থেকে বলছেন না আরো অনেককে এ-কথা বলে শেষে হতাশ হয়েছেন?

প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক বিস্মিত একটু। আবার মাথা নাড়লেন। বললেন, বিপদ কাটিয়ে দেবার জন্য অনেক সাধু মহারাজকে অনুরোধ করেছি, কিন্তু কাউকে দেখে এ-রকম আশা আর কখনো হয় নি।

অবধূতের বিবেচনায় এ-ও এক ধরনের সুলক্ষণ। কিন্তু তা আর মুখে ব্যক্ত করলেন না। বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ানোর পরেও সকলের চোখে মুখে একটু ইতস্তত ভাব। ছেলে ছুটির আরো বেশি। গতদিনে এদেরই এক-জনকে অবধূত বলেছিলেন, কেউ টাকা দেখাতে এলে তাকে তাঁর বেরুনোর দরজা দেখিয়ে দেবার বদ অভ্যাস।

আমার দিকে চেয়ে অবধূত হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন, প্রণামী নেবার ব্যাপারে আমার অরুচি নেই নিজের চোখেই তো দেখছেন, কিন্তু এদের বেলায় আমার মাথায় হঠাৎ যেন বক্কোমুনির থানের কংকালমালীর মেজাজ ভর করল। নিজেই দো-টানার মধ্যে পড়ে গেছি বলেই বোধহয়। ওই ছেলে ছুটোর দিকে চেয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললাম, বেস্পতিবারে আবার আসতে চাও না ফের টাকা দেখিয়ে বেরুনোর দরজা দেখে নিতে চাও?···ভয়ে সক্কলে একসঙ্গে হাত জোড় করে ফেলল।

···বলে ফেলার পরেই নাকি অবধূত আবার নিজের স্বভাবে ফিরলেন। রতনলাল সারাওগির দিকে চেয়ে হাসি মুখেই বললেন, কেউ না বললেও

আমি জানি আপনি কোটিপতি মানুষ, সেই সুদিন এলে আপনাকে দিয়ে আমার খরচ করানোর ক্ষমতাটাও দেখে নেবেন—তখন আমার খাঁই দেখে পালাবার পথ না খোঁজেন—এখন আসুন, এই ক'টা দিন যতটা পারেন মনটাকে নিরাসক্ত রাখতে চেষ্টা করুন।

…রতনলাল সারাওগির কি ব্যবসা আগের দিন ছেলেদের মুখেই শুনেছিলেন। সেদিন তাঁর কপাল আর হাত দেখে জেনেছেন ভদ্রলোকের টাকার কোনো লেখাজোখা নেই।

এ-রকম কঠিন পরীক্ষার মধ্যে অবধূত নিজেকে কমই ফেলেছেন। এ-যাবত তাঁকে অনেক জটিল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু তার বেশির ভাগই নিজের প্রত্যক্ষ চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন, আবার ব্যর্থতার নজিরও কম নেই। যে-চেষ্টার নাম পুরুষকার, বিচার বিবেচনা অনুযায়ী নিজের সেই চেষ্টার ওপরেই তাঁর প্রধান নির্ভর। কিন্তু এ-ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চিকিৎসা তাঁর হাতে নয়, অপারেশন করবে আর একজন, তাঁর নিজস্ব চেষ্টার কোনো ব্যাপারই নেই। সকলেই জানে মৃত্যু অবধারিত, অথচ ওই জীর্ণ দেহে তিনিই কেবল পরমায়ুর জোর দেখছেন। তাঁর হিসেবে ভুল হলে কি হবে? হয়তো অপারেশন টেবিলেই মরবে বা তার দু'দশ দিনের মধ্যে মরবে। আর অপারেশন না হলে বড়জোর ছ'মাস আট মাস বাঁচবে, তারপর মরবে। ভুল হলে পরিণামের তফাৎ শুধু এইটুকু।…কিন্তু এই অনিশ্চয়তার দায়িত্ব নেবার অধিকার কি তাঁর আছে? ছ'মাস আট মাস ছেড়ে ছ'ঘণ্টা আট ঘণ্টার জন্যও কারো মৃত্যু এগিয়ে আনার উপলক্ষ কি তিনি হতে পারেন?

অবধূত ভেবে চলেছেন। ভাবনার জট বাড়ছে ছাড়া কমছে না। মন যা বলে হুট-হাট তা করে ফেলাই অভ্যাস। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ভিতরে দ্বিধা কেন, দ্বন্দ্ব কেন? কাগজ কলম নিয়ে রোগীর জন্মক্ষণ ধরে হিসেব করে চলেছেন, আগে বা পরে পাঁচ-সাত মিনিটের ব্যতিক্রমে কি হয় সেই হিসেবও করেছেন। তাতেও রোগীর মৃত্যুর ছায়া পর্যন্ত দেখছেন না। মানুষটাকে বার বার চোখের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন। মৃত্যু যন্ত্রণার ভোগ দেখছেন লক্ষণ দেখছেন, কিন্তু মৃত্যু দেখছেন না, ভোগযন্ত্রণা থেকে

উত্তীর্ণ মুখই চোখে ভাসছে।

মঙ্গলবার রাতে শ্মশানে গিয়ে বসলেন। কিন্তু আশ্চর্য নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারলেন না। লক্ষ্যের দিকে মন সে-ভাবে নিবিষ্ট হলো না। কেবলই মনে হতে লাগল এতকাল ধরে মানুষকে বিধান আর নির্দেশ দিয়ে দিয়ে একটা অহং-ভাবের বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন তিনি। রতনলাল সারাওগির সম্পর্কে যে বিধান আর নির্দেশ মনে এসেছে সেটা ওই অহং-এর নির্দেশ না ভৈরবী মায়ের শিক্ষার নির্দেশ ?

রাত ভোর হলো। তিনি কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলেন না।

ঘরে ফিরতে মুখের দিকে চেয়েই কল্যাণী কি বুঝলেন তিনিই জানেন। জিজ্ঞেস করলেন, মন স্থির করতে পারলে না ?

অবধূত অসহায়ের মতো মাথা নাড়লেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কেন পারছি না বলো তো, হিসেবে যা স্পষ্ট দেখছি বিশ্বাস দিয়ে তা আঁকড়ে ধরতে পারছি না কেন ?

কল্যাণী ছোট করে মন্তব্য করলেন, এ তো ভালো লক্ষণ··।

অবধূত অবাক।—ভালো লক্ষণ কেন ?

—যে-বিচার তোমার মনে এসেছে সেটা তুমি তোমার বিচার ভাবছ, তার সঙ্গে তুমিটা যুক্ত হয়ে পড়ছে, তোমার দৌড় কতটুকু সেটা কেউ তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

হতভম্বের মতো খানিক চেয়ে থেকে অবধূত চুপচাপ ঘরে এসে বসলেন। ···কল্যাণীর বিশ্বাসের ধারা আলাদা, পথ আলাদা। সেই ধারায় বা পথে অবধূত কখনো চলেন নি। জাগতিক কর্মের পথই তাঁর বিশ্বাসের উৎস। কল্যাণীর চোখে এই কর্মের মধ্যে কিছু গলদ চোখে পড়েছে। নিজের অগোচরে তিনি কর্তা হয়ে বসেছিলেন। তাই সংশয়, তাই বিভ্রম।

দিনটা একটা গ্লানির মধ্যে কাটল। রাতে নিঃশব্দে আবার শ্মশানে চলে গেলেন। এইদিনে সমর্পণটাই বড় হয়ে উঠল। মনঃসংযোগে কোনো বাধা হলো না। ভৈরবী মা সত্যিই কি তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ? না, তা কখনো হয় না, হতে পারে না। সমর্পণের ভিতর দিয়েই তিনি তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে চেষ্টা করেছেন, অনুভব করতে পেরেছেন। তাঁর

শিক্ষার পাতাগুলো পর পর উল্টে গেছেন।...সদ্য বর্তমানের এই ঘটনার সাজে তাঁর কোনো কর্তৃত্ব নেই সেটা অনুভব করেছেন। কেউ ঘটিয়েছে, কেউ সাজিয়েছে।...রতনলাল সারাওগির আয়ুর জোর তিনি দেখেন নি তাঁকে দেখানো হয়েছে। এই দেখার বিশ্লেষণটুকুও আর বুদ্ধির অগোচর নয়। বাইরে থেকে রোগের প্রকোপ দেখে ভিতরের শিকড় যতটা ছড়িয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, ততো দূর পর্যন্ত ছড়ায় নি। যে-কারণেই হোক এক জায়গা পর্যন্ত এসে থেমে আছে। অপারেশন করলে নির্মূল হয়ে যাবে, আর ছড়াবে না। ঘটনার সাজে শুধু এই নির্দেশটুকু ঘোষণা করাই তাঁর ভূমিকা, এর বেশি কিছুই না।

অনেকটা হালকা মনেই ঘরে ফিরেছেন। একটু কেবল সংশয় এই নির্দেশ রতনলাল বা তাঁর আত্মীয় পরিজনেরা মানবেন কি না।...তবে, ভদ্রলোকের আয়ুর জোর যে-রকম স্পষ্ট, মনে হয় মানবেন। ঘরে ফিরে আরো নিশ্চিন্ত। তাঁকে দেখেই কল্যাণী হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, ভাবনা চিন্তার শেষ তো না আরো বাকি?

অবধূত জবাব দিলেন, মনে হয় শেষ, কেন?

—মনে হয় আবার কি, আমি জানি শেষ।

—কি করে জানলে?

খুব খুশি মুখে কল্যাণী বললেন, রাতে তোমার এই ব্যাপারটা চিন্তা করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ভোর রাতে স্বপ্ন দেখলাম আমার শিবঠাকুর হাসি মুখে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তোমার নাম ধরে সেইসব মধুর সম্ভাষণ করে গালাগালি করছেন—

—মানে শালা-শালা করছেন?

কল্যাণী হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

—কি বলছিলেন? অবধূত উদ্‌গ্রীব।

এর পরে কল্যাণী শালা শব্দটা মুখে উচ্চারণ না করলেও তার শিবঠাকুর অর্থাৎ কংকালমালী ভৈরব কি বলেছেন বুঝতে অসুবিধে হয় নি। বলেছেন, শালা দিনে-দিনে কর্তা হয়ে বসছিল, ওকে আরো ভালো-রকম ভোগাবো ভেবেছিলাম, তুই আর তোর মা শালাকে খুব বাঁচিয়ে দিলি।

না, এ-ও আলৌকিক কিছু ভাবেন না অবধূত। স্বপ্ন স্বপ্নই। মানসিক উদ্বেগ অথবা চিন্তার প্রতিফলন। তবু ভিতরটা খুশি হয়ে উঠেছিল।

৩

এর পর মাস চার সাড়ে চারের মধ্যে অবধূতের বা কোন্নগরের কারো সঙ্গেই দেখা হয় নি। তার একটা কারণ পুজোর লেখার চাপ। এটা থাকে আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। তারপরেই আমার নিজস্ব রুটিনের পুজোর ছুটি শুরু হয়ে যায়। খবরের কাগজের চাকরির পুজোর ছুটি বলতে তেমন কিছুই নয়। পুজোর লেখা শেষ হলেই সমস্ত বছরের পাওনা ছুটির সঙ্গে এই ক'টা দিনের ছুটি মিলিয়ে এক দেড় মাসের জন্য সপরিবারে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়ি। মাঝে বছর দুই ছেলের কারণে বেরুনোয় ছেদ পড়েছিল। গেল বছর থেকে আবার বেরুচ্ছি। এবারে রাজস্থানের দিকে প্রোগ্রাম।

রওনা হবার দিন দুই আগে ফোনে অবধূতের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, আপনার স্ত্রীকে দিন একটু, আমার স্ত্রী কথা বলবেন।

কেবল স্ত্রী নয়, মেয়ের সঙ্গেও তাঁর কথা হলো। এক দিকের বাক্যালাপ থেকেই বোঝা গেল কি নিয়ে কথা। আমরা থাকছি না বলে অবধূত গৃহিণীর আগাম কালী পুজোর নেমন্তন্ন। আমার স্ত্রী জানান দিলেন, আপনি নেমন্তন্ন না করলেও শুধু এই জন্যেই কালীপুজোর আগে আমাদের ফেরার প্রোগ্রাম—আপনার গেল বারের কালীপুজো এখনো আমাদের চোখে লেগে আছে। আমার মেয়ে আর এক ধাপ ওপরে গেল। বলল, এমন কালী-পুজো জীবনে দেখি নি, এবারেও যেতে না পারলে আপনাকে দায়ী করব, আপনি দেখবেন যাতে কোনোরকম বিঘ্ন না হয়—

ও-দিক থেকে তিনি নাকি হেসে বলেছেন, বিঘ্ন হবে না।

বিঘ্ন হয় নি। সমস্ত রাজস্থান ঘুরে দিল্লি হয়ে কালীপুজোর চারদিন আগে

আমরা কলকাতায় ফিরেছি। বেড়িয়ে ফেরার পর প্রতিবারের মতো এবারেও মনে হয়েছে, কলকাতাকে ভালো লাগার জন্যেই মাঝে মাঝে কলকাতা ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া দরকার। গেলে কলকাতার টান বোঝা যায়। রাতে ফোনে অবধূতকে সেই কথা বলতে তিনি হেসে সারা। বলে উঠলেন, মশাই সর্বব্যাপারেই আপনার এ-কথা খাটে, প্রিয়কে প্রেয়সী করে তুলতে হলে তাকেও মাঝে মাঝে ছাড়া দরকার—বিরহ কথাটার অর্থ কি ছাড়া না ছেড়ে পাওয়া ? নিজের স্ত্রীকেই তো এ-পর্যন্ত কতবার ছাড়লাম, ফেরার পর মনে হতো চার গুণ মিষ্টি !

ফোনে রমণীর ভর্ৎসনা প্রায় স্পষ্ট কানে এলো, তোমার কি কোনোদিন আর বয়েস হবে না !

—ওই দেখুন মশাই সত্যি কথা বলে গাল খাচ্ছি, কালীপুজোর দিন সকালেই চলে আসুন তাহলে—

সকালে হয়ে ওঠে নি। খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে বেলা তিনটে নাগাদ রওনা হয়েছি। বিকেলের মধ্যে পৌঁছে গেলে আর হৈ-হল্লা বা বাজী পটকার মধ্যে পড়তে হবে না। দুটোকেই বড় ভয়।

···একই জিনিসের বিপরীত রূপ এত বয়েস পর্যন্ত কম দেখলাম না। কি শোকে কি উৎসবে। শোকে উৎসবের তাণ্ডব, আবার উৎসব শেষে শোকের ছবি। উৎকট রকমের নানা ছাঁদে-ছন্দে 'বোলো হরি হরি বোল' ধ্বনির মত্ত উল্লাস কানে এলে মৃত্যুকে 'শ্যাম-সমান' কল্পনা করা কারো পক্ষে সম্ভব হয় কিনা জানি না। তমিস্রনাশিনী শ্যামাপূজার পরদিন খবরের কাগজের ভাঁজ খুললেই মানুষের উল্লাসজনিত অঘটনে বলির অবধারিত বিবরণ থেকেও চোখ সরানো সম্ভব হয় না। কত সংসারের শোকের ছায়া মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। ছেলের কারণে কলকাতার এই কালীপুজোকে বরাবর এড়িয়ে চলতে চেয়েছি। কিন্তু শেষের দু'বছর তাকে নিয়ে আর নড়া সম্ভব হয় নি। কি উদ্বেগের মধ্য দিয়ে এই কটা দিন আমাদের কাটত ভোলার নয়। বিকেল থেকেই তার দু'কানে মোটা করে তুলো গুঁজে রাখতাম। তা সত্ত্বেও বাজীর উৎকট শব্দে চমকে চমকে উঠত। বিসর্জনের উল্লাসের দিনে আরো কাহিল অবস্থা। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠত, সমস্ত শরীর

লাল হয়ে যেত, মনে হতো দম বন্ধ হয়েই না শেষ হয়ে যায়। আর আজ অবধূতের বাড়িতে কল্যাণী মাতাজীর সেই কালপুজো দেখার আকর্ষণে আমাদের দিন কয়েক আগে বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফেরা।

অবধূত ভারী খুশী। তিনজনকেই নজর করে দেখে মন্তব্য করলেন, সকলকেই বেশ তাজা দেখাচ্ছে আপনাদের।

কল্যাণীর খুশীর ভাব কেবল মুখের স্নিগ্ধ হাসিটুকুর মধ্যেই প্রকাশ। মেয়েকে বললেন, তোমার কথা সকাল থেকে অনেকবার মনে হয়েছে।

অতিথি অর্থাৎ ভক্ত সমাগমের দেরি আছে। কেবল কয়েকটি মহিলা এসে যোগানদারীর কাজে লেগেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে দেখে শুধু আমি কেন, মনে মনে আমার স্ত্রী আর মেয়েও অবাক একটু। আমার মনে হয়েছিল ঠিক সেই মহিলাকেই দেখছি না আর কাউকে দেখে ভুল করছি!

কল্যাণী মায়ের শিষ্য শ্রীরামপুরের সেই অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের ঘরণী—মাতাজীর প্রতি স্বামীর গদ্-গদ্ ভক্তি-ভাব যিনি আদৌ সরল চোখে দেখতেন না। মাতাজীর রূপের টানটাই স্বামীর বড় আকর্ষণ ভাবতেন। মাতাজীটিও যে তাঁর সম-বয়সী, বয়েস একান্ন বাহান্ন সে-তো দেখে কারোর বোঝার উপায় নেই। এই মহিলাও যৌবনকালে বেশ রূপসী ছিলেন বোঝা যায়, কিন্তু বয়সের ছাপ গেল বারে তাঁর পরিপাটি প্রসাধনের আড়ালে থাকা দূরে থাক, বরং যেন একটু বেশিমাত্রায় প্রকট হয়ে পড়েছিল মনে আছে। গেল বারে তিনি এসেছিলেন তাঁর স্বামীরত্নটিকে তীক্ষ্ণ প্রহরায় রাখার গুরু দায়িত্ব নিয়ে। সেবারে এঁকেই ইশারায় দেখিয়ে অবধূত আমাকে বলেছিলেন, একটু রসের খোরাক পেতে চান তো ওই মহিলার ওপর নজর রাখুন—এত লোকের মধ্যে ওই মহিলাই কেবল আমার স্ত্রীটিকে বরদাস্ত করতে পারেন না, আবার তাঁর ভদ্রলোকটিকে আঁচল-ছাড়াও করতে পায়েন না।

...গেল বারের সে প্রহসন ভোলবার নয়। সারাক্ষণই তাঁর উগ্র টানধরা মেজাজ। এই মেজাজের কারণ মাতাজীর অন্য ভক্তরাও জানত এবং লজ্জা পেত। আর স্বামীটির তো বিড়ম্বনার একশেষ। তিনি একাই মাতাজীর শিষ্য, স্ত্রী নন। তাই কারো লাজ-লজ্জার ব্যাপারে তাঁর ভ্রূক্ষেপও ছিল

না। মাতাজী পুজোয় বসার আগে সকলকে পেট পুরে রাতের খাওয়া খেয়ে নেবার নির্দেশ শুনে আহারে বসেই তিনি শ্লেষের শর নিক্ষেপ করে-ছিলেন, কল্যাণীর দিকে চেয়েই সকলকে শুনিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মায়ের পুজোর আগে সকলকে খেয়ে নিতে হবে এটা কোনো শাস্ত্রের নির্দেশ না মাতাজীর নিজের নির্দেশ।

···দোষের মধ্যে তার ভদ্রলোকটিই স্ত্রীর মুখ বন্ধ করার জন্য আগ বাড়িয়ে বলে ফেলেছিলেন, মাতাজীর নির্দেশ মানেই শাস্ত্রের নির্দেশ। শোনামাত্র মহিলা স্বামীকে দাবড়ানি দিয়ে থামিয়েছিলেন। এই নিয়ে অন্য ভক্তদের সঙ্গেও মহিলার বিতণ্ডা অস্বস্তিকর হয়ে উঠছিল। পুরুষ ভক্তদের কেন এত ভক্তির আদিখ্যেতা খুব সূক্ষ্মভাবে সে আভাস দিতেও ছাড়েন নি। হাসিমুখে শেষে কল্যাণীই তাঁকে ঠাণ্ডা করেছিলেন, বলেছিলেন, না মা, শাস্ত্রে, খেয়ে পুজোর কথাও নেই না খেয়ে পুজোর কথাও নেই—মানুষের অভিরুচিটাই সংস্কার আর নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে। মায়ের ছেলে-মেয়েরা উপোস করে মা-কে ভোগ খেতে দেখবে এ আমার ভালো লাগে না বলেই এখানে আগে খেয়ে নেবার ব্যবস্থা। তাঁর সেই হাসিমুখের কথাগুলো আমার কানে লেগেছিল বলেই এই মহিলাকে দেখামাত্র গেল বারের ওই প্রহসন মনে পড়ে গেল। ··আর সঙ্গে সঙ্গে সেই শেষের চমকও।···নিজস্ব পদ্ধতির সেই পুজো এবং বিচিত্র রকমের আরতি শেষ করে সকলের মাথায় ঘটের শান্তি-জল ছিটিয়ে প্রদীপের আশিস-ছোঁয়া তপ্ত হাত শ্রীরাম-পুরের ওই ভদ্রমহিলার মাথায় রাখতেই তিনি তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করে উঠে-ছিলেন, কি হলো·! কি হলো! এ আমার কি হলো।···তারপরেই পাশের মহিলার কোলে ঢলে পড়ে অজ্ঞান। হতভম্ব বিমূঢ় সকলে···তারপরেই মাতাজীর তৎপর হাতের শুশ্রূষা—পুজোর ঘটি থেকেই জল নিয়ে তাঁর চোখে মুখে জোরে জোরে ঝাপটা দিতে তবে জ্ঞান ফেরে। ··তার পরেও ভয়ার্ত আর্ত দৃষ্টি।···উপুড় হয়ে মাতাজীর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

পরদিন আমাদের কাছে কল্যাণী নিজেই হাসিমুখে ওই ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মানুষের মন সবল হতে সময় লাগে, দুর্বল সহজেই হয়। পুজোর সময় এতগুলো মানুষের তন্ময়তার প্রভাব কিছু

আছেই···এই প্রভাবে মহিলার মন যত তুর্বল হয়েছে নিজের ভিতরের অপরাধ-বোধ ততো বেড়েছে, এই অবস্থায় তাঁর স্নায়ু তো স্পর্শকাতর হতেই পারে—আমি ওর মাথায় হাত রাখতে নিজের স্নায়ুর সঙ্গে নিজেই আর যুঝতে পারেন নি—এতে আমার কোনো কেরামতি নেই।

···কল্যাণী ভিতরে চলে যাবার পর অবধুতের সেই মন্তব্যও কানে লেগে আছে, যেন একবছর নয়, তু'পাঁচ দিন আগে শোনা। বলেছিলেন, আমারও ওই এক কথা, ওঁর কোনো কেরামতি নেই, কোনো ব্যাপারে আমাদের কারো কোনো কেরামতি নেই···কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে একেবারে কারোরই কি নেই? কেন এমন হয়···কে করে···কে ঘটায়?

একবছর বাদে এসে শ্রীরামপুরের মহিলাকে দেখে মনে হলো অলক্ষ্যের কোনো ঘটন-পটিয়সীর কোনো মাহাত্ম্যই আবার নতুন করে দেখছি।··· কল্যাণী মাতাজীর পিছনে ছায়ার মতো লেগে আছেন সেই ভদ্রমহিলা, তাঁর স্বামী তখন পর্যন্ত অনুপস্থিত। তিনি রান্নায় সাহায্য করছেন, পুজোর আয়োজনে সাহায্য করছেন, ঘুরে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করছেন, মা এটা দিয়ে কি হবে, ওটা কি করে করব···। কল্যাণীকেও একবার স্নেহের ধমকের স্নুরেই বলতে শুনলাম, যেমন করে হয় করো না বাপু, ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকলে যেভাবে করো তা-ই ভালো।

গেল বছর ওঁকে আপনি-আপনি করে বলতেন। এখন তুমি।

···আমি হাঁ হয়ে দেখছি। মহিলার পরনে খুব চওড়া লালপেড়ে গরদের শাড়ি, গায়ে ওই রঙেরই হাল্‌কা গরম কাপড়ের ব্লাউজ। এক পিঠ খোলা চুল। কপালে বড় সিঁতুর টিপ, সিঁথিতে চওড়া টকটকে সিঁতুর। প্রসাধনের ছিটেফোঁটাও নেই। স্নিগ্ধ স্নুন্দর একখানা মায়ের মুখ। কল্যাণীর পাশে যেন এমন মূর্তিই মানায়। ফিরে দেখি অবধূত মিটি-মিটি হাসছেন। চোখো-চোখি হতে জিজ্ঞেস করলেন, চিনলেন?

—খুব···কিন্তু না-চেনার মতো নতুন।

বলতে বলতে আখের গুড় আর সেই মুখরোচক মশলা মেশানো সরবত হাতে সেই মহিলাই হাজির। বললেন, মা পাঠিয়ে দিলেন—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সরবতের গেলাস হাতে নিলাম। অবধূত বললেন, দাঁড়াও,

এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—

সপ্রতিভ মুখে মহিলা বললেন, পরিচয় মায়ের মুখে শুনেছি···তাছাড়া গেল বছরেও এঁদের সকলকে দেখেছিলাম।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, গেল বছর আমিও আপনাকে দেখেছি মনে আছে···

সঙ্গে সঙ্গে অবধূতের সরস প্রশ্ন, ঠিক এঁকেই দেখেছিলেন বলছেন ?

আমি অপ্রস্তুত। এ-টুকতেই বোঝা গেল মহিলাও বুদ্ধিমতী কম নয়। জিভ কেটে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

মহিলার নাম শুনলাম প্রভা ঘোষ। ওঁর স্বামী বীরেশ্বর ঘোষের শ্রীরামপুরে সুতো আর রঙের মস্ত কারবার। দুটো ছেলে একটা মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু ছেলেরা দু'জনের একজনও বাপের কাছে থাকে না এটাই দুঃখ। আর ছেলেদের অভিযোগ মা তাদের বউদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না। আর মায়ের পাল্টা ক্ষোভ বাপের দৌলতে যে-ছেলেরা এতবড় কারবারের অংশীদার, তাদের বউদের অত দেমাক হবে কেন ! মোট কথা ভদ্রলোকের গৃহ শান্তির বড় অভাব ছিল। তার ওপর নাগাড়ে অজীর্ণ রোগে ভুগছিলেন। অনেক চিকিৎসা করিয়েও তেমন ফল পান নি। লোক মুখে অবধূতে নাম শুনে এসেছিলেন। অবধূত তাঁকে বলে দিয়েছিলেন ক্রনিক অ্যামিবিয়সিস, সারতে সময় লাগবে, ধৈর্য ধরে চিকিৎসা করতে হবে। তা তিনি ধৈর্যের পরীক্ষায় উতরেছেন এবং সেরেও গেছেন। সেবারের কালীপুজোর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসে মাতাজীর পুজো দেখে তিনি মুগ্ধ। ততদিনে অনেক ভক্তের সঙ্গেই তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে শ্রীরামপুরের ভক্তও জনা দুই ছিলেন যাঁরা ঘোষ-মশাইয়ের বাড়ির অশান্তির কথা জানতেন। তাঁদের পরামর্শ মাতাজীকে ধরে পড়ুন, দীক্ষা নিন, সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। তাঁদের আবার ধারণা, বাবার সমস্ত শক্তির উৎস মাতাজী। হেসে হেসে অবধূত বলেছিলেন, কল্যাণীর সব থেকে বড় পাবলিসিটি অফিসার হলো গিয়ে হারু—ওষুধের গাছগাছড়া শেকড়বাকড় লতাপাতা যোগানের কাজ করেই যে চুল পাকালো। ব্যাটা করে আমার কাজ আর গুণকীর্তন করে বেড়ায় কেবল

ওই মাতাজীর।

রোগী বা ভক্ত যে-ই আসুক হারুর সঙ্গে তার খাতির হয়েই যায়। ওর একটা মন নাকি এখনো সেই বক্কোমুনির থানেই বাস করছে। রোগী বা ভক্তদের কংকালমালী ভৈরব আর ভৈরবী মায়ের মহিমার গল্প শুনতেই হয়। দশ বছর বয়সে যে মেয়েকে জাগ্রত-শিব-তুল্য মহাভৈরব কংকাল-মালী নিজের কোলে বসিয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন, সেই মেয়ে অশেষ শক্তির আধার ছাড়া আর কি ? ওই মহাভৈরবের আশীর্বাদে কালে-দিনে ভৈরবী মায়ের থেকেও অনেক বেশি শক্তির অধিকারিণী হবেন হারু সেটা বরাবরই বিশ্বাস করত। তখন অবশ্য হারু জানত না দশ বছরের সেই মেয়ে অর্থাৎ আজকের মাতাজী সেই ভৈরবী মায়েরই মেয়ে। অবধূতের সঙ্গে তাঁর বিয়ের সময় জেনেছে, আর তখনই বুঝেছে মহাভৈরব কেন ওই মেয়েকে এত স্নেহ করতেন।

বিশ্বাসপ্রবণ ধাত যাদের, হারুর মুখে বক্কোমুনির থানের সেইসব চোখে দেখা কাহিনী শুনলে তারা রোমাঞ্চিত হবেই। অবধূত বা তাদের মাতাজীর অতীত জীবনের কথা শুনতে কার না সাধ ?···যাক, বীরেশ্বর ঘোষ ধরে পড়তে অবধূতের কথায় কল্যাণী দেবী তাঁকে দীক্ষা দিতে রাজি হয়েছিলেন। পেটো কার্তিকের ধারণা, বাবার কথা বা অনুরোধ মাতাজী সর্বদা আদেশ হিসেবেই শিরোধার্য করেন। ঘোষমশাইকে কল্যাণী দেবী বলেছিলেন, সস্ত্রীক আসুন একদিন, তখন কথা-বার্তা হবে।

অবধূতের ধারণা, স্বামীর পুরনো অসুখ সেরে যাবার ফলে ভদ্রমহিলা একটু ভক্তি-বিশ্বাস নিয়েই এসেছিলেন হয়তো। কিন্তু যাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে হবে তাঁকে দেখেই বিগড়ে গেলেন, ভক্তি-বিশ্বাসও রসাতলে। নিজেও বড় ঘরের রূপসী আর মোটামুটি শিক্ষিতা মেয়ে ছিলেন। সেই রূপ যে অবধারিত ক্ষয়ের মুখে, চেষ্টা করেও আর ধরে রাখা যাচ্ছে না, এই খেদ মনের তলায় ছিলই। এখানে এসে যাঁকে দেখলেন তুলনামূলক বিচারে তিনি ঢের বেশি সুন্দরী তো বটেই, তার ওপর ভরা-যৌবনই বলা চলে। মোট কথা তারই সমবয়সী যে এটা তিনি কল্পনাও করতে পারলেন না। এই একজনের কাছে দীক্ষা নিতে হবে—এঁরই কাছে দীক্ষা

নেবার জন্য তাঁর ঘরের লোকের এত আগ্রহ এত উন্মাদনা !

আগ্রহ আর উন্মাদনার কারণটা মহিলার কাছে জলের মতো স্পষ্ট।··· দীক্ষা সম্পর্কে কোনো কথাই হলো না। দু'চার কথার পর কাজের তাড়া দেখিয়ে মহিলা আগে ভাগে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

তারপর দেড় দু'মাসের মধ্যে ভদ্রলোকেরও আর দেখা নেই। তাঁরা চলে যেতেই কল্যাণী নাকি হেসে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মাঝখান থেকে আমারও ভক্ত গেল তোমারও রোগী গেল—কেন যে দীক্ষা নেবার জন্য তুমি হুটহাট লোককে বলো—

আমিও সায় দিয়ে বললাম, সত্যিই এটা অন্যায় আপনার, দীক্ষা নেবার জন্য লোক পাঠিয়ে আপনি নিজের স্ত্রীকে এ-ভাবে উত্যক্ত করেন কেন ? কার্তিক বলছিল আপনি হুকুম করলে তবেই উনি দীক্ষা দিতে রাজি হন, নইলে নয় ?

মুচকি হেসে অবধূত বললেন, স্ত্রীকে উত্যক্ত করি দুই কারণে, আর আমার বিবেচনায় দুটোই সায়েন্টিফিক।···আচ্ছা র‍্যাপর্ট্ শব্দটার বাংলা কি ?

—মনোগত সম্পর্ক বা সম্বন্ধ বলতে পারেন।

—বেশ···প্রাকৃতিক নিয়মেই ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের আর মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের এই র‍্যাপর্ট্ বা মনোগত সম্পর্কটা ভালো হয়—এটা একটা স্বীকৃত সত্য মানেন তো ?

—মানি, তবে দুজনের কেউ যদি রিপালসিভ না হয়।

অবধূত জোরেই হেসে উঠলেন।—আপনি জানেন না, মনের ছোঁয়া পেলে রিপালসিভ হলেও র‍্যাপর্ট্ ভালো হয়। সে যাক, আমার স্ত্রীকে মুনি ঋষিরাও কেউ রিপালসিভ বলবে না।···আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও এই র‍্যাপর্ট্ কথাটা খাটে। আমার ভৈরবী মা আমার কাছে যতো কাছের, স্বয়ং আমার গুরুও ততো নন। এই সত্যটার ওপর গুরুত্ব দিয়েই দীক্ষা নেবার বেলায় আমার স্ত্রীর কাছে লোককে পাঠাই। আর, দ্বিতীয় কারণটা আরো বেশি সায়েন্টিফিক। দীক্ষা বলতে আমি বুঝি কর্মের গতানুগতিক সংস্কার থেকে যতটুকু পারা যায় মনটাকে অন্যদিকে সরানো। জপ মানেও অন্যত্র মনোনিবেশ। এখন এই বীরেশ্বর ঘোষের ব্যাপারটাই ধরুন।

বাড়িতে দেমাকের স্ত্রী নিয়ে অশান্তি, ছেলে ছেলের বউদের নিয়ে অশান্তি আর তার সঙ্গে ব্যবসায়ের চিন্তা—এই চিন্তা আর অশান্তি থেকেই ভদ্র-লোকের ক্রনিক পেটের রোগ। ঘুমের মধ্যেও এগুলো অবচেতন মন থেকে সরে না। ওষুধে আর বিশ্বাসে অনেকটাই সুস্থ হলেন তিনি, কিন্তু রোগের মূল কারণ ওই অশান্তি আর চিন্তা থেকে তাঁর মনটাকে তুলে না আনতে পারলে ফের রোগে পড়তে কতক্ষণ ? ··এখানকার মাতাজীর সম্পর্কে নানাজনের মুখে নানারকম বিশ্বাসের কথা শুনে আর তারপর তার কালীপুজো দেখে ভরপুর বিশ্বাস নিয়ে নিজেই তিনি মাতাজীর কাছ থেকে দীক্ষা নেবার জন্য ব্যগ্র হলেন, আর তক্ষুনি আমিও কর্মের চিরা-চরিত সংস্কার থেকে তাঁর মন সরানোর খাঁটি রাস্তা পেয়ে গেলাম আর কল্যাণীকে ডেকে দীক্ষার ফতোয়া দিলাম, কিন্তু কল্যাণী গোল বাধালে এর মধ্যে আবার তাঁর স্ত্রীকে টেনে।

আমি উৎসুক।—দেড় মাস বাদে ভদ্রলোক আবার একাই এলেন ?

—এলেন তো বটেই, একখানা ঝড়ো কাকের মতো এলেন। আগের থেকেও ডবল দুশ্চিন্তা, এখানে আমাদের মুখ দেখাবেন কি করে। আবার পেটের রোগ শুরু হতে না এসে পারলেন না

অবধূত এরপর কল্যাণীর ভুল শুধরাবার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁকে ডেকে বলেছেন, এঁর দীক্ষা নেওয়া খুব দরকার, এর স্ত্রীর এখনো দীক্ষা নেবার সময় আসে নি—তুমি এঁর ব্যবস্থা করো।

···দীক্ষা হয়েছে। দেখতে দেখতে তারপর ঘোষমশাই অন্য মানুষ। কিন্তু তাঁর স্ত্রীটি দ্বিগুণ উতলা, স্বামীর ভাবাবেগ আর জপে তন্ময়তা একটুও স্বাভাবিক বা অকৃত্রিম মনে হয় নি। নাম জপ করে না রূপ জপ করে কে জানে, সপ্তাহে দু'দিন তিনদিন করে কোন্নগরে ছোটার তাড়া কেন ? শাসন করেও আটকানো যায় না কেন। গায়ে শান্তির বাতাস লেগেছে না মাতাজীর রূপের বাতাস ?

এই প্রতিক্রিয়ার ফল গত বছর কালীপুজোর রাতে নিজের চোখেই দেখেছি। এ-বছর আবার শ্রীমতী ঘোষেরও এমন পরিবর্তন। শুনলাম সেবারে ফিট হয়ে বাড়ি ফেরার সাতদিনের মধ্যে স্বামীকে নিয়ে আবার

এসেছেন। আকূতি, তাঁকেও দীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু কল্যাণী বেশ সরল মুখেই এবারে তাঁকে একটু বেগ দিয়েছেন। বলেছেন, আপনার দীক্ষা নেবার সময় হয়েছে কিনা সেটা আপনাদের অবধূত বলে দেবেন, তিনি যেমন বলেন আমি তেমনি করি।

ঠাট বজায় রাখার জন্য মহিলাকে আরো মাসখানেক ঘোরাতেই হয়েছে, তারপর তাঁরও দীক্ষা হয়েছে। এখন তিনি মাতাজী অন্তঃপ্রাণ। তাঁর স্বামী ছেলেদের আর বউদের নিয়ে সন্ধ্যায় আসবেন, কিন্তু মাতাজীর সাহায্যের জন্য উনি সকালেই চলে এসেছেন।'

হাতের সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে মিটি মিটি হেসে অবধূত বললেন, আমি আশ্চর্য হয়ে দেখি বুজরুকির ধাপে-ধাপে পা রেখেও যদি বিশ্বাসের দরজায় পৌঁছনো যায় তাহলে তার এমনি জোর যে সাপের বিষও আর বিষাক্ত থাকে না।...এই পরিবারের ব্যাপারটাই দেখুন, কল্যাণীর হুকুমে মহিলা এরপর যেচে ছেলে আর ছেলের বউদের কাছে যেতে লাগলেন, তাদের ভালো-মন্দের খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। যিনি সর্বদা মেজাজে ফুটতেন তাঁর এই পরিবর্তন দেখে ছেলে বউরা অবাক। বাপের পরামর্শে শেষে একদিন ছেলের বউরাও এ-বাড়িতে এলো—এসে আটকে গেল। তারাও এখন কল্যাণীর শিষ্য। সপরিবারে দুই ছেলেই আবার বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসতে চাইলো। কিন্তু এবারে কল্যাণীই আপত্তি করল, না, বাবা-মাকে যতো পারো ভক্তিশ্রদ্ধা কর কিন্তু যে-যার স্বাধীনতা নিয়ে যেমন আছ তেমনি থাকো। এমন সচ্ছল এক পরিবারের সব অশান্তি যেন যাদু-মন্ত্রে উবে গেল...অথচ আমরা তো কিছুই করলাম না—তাহলে কে কি করল বলুন তো?

অবধূতের এই প্রশ্নের জবাব কোনোদিন দেবার চেষ্টা করি নি।

বিকেল গড়িয়ে চলেছে। আমরা কখনো সামনের দাওয়ায় কখনো বা পিছনের আঙিনায় পায়চারি করছিলাম। অবধূত মাঝে মাঝে এটা-সেটা বলছেন আর একের পর এক সিগারেট টেনে চলেছেন। পেটো কার্তিকের শুনলাম সকাল থেকে ফুরসৎ নেই। সমস্ত কেনাকাটা আর ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব তার। গত বারে জনা পঞ্চাশেকের নেমন্তন্ন ছিল, এবারে

শুনলাম পঁচাত্তর আশি হবে।

শ্রীমতী প্রভা ঘোষ ছাড়া আরো সাত আট জন মহিলা তাদের মাতাজীর সাহায্যে ব্যস্ত। এদের মধ্যে বার কয়েক একটি অবিবাহিত মেয়েকে দেখলাম। সেই থেকে মুখ বুজে কাজ করে চলেছে। দুর্বো বাছছে, পিটুলি বাটছে, এটা-ওটা নিয়ে আসছে, রেখে আসছে। এখন দেখছি পিছনের দাওয়ায় উপুড় হয়ে বসে নিবিষ্ট মনে বড় করে আল্পনা আঁকছে। আমার হাতে একটা আঙুলের খোঁচায় ইশারা করে অবধূত সেদিকে এগোলেন। কিন্তু পাঁচ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়ানো সত্ত্বেও মেয়েটির নিবিষ্টতায় ছেদ পড়ল না, আমাদের লক্ষ্য করল না।

—এই মেয়ে মুখ তোল!

ধড়ফড় করে মুখ তুলে তাকালো তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

--তোকে দাঁড়াতে কে বলেছে···এঁকে চিনিস?

আঙুল তুলে আমাকে দেখালেন। মেয়েটি ডাগর দুই চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। বিব্রত ভাব। সামান্য মাথা নাড়ল, চেনে না।

ইশারার কারণ না বুঝে মেয়েটিকে আমি ভালো করে লক্ষ্য করছি। বেশ দীর্ঘাঙ্গী। ভালো স্বাস্থ্য। বছর তেইশ চব্বিশ হবে বয়েস। গায়ের রং ফর্সা তো নয়ই বরং একটু চাপা। আয়ত চোখ দুটো বেশ সুন্দর বলেই মুখখানা মিষ্টি দেখায়।

অবধূত আমার নাম বলে ফের জিজ্ঞেস করলেন, এবারে চিনলি?

এবারে সামান্য মাথা নাড়ল। চিনেছে।

—এঁর কতগুলো বই পড়েছিস?

মুখের বিড়ম্বনা আরো স্পষ্ট। জবাব দিতে পারল না।

—সে কি রে, কোনো বই পড়িস নি তো নাম শুনে চিনলি কি করে?··· কথা বলছিস না কেন, শুধু ব্যাক-ডেটেড নয়, ইনি তোকে বোবা ভাবছেন—

এবারে মৃদু জবাব দিল, নাম শুনেছি···

—কোথায় শুনেছিস?

—এ বাড়িতেই।

অবধূত হাসছেন।—তোর মাতাজীকে বলব তোকে আর একটু স্মার্ট করে দিতে, কথা বলতে হলেই অত মিইয়ে যাস কেন? ঠিক আছে কাজ কর—

মেয়েটা যেন হাঁপ ফেলে বাঁচল। আমরা ফিরলাম।

এ-ভাবে আমাকে ডেকে নিয়ে কথা বললেন যখন কিছু ব্যাপার আছে। জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটি কে?

হেসে জবাব দিলেন, ঘটনার সাজের আর একজন। ওর নাম সুষমা, শ্রীমতী প্রভা ঘোষের খুড়তুতো বোনের মেয়ে, কল্যাণীর নতুন রিক্রুট, মাস আড়াই যাবত তার কাছে মানে এ-বাড়িতেই আছে। তার আগে প্রভা ঘোষ তাকে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন। সে যাক, আগে বলুন কালো হলেও মেয়েটিকে দেখলেন কেমন?

হেসে ফিরে বললাম, আমার মতামত জেনে কি হবে, কারো সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ-টম্বন্ধ করার দায়ে পড়েছেন নাকি?

প্রশ্ন শুনে অবধূত হেসে উঠলেন। ভারী খুশি।—ঠিক ধরেছেন।··· খানিক আগে আপনি বলছিলেন না, ছেলে বা মেয়ে তুজনের একজন যদি দেখতে রিপালসিভ হয় তাহলেও তাদের মধ্যে র‍্যাপ্‌রট্ হতে পারে না—আর আমি জবাব দিয়েছিলাম, মনের ছোঁয়া পেলে রিপালসিভ হলেও র‍্যাপ্‌রট্ ভালো হয়—এই মেয়েকে নিয়ে এখন আমার সামনে সেই এক্সপেরিমেণ্ট।

আমি বিমূঢ় একটু।—কিন্তু কালো হলেও মেয়েটি তো মোটেই রিপাল-সিভ নয়, লম্বা, স্বাস্থ্য আর মুখশ্রীও ভালো—

একটা হাত তুলে অবধূত আমাকে থামিয়ে দিলেন, আরে মশাই আপনি একেবারে এক তরফা ভাবছেন, মেয়েটি রিপালসিভ আমি একবারও বলেছি, ছেলেটি তো রিপালসিভ হতে পারে!

আমি আবার অথৈ জলে।

এরপর মেয়েটির সমাচার শুনলাম। শ্রীমতী প্রভা ঘোষের খুড়তুতো বোনের মেয়ে সুষমা—বারো বছর বয়সের মধ্যে বাবা মা তুজনকেই হারিয়েছিল। দশ বছর বয়সে বাবা গেছে, বারো বছরে মা। জয়েণ্ট

ফ্যামিলির কাকা-কাকীমারা ভরসা। মা মারা যাবার পর থেকে মেয়েটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল এটা লক্ষ্য করেও কেউ খুব গা করে নি। ভেবেছিল শোক সয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক হয় নি। তার খেলা-ধুলো হাসি-খুশি সব গেল। মুখ বুজে স্কুলে যাতায়াত করে। কিন্তু কোনো কোনো দিন তা-ও যায় না, কাকীমারা বকাবকি করে কাকারা বিরক্ত হয় —কিন্তু সে বসে আছে তো বসেই আছে। কেন যাবে না বলে না, কারো কথার জবাব দেয় না।

পনেরো বছর বয়সে মেয়েকে ফিটের রোগে ধরল। পনেরো দিন বিশ দিন এক মাস অন্তর স্কুলে গিয়ে ফিট হয়, নয়তো বাড়িতে। কাকারা কাকীমারা মহা বিরক্ত, মেয়ের নিজেরও ভালো থাকার কোনো চেষ্টা নেই। ডাক্তার দেখানো হচ্ছে কিন্তু নিজে গরজ করে ওষুধ খাবে না, কারো সঙ্গে বেড়াবে না কথা বলবে না, হাসির কথায় হাসবে না পর্যন্ত। পারলে সারাক্ষণ নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে। এমনি ডাক্তারের পরামর্শে মানসিক ডাক্তার দেখানো হলো। তার চিকিৎসার ফলে ঘুম আর শুয়ে বসে থাকাই বাড়তে থাকল, তেমন ফল বিশেষ দেখা গেল না। মনের ডাক্তার বিধান দিল, তার চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে সাইকো অ্যানালিসিসের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষিত কাকা কাকীমাদের কারো এই রোগটার ওপরেই বিশ্বাস নেই। এ আবার একটা রোগ নাকি—ও তো ইচ্ছে করলেই ভালো থাকতে পারে—ইচ্ছে করবে না, কারো কথা শুনবে না, মর্জি আর গোঁ ধরে পড়ে থাকবে—এর আর চিকিৎসার কি আছে? সাইকো অ্যানালিসিস বলতে তারা বোঝে রোগীর সঙ্গে কথা বলে রোগ সারানো। কথা তারা দিবা-রাত্রই বলছে, কার কথা মেয়ে শুনছে? মাঝখান থেকে সাইকো-অ্যানালিসিস তো হলোই না, মনের রোগের চিকিৎসাও বন্ধ হয়ে গেল। আর মেয়ের ফিট হওয়া ক্রমশঃ বাড়তে থাকল।

…স্কুলে বেশ ভালো ছাত্রী ছিল। কিন্তু বছর নষ্ট করে করে সেকেণ্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করতেই সুষমার একুশ বছর গড়িয়ে গেল। শেষ যে বারে পাশ করতে হবে পণ করে মোটামুটি পড়াশুনা

করে পরীক্ষা দিল, সে বারে পাশ তো করলই—শেষের চার পাঁচ মাসের মধ্যে ফিটও হলো না। পরীক্ষার পরেই আবার যে কে সেই। তাকে আর কলেজেও ভর্তি করানো গেল না। কে একজন পরিচিত ডাক্তার তার বড় কাকাকে বলেছিল, এ-সব রোগ অনেক সময় ফাংশানালও হয়, অর্থাৎ রোগী নিজেই নিজের রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু নিজেই নিজের রোগ সৃষ্টি করাটাও যে বড় রকমের মানসিক অসুখই এটা কারো মাথায় এলো না। কাকারা এবার কড়া শাসনের দিকে এগোল। কিন্তু মার-ধোর করেও তাকে কলেজে পড়তে পাঠানো গেল না। উল্টে আরো ঘন ঘন ফিট হতে লাগল। কাকারা রেগে গিয়ে বলে ফিট না হাতি, হিস্টিরিয়া—থাক পড়ে!

হিস্টিরিয়াও যে একটা রোগই তাই বা কে বলে দেয়। শেষে সকলের টনক নড়ল একদিন। বেলা গড়িয়ে যায়, মেয়ে ঘুম থেকে ওঠে না, ঘরের দরজাও খোলে না। চিৎকার চেঁচামিচি হাঁক-ডাক কিন্তু কোনো সাড়া নেই। দরজা ভাঙা হলো। সুষমা তার বিছানায় নিঃসাড়ে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে। পশে একটা খালি ট্যাবলেটের শিশি। ছোট টেবিলে তার লেখা একটা চিঠিও পেপার ওয়েট চাপা দেওয়া আছে। লিখেছে, আমার মৃত্যুর জন্য এই পৃথিবীর কেউ দায়ী নয়। এই জীবন আর টানতে পারছিলাম না। তাই চলে যাচ্ছি।

তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে পেটে যা ছিল পাম্প করে বার করা হলো। দেখা গেল এন্তার ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। এত খেয়েছে যে আর দু'তিন ঘণ্টা গেলে কিছুই করা যেত না। কিন্তু যে মেয়ে বাড়ি থেকে মোটে বেরুতো না সে এত ঘুমের ওষুধ পেল কি করে—পেল কোথা থেকে?

পরে হাসপাতালের জেরায় সুষমা নিজেই স্বীকার করেছে মনের রোগের চিকিৎসার সময় ডাক্তারের প্রেসক্রুপশন অনুযায়ী যে ঘুমের ওষুধ তাকে দেওয়া হতো তার বেশিরভাগ সে না খেয়ে জমাতো। তার মন বলত এগুলো একদিন কাজে লাগবে।

এরপর সুষমার কাকা কাকীমাদের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। যোগাযোগ

এমনি যে ঠিক এ-সময়েই প্রভা ঘোষ তাঁর মাতাজীকে পেয়ে জীবন সার্থক ভাবছেন। বাবা আর মাতাজীর ওপর তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস। বাপ-মা মরা খুড়তুতো বোনের এই মেয়েটিকে তিনি স্নেহ করতেন। সুষমার রোগের খবর বরাবরই রাখতেন। কিন্তু তখন তাঁর বিশ্বাসও ছিল না, করারও কিছু ছিল না। ঘুমের ওষুধ খেয়ে সুষমার মরার চেষ্টার কথা শুনে তিনি কলকাতায় তাদের বাড়িতে এসে হাজির। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর মেয়ের আবার ঘন ঘন ফিট হচ্ছিল।

তাদের সঙ্গে কথা বলে প্রভা ঘোষ স্বামীকে নিয়ে সোজা কোন্নগরে চলে এলো। অহংকার গিয়ে এখন তাঁর সকলের জন্য আবেগ আর আকুতির দিকটাই বড়। তিনি বাবা আর মাতাজীকে ধরে পড়লেন মেয়েটাকে সারিয়ে দিতেই হবে। অবধূত পরের মঙ্গলবারে শ্মশানে যাবার দিন সকালের দিকে মেয়েটিকে একবার নিয়ে আসতে বললেন। তার আগে অবশ্যই রোগের আর মেয়েটির সম্পর্কে সব খুঁটিয়ে জেনে নিলেন।

যথা দিনে সুষমাকে নিয়ে তাঁরা এখানে এসে উপস্থিত। সঙ্গে ঘোষ দম্পতী ছাড়া মেয়ের এক কাকা আর কাকীমাও আছে। মাসির নির্দেশে সুষমা মাতাজী আর অবধূত দুজনকেই প্রণাম করল। অবধূত বললেন, ওরা আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেয়েটির দিকে চেয়ে একটা মজা দেখলাম। আমাকে নয়, বার বার চোখ তুলে সে কল্যাণীকে দেখছে। এই দেখার সাদা দিকটা তিনি খুব ভালো জানেন। অনেকেরই দেখা-মাত্র কল্যাণীকে ভালো লাগে, এই মেয়েরও লেগেছে। মেজাজী আর অহংকারী মাসির পরিবর্তন দেখেও ওর প্রতি কিছুটা বিশ্বাস হয়তো আগে থাকতেই গজিয়েছিল। তাছাড়া কল্যাণীকে প্রণাম করে উঠতেই উনি বলেছিলেন, মাতাজী তোর সব যন্ত্রন্না ম্যাজিকের মতো দূর করে দেবেন দেখিস—

যাই হোক মেয়েটিকে বেশ ভালো করেই দেখলেন অবধূত। তাঁর প্রথমেই মনে হলো দীর্ঘদিন ধরে ওর ভিতরে সত্তার হাহাকার চলেছে। ওই সত্তা নিরাশ্রয়। চোখের তারার গভীরেও কিছু একটা অনিশ্চয়তার আতঙ্ক। অসময়ে বাপ-মা চলে গেলে অনেক ছেলে মেয়ের আশ্রয়শূন্যতার অনুভূতি

চাপা আবেগের দিকে গড়িয়ে সেটা পরিপুষ্ট হতে থাকে। তখন একটা কিছু আশ্রয় সে আঁকড়ে ধরতে চায়। এই মেয়ে নিজের আগোচরে রোগের আশ্রয় আঁকড়ে ধরে আছে। এটা সাধারণ মানুষ ছেড়ে সাধারণ ডাক্তারদেরও ধরা-ছোঁয়ার মতো রোগ নয়, কায়িক কোনো রোগও বলা চলে না হয়তো, কিন্তু রোগের বাড়া। এর যন্ত্রণা এমনি যে আত্মহত্যা করেও নিষ্কৃতির পথ খুঁজেছে মেয়েটি।

হাত দেখলেন। আয়ু রেখা সরল সুস্থ। সংসার জীবনযাপনের লক্ষণও কপালে আর হাতের রেখায় স্পষ্ট।

যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে। এর চিকিৎসাও তিনি জানেন। কিন্তু এর পর ভড়ঙের দিকটা গুরু গম্ভীর করে না তুললে রোগী বা তার আত্মীয়-পরিজনেরা সে-রকম গুরুত্ব দেবে না।

—তোমার নাম কি ?

মৃদু জবাব, সুষমা !

—সুষমা মানে কি ?

নিরুত্তর।

—জানো, না জানো না ?

—লাবণ্য···

—কত দিনের মধ্যে আয়নায় নিজের মুখ দেখ না ?

জবাব নেই।

—যা খাও ভালো হজম হয় না, প্রায়ই অম্বল হয়ে যায় তো ?

মাথা নাড়ল। তাই হয়।

—তবু টক ঝাল নুন আর ভাজাভুজিই বেশি খাও কেন ?

সুষমার দু'চোখে বিস্ময়ের ছায়া। তার থেকেও বেশি ওর কাকা আর কাকীমার চোখে।

—থেকে থেকেই জলতেষ্টা পায়, আর সবসময় কিছু না কিছু চিবুতে ইচ্ছে করে—তুমি কি চিবোও, পান না সুপুরি না মৌরি ?

ওর কাকীমা বলে উঠল, এই তিনটের যা পায় তা-ই মুখে নিয়ে চিবোয় —কাঁচা পান পর্যন্ত !

গল্প থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে অবধূত হেসে বললেন, এই ঝাপ-তালকে আপনি যেন আবার অলৌকিক ক্ষমতা ভাববেন না—সব নার্ভ-টেনশনের রোগীর বেলাতেই এ-সব লক্ষণ কম-বেশি খাটে। খাটে আমিও জানি। তবু অলৌকিক না হোক ক্ষমতা কিছু আছে সেটা মনে মনে অন্তত স্বীকার না করে উপায় নেই। হরিদ্বারে যাবার পথে আমার স্ত্রীর মুখ আর কপালে শোকের ছায়া দেখেছিলেন, মেয়ের জিভের রঙ দেখে লিভারের গোলযোগের কথা বলেছিলেন। উনি বলেন এগুলো শিক্ষা আর অভ্যাসের ব্যাপারে, চেষ্টা করলে সকলেই রপ্ত করতে পারে। কিন্তু গত এক-দেড় বছর ধরে এই চেষ্টার এত নজির দেখলাম যে মাঝে-মাঝে নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

কথা না বাড়িয়ে বললাম, জানি, তারপর?

তারপর অবধূত কল্যাণীকে বললেন, সুষমাকে তার পুজোর ঘরে নিয়ে যেতে। মেয়েটির কাকা-কাকীমার প্রতি তাঁর মুখ-ভাব প্রসন্ন নয়। এটুকুও তাদের সীরিয়াস করে তোলার জন্য। মন্তব্য করলেন, এবারে সময়ে ধরা পড়েছে তাই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বাঁচাতে পেরেছেন, ফের যদি চেষ্টা করে আট-ঘাট বেঁধেই করবে, কিছু করার সুযোগ না-ও পেতে পারেন। সুষমার কাকা-কাকীমা আঁতকেই উঠলেন। কারণ আত্মহত্যার চেষ্টর খবর শুনে মানসিক চিকিৎসকও তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, সর্বক্ষণ চোখ রাখতে বলে দিয়েছেন।

সুষমার কাকীমা বলে উঠল, আবারও এই চেষ্টা করবেই বলছেন?

—করবেই বলছি না, করলে শক্ত ব্যাপারে হবে, আর আপনারাও ফ্যাসাদে পড়তে পারেন।

মহিলার ঘেমে ওঠার দাখিল।—প্রভাদি বলেছিলেন আপনি আর মাতাজী হাতে নিলে আর চিন্তা নেই, আপনারা দয়া করে কিছু বিহিত করুন।

অবধূত প্রভা ঘোষের দিকে তাকালেন, এ-রকম কাউকে বলবে না, আমাদের নিজেদের কারো কোনো ক্ষমতা নেই।...আজ মঙ্গলবার, শ্মশানে থাকব জানোই তো, সুষমাকে নিয়ে কাল বিকেলের দিকে এসো...আজ-কের রাতটা ওকে শ্রীরামপুরে তোমার কাছে রাখার সুবিধে হবে?

প্রভা ঘোষ তক্ষুনি মাথা নাড়লেন, কেন হবে না, ওকে আমি সমস্ত রাত বুকে আগলে রাখব—

—এক রাত রাখবে কি কত রাত সে আমি কাল বলব। কাকা-কাকীমার দিকে ফিরলেন, আপনারাও কাল বিকালের দিকে আসবেন, এখন কলকাতায় ফিরে যান।

তারা উঠে ভাইজির সঙ্গে দেখা করতে আর ঠাকুর প্রণাম করতে কল্যাণীর ঘরে এলো। এসে স্তব্ধ, হতবাকও।···মাতাজী মেঝেতে সুষমাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন, দুজনেরই দৃষ্টি মায়ের পটের দিকে। সুষমার দু'গাল বেয়ে ধারা নেমেছে।

···না, আজ অনেক বছরের মধ্যে কাকারা বা কাকীমারা বা বাড়ির কেউ এ-মেয়ের চোখে কখনো জল দেখে নি, তাকে কাঁদতে দেখে নি।

আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করে বসলাম, এটা হলো কি করে···কল্যাণী দেবী কিছু করেছেন?

—যা ঘণ্টা, মনস্তাত্ত্বিক লেখক হয়েও এটুকু বুঝলেন না! বারো বছর বয়সের মধ্যে বাবা-মাকে খুইয়ে তেইশ বছর বয়সে কল্যাণীর কোলে বসে মেয়েটা মায়ের কোলে বসার স্বাদ পেয়েছে—কাঁদবে না!

···পরদিন বিকেলেও কল্যাণী সুষমাকে নিয়ে ঠাকুরঘরে বসেছেন। এ-দিকের ঘরে তার কাকা-কাকীমা শ্রী-শ্রীমতী ঘোষ দম্পতীকে নিয়ে অবধূত। না, তাঁকে শ্মশানে বসে সুষমাকে নিয়ে কোনো চিন্তাই করতে হয় নি। তিনি অবধারিত জানেন ওই সুলক্ষণা মেয়ের যন্ত্রণার কাল শেষ হয়েছে। জানেন এই মেয়ের সুখের সংসার হবে। কিন্তু সকলকে তিনি নিশ্চিন্ত করলেন অন্যভাবে। বললেন, আপনাদের এই মেয়েকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার ভার আমি নিলাম, খুব বেশি হলে তিন-চার মাস লাগবে। আমি ওষুধ দেব আর মাতাজী দীক্ষা দেবেন···কিন্তু একটা নির্দেশ আপনাদের মানতে হবে, সুষমা আপনাদের কাছে এখন আর কলকাতায় ফিরে যাবে না, ওর চেঞ্জ অফ এনভারনমেণ্ট দরকার—এই ক'টা মাস ও শ্রীরামপুরে প্রভার কাছে থাকবে, চিৎকসা ওর মারফতই হবে, তাছাড়া ওদের গাড়ি আছে, সপ্তাহে দু'তিন দিনও ওকে মাতাজীর কাছে নিয়ে

আসতে পারবে।

…সুষমার কাকা-কাকীমা মনে মনে হাঁপ ফেলে বাঁচলেন। চেঞ্জ অফ এনভারনমেণ্ট অর্থাৎ পরিবেশ বদলের জন্য সুষমাকে কিছুকাল বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া আর রাখার কথা মানসিক চিকিৎসকও বলেছিলেন। কিন্তু অত সময় কারো নেই, অত গরজও না। মেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা না করলে একই ভাবে দিন গড়িয়ে যেত। মনে মনে তারা হাঁপ ফেলে বাঁচল। এর মধ্যে দৈবাৎ কোনো অঘটন ঘটলেও পুলিশ তাদের তাড়া করবে না —যে দিন-কাল! কাকাটি বিগলিত হয়ে বললেন, প্রভাদি দয়া করে যদি রাজি হন…খরচ-পত্র যা লাগে দেব—

প্রভা ঘোষ একটু ধমকের স্বরে বলে উঠলেন, এখানে এসে টাকা-পয়সায় নামও মুখে এনো না, বাবার হুকুম হয়েছে যখন প্রভাদির ঘাড়ে কটা মাথা যে রাজি হবে না!

মনে মনে ভাবছিলাম এ সেই প্রভা ঘোষ, মাত্র একটা বছর আগে তাঁর কি উগ্র রুক্ষ আর সন্দিগ্ধ মূর্তি না দেখেছিলাম।

··অবধূত তারপর সকলকে নিয়ে এইদিনও কল্যাণীর পুজোর ঘরে এলেন। এদিনও সুষমা তাঁর কোলে বসে। কাঁদছে না, চাউনি আগের দিনের তুলনায় সজাগ। কল্যাণীর কোল থেকে নেমে মাটিতে বসল। অবধূত বললেন, শোনো মেয়ে, তুমি ধরা পড়ে গেছ, তোমার সত্তা ঈশ্বরের আশ্রয় খুঁজছে, কিন্তু এত বোকা তুমি এটা জান না, সেই আশ্রয় মৃত্যুর রাস্তায় মেলে না—জীবনের রাস্তা ধরলে তবে মেলে—ওই যাঁর কোলে বসেছিলে তিনিই তোমাকে সেই আশ্রয়ের ঠিকানা বলে দেবেন—কিন্তু মাসকয়েক এখন তুমি আর কলকাতায় তোমার কাকা-কাকীমাদের কাছে থাকতে পারছ না—ওই শ্রীরামপুরের মাসির কাছে থাকবে আর তোমার এই মাতাজীর কাছে থাকবে—ভবিষ্যতে আমার এখানকার অনেক দায়-দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে, বুঝলে? এমনি-এমনি আমরা কারো জন্য কিছু করি না—পারবে তো?

অবধূত বললেন, আশায় আর অবিশ্বাস্য আনন্দে মেয়েটার বিভ্রান্ত চোখ-মুখ কি-রকম হয়ে উঠল যদি দেখতেন!

…যাবার আগে সুষমার কাকীমা অবধূতকে বললেন, আমরা তাহলে একেবারে নিশ্চন্ত হয়ে বাড়ি যাচ্ছি?
দরমার গেটটা খুলতে খুলতে অবধূত জবাব দিলেন, খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারছি না…মেয়েটার ভালো বিয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি…এখন থেকেই পাত্রের খোঁজে থাকার তোড়জোড় করতে পারেন।
কাকীমাটি প্রথম থতমত খেল, তারপর হেসে উঠে উৎফুল্ল মুখে বলল, তাই নাকি! তাহলে আর আমরা কেন, আপনি নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেবেন।
…আমার আরো কিছু শোনার ছিল, শোনা হলো না। সুষমা প্রসঙ্গে শুরুতেই উনি বলেছিলেন, মনের ছোঁয়া পেলে আর ছেলে বা মেয়ের এক-জন রিপালসিভ হলেও র‍্যাপ্ রট্ হয় এই মেয়েকে নিয়ে এখন তাঁর সামনে সেই এক্সপেরিমেণ্ট।…কালো হলেও মেয়েটা মিষ্টি, তাহলে কুৎসিত ছেলেটাই হবে।…সে কে? লোকজন আসা শুরু হয়ে গেছে। বিকেলের আলোয় অনেক আগেই টান ধরেছিল। এখন সন্ধ্যা। একজন দুজন করে যারা আস-ছিল, অবধূতকে প্রণাম করে সোজা ভিতরে চলে যাচ্ছিল। তাই আমাদের আলাপে ছেদ পড়ে নি। কিন্তু এবারে একসঙ্গে অনেকে এসে গেল। প্রথমে বীরেশ্বর ঘোষের গাড়ি। তিনি তাঁর ছেলেরা ছেলের বউরা নাতি-নাতনিরা সকলেই হাজির। তারপর যারা এলো তারা শুনলাম সুষমার কলকাতার কাকা-কাকীমা আর তাদের ছেলে-মেয়ের দল। এখন তারাও অবধূত আর মাতাজীর ভক্ত।…গতবারের দেখা আর না দেখা একে একে আরো অনেক মুখ। কিন্তু এদের মধ্যে কুৎসিত কোনো মুখ চোখেই পড়ল না। তারপর হেড-লাইট জেলে গেটের সামনে আরো দুটো ঝক-ঝকে গাড়ি। একটা বিলিতি একটা দিশি। বিলিতি গাড়ি থেকে নামলেন রতনলাল সারাওগি, তাঁর স্থূলাঙ্গী স্ত্রী আর এক ছেলে। অন্য গাডিতে দ্বিতীয় ছেলে, তার সেই মামা, আরো জনা কয়েক মেয়ে পুরুষ। তাদের সঙ্গে দুই গাড়ি থেকে নামল রাশীকৃত ফুল, ধূপের বাক্স, একের পর এক মিষ্টির হাঁড়ি আর ঝুড়ি।
দাওয়ার সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় অবধূত বললেন, এই পুজোর

সমস্ত খরচ রতনলাল সারাওগি দিতে চেয়েছিল, আমি শুধু বলেছি কিছু করতে হবে না, একটা বিলিতি মাল শুধু নিয়ে আসবেন···আনল কিনা কে জানে।

আমি হেসে ফেলেছি।

···কলকাতায় ফিরেই আমি ফোনে রতনলালের খবর জানতে চেয়েছিলাম। অবধূত হেসে বলেছিলেন, কালীপুজোয় আসছে, কেমন আছে নিজের চোখেই দেখবেন। পরে বলেছেন, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পুরো টিম ওকে দেখে রায় দিয়েছে তার ব্যাধি নির্মূল।

—আর হাসপাতালের টাকা?

—তুই হাসপাতালের নামে পনেরো লক্ষ টাকার চেক আমার মারফৎ পাঠাতে চেয়েছিলেন, কে ও-সব দায়িত্ব নিয়ে ঝামেলা পোয়ায় মশায়, গরিবের জন্য আমি কিছু টাকা পাইয়ে দিয়ে খালাস।

সারাওগিরা সব অবধূতের পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। এই ভক্তির মধ্যে কোনো ফাঁক-ফাঁকি নেই। টিপ্পনীর সুরে অবধূত এক ফাঁকে বললেন, আমরা কি করে গড-ম্যান হয়ে যাই লক্ষ্য করুন।

ব্যবস্থা সব আগের বারের মতোই। পুজোর আগে সকলের খেয়ে নেবার পর্ব। আয়োজনও গত বারের মতোই। পোলাও মাছ ভাজা মাংস আর চাটনি। নিরামিষাশীদের পোলাও বেগুন ভাজা ছানার ডালনা চাটনি। বাড়তির মধ্যে এবারে শেষ পাতে সারাওগির আনা মিষ্টি। পেটো কাতিক আর তার দুই বন্ধু যোগান দিচ্ছে, কিন্তু পরিবেশনে এবার মাতাজী একা নন, সুষমাকে নিয়ে প্রভা ঘোষও নেমে গেছেন। তিনি আগেই ঘোষণা করে রেখেছেন বাকি সকলকে নিয়ে তিনি পরের ব্যাচে বসবেন। তাঁর মাতাজী আপত্তি করেন নি।

ভিতরের পরিষ্কার বড় উঠোনে সকলের পাত পড়েছে। নিরামিষাশীদের দু'তিন হাত তফাতে। লক্ষ্য করলাম, কোটিপতি সারাওগি বা তাঁর আত্মীয় পরিজনেরাও মাটিতে বসে পরম ভক্তি ভরে খাচ্ছেন। অবধূতের মেজাজ এখন রীতিমতো প্রসন্ন। খানিক আগে আধঘন্টার জন্য তিনি আমাকে নিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করেছিলেন। সারাওগির আনা বিলিতি

বোতলের আর্ধেক শেষ করে দরজা খুলেছেন। ছ'আনা তিনি জঠরস্থ করেছেন, আর ভয়ে ভয়ে দু'আনা আমি। বলেছেন, আজকের দিনে তো কারণ পান বিধি মশাই, অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন! খেতে বসেও তিনি কার্তিকের সর্দারি নিয়ে রসিকতা করেছেন। সকলকে শুনিয়েই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন গেল বারের তুলনায় এবারে প্রভা ঘোষকে অন্য-রকম দেখছি কিনা। গত পুজোয় যারা উপস্থিত ছিল সকলেই হেসে উঠল। শ্রীমতী ঘোষের সপ্রতিভ মুখ লাল একটু। ধমকের সুরে কল্যাণী বললেন, মুখ বন্ধ করে খাও তো এখন!

অবধূতের খাওয়া থেমে গেল। অসহায় চোখে সকলের দিকে চেয়ে বললেন, আপনাদের মাতাজীর হুকুম শুনলেন মহাশয় মহাশয়ারা? মুখ বন্ধ করে খেতে হলে কেবল বাতাস ছাড়া আর কিছু খাওয়া যায় কিনা বলে দিতে পারেন? খেতে হলে গোরুকেও মুখ খুলে খাবার মুখে নিতে হয়—

হাসি আর আনন্দের ছোঁয়া এখানে স্বতঃস্ফূর্ত। কল্যাণীও হাসছেন। খানিক বাদে আবার একটু অন্য ধাঁচের খুশির খোরাক পেল। সুষমা ধীর স্থির মেয়ে তার পরিবেশনও ধীরে সুস্থে। ফলে তার দিকের কারো কারো পাত খালি। তাই দেখে পেটো কার্তিক তার হাত থেকে পোলাওয়ের বালতিটা টেনে নিল, আর ব্যস্ত সমস্ত মাতব্বরের মতো বলে উঠল, দিন দিন, হয়েছে—এ-ভাবে পরিবেশন করলে খাওয়া হতে রাত দেড়টা বাজবে—সর্ব কর্ম মেয়েদের দিয়ে হলে আর কথা ছিল না—

পোলাওয়ের বালতি ছেড়ে দিয়ে সুষমা অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। সঙ্গে সঙ্গে ও-দিক থেকে কল্যাণীর ঈষৎ তপ্ত গলা, কি বললি তুই—কি বললি?

ঘর্মাক্ত মুখে পেটো কার্তিক দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ঠক করে পোলাওয়ের বালতি মাটিতে নামিয়ে রেখে দুই হাতের উল্টোদিক দুই কানে ঘষে বলল, এই কান মলছি—হলো? বালতিটা আবার তুলে নিয়ে তেমনি মেজাজের সুরে সুষমাকে বলল, দয়া করে দাঁড়িয়ে না থেকে মাংসের বালতিটা এদিকে আনার ব্যবস্থা করুন—

খালিপাতে হাতা ভরে ভরে পোলাও দিতে লাগল।

ও-দিক থেকে আবার কল্যাণীর মন্তব্য শোনা গেল, আজ আমার সঙ্গে কার্তিকেরও অমাবস্যার উপোস তো, তাই ওর মেজাজ ভালো নেই—

পরিবেশন করা মাথায় উঠল, কার্তিকের গলা দিয়ে একটা আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এলো।—আমার উপোস! আমি তো জানি না! তারপরেই দ্রুত এগিয়ে এসে পোলাওয়ের বালতি আবার সুষমার হাতে ধরিয়ে দিল।—নিন, পরিবেশন করে রাত কাবার করুন, আমার ঘাট হয়েছে—বাপরে বাপ!

সকলে সরবে হাসছে এবার। অদূরে কোটিপতি সারাওগি দম্পতীর দিকে চেয়ে মনে হলো মাটিতে বসে এমন আনন্দ আর তৃপ্তির খাওয়া তারা খুব বেশি খান নি। সে-কথা বলে তাঁদের দিকে অবধূতের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আর এক রসের অবতারণা করলেন। ডেকে বললেন, সারাওগি সাহেব আপনাকে এ-ভাবে সকলের সঙ্গে খেতে বসতে দেখে আমার এই লেখক বন্ধু বলছেন, কমিউনিজম্-এ ধর্মের জায়গা নেই, কিন্তু গোঁড়া কমিউনিস্টদের কেউ আজ এখানে থাকলে বুঝত, গণসাম্য-বাদের এমন ভালো প্ল্যাটফর্মও আর দ্বিতীয় নেই—এখানে এলে সকলেই সমান, কি বলেন?

রতনলাল সারাওগি হাসিমুখে জবাব দিলেন, তাই তো দেখছি।

রাত সাড়ে দশটার মধ্যে সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ। কিন্তু এবারের কালীপুজো রাত দেড়টায়। অনেক দেরি। বোঝা গেল সকলেই এখানে থেকে যাওয়ার লোক। সারাওগিরা পর্যন্ত ফেরার নাম করলেন না। কথায় কথায় অবধূত জানালেন, পুজোর সঙ্গে এবারে একটা আহুতি-যজ্ঞ হবে, আপনারা যে-যার ইষ্টর পথে বাধা অর্থাৎ অনিষ্ট আহুতি দেবেন।

—আপনার স্ত্রী করবেন?

—আর কে···।

আধ-ঘণ্টা গল্পগুজবের পর অবধূত আবার আমাকে নিয়ে তাঁর নিজস্ব ঘরে ঢুকলেন। বললেন, শত্রুর শেষ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই মশাই—

শত্রু বলতে বিলিতির বোতলের বাকিটুকু। ধীরে সুস্থে চলল। এবারে

আমিও কমে অব্যাহতি পেলাম না। আরো ঘণ্টাখানেক বাদে নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুললেন।

—চলুন আয়োজন কদ্দুর দেখি।

পুজোর ঘরটা হল্‌ঘরের মতো বড়। ওটার ভিতরের দিকের দরজা বরাবর আঙিনার খানিকটা জায়গা ছেড়ে সকলকে খেতে বসানো হয়েছিল। এখন তার কারণ বোঝা গেল। দরজা বরাবর আঙিনার ওই জায়গাতে আহুতি-যজ্ঞ হবে। ইটের তুহাত প্রমাণ-চৌকো যজ্ঞ-কুণ্ডে পেটো কার্তিক বালি ফেলছে আর ছোট একটা টিনের পাত দিয়ে চার-দিক সমান করছে। কল্যাণী পাশে দাঁড়িয়ে তদারক করছেন। শেষ হতে দেখা গেল বালুর স্তরও প্রায় বিঘতখানেক পুরু হবে। সব-দিক সমান হলো কিনা ভালো করে দেখে নিয়ে কল্যাণী কুণ্ডের বাইরে মাঝামাঝি জায়গায় তুই হাঁটুর ওপর জানু-আসনে বসলেন। পরনে টকটকে লাল চওড়া পাড়ের গরদের শাড়ি, গায়ে গরদের ব্লাউজ। স্নানার্দ্র ছড়ানো চুল পিঠের ওপর দিয়ে মাটি ছুঁয়েছে। কুণ্ড-রচনার কারু-কার্য দেখব না তাঁকে দেখব? তুই-ই দেখছি। হাতের সরু বড় একটা বেল-কাঁটা দিয়ে যজ্ঞ-কুণ্ডের পালিশ করা বালুর ওপর নানাভাবে দাগ কাটতে লাগলেন। তার পাশে পেটো কার্তিক দাঁড়িয়ে, আমরা সামনে।

অবধূত বললেন, ওই দাগ গুলোতে পঞ্চ-গুঁড়ি পড়লে কি দাঁড়ায় দেখুন।

হাসিমুখে টিপ্পনীর সুরে কল্যাণী বললেন, বোতলে আর অবশিষ্ট কিছু নেই বুঝি, তাই এখানে—

অবধূত আমার মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে বললেন, সুরার পরেই তো নারী···কি বলেন?

তাই দেখে কল্যাণী মুখ নামাতে গিয়েও নামালেন না, সন্দিগ্ধ চাউনি।— আ-কথা কু-কথা হচ্ছে বুঝি?

সামলাতে চেষ্টা করে জবাব দিলাম, না···ভালো কথাই।

—ওঁর না-হয় পাপ-পুণ্যির পরোয়া নেই, আপনারও কি নেই?

অর্থাৎ আমি চোরের সাথী গাঁট-কাটা। হাসিমুখেই কাজে মন দিলেন। পেটো কার্তিককে তাঁর পাশে ছোট ছোট পাঁচটা মোড়ক খুলতে দেখা গেল

ওতে পাঁচ রকমের রঙের গুঁড়ো—লাল, বেগনে, হলুদ, সাদা, সবুজ। এক-এক দাগে এক-এক রকমের রঙ দিতে দিতে যা দাঁড়ালো, দেখে সত্যিই শিল্পীর কাজ মনে হলো আমার। বেদীর ওপর মস্তবড় সুন্দর একখানা অষ্টদল পদ্ম।

আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, বাঃ!

অবধূত বাধা দিয়ে উঠলেন, অত উচ্ছ্বসিত হবেন না মশাই, ওখানকার আগুনে একখানা ভালো জিনিস উপহার দিতে হবে মনে রাখবেন—আচ্ছা, কার কি দোষ আহুতি দিচ্ছ তা প্রত্যেককে বলে-বলে দেবে তো?

স্মিত মুখে অষ্টদল পদ্মের চারদিকে চার রঙের রেখা টানতে টানতে কল্যাণী জবাব দিলেন, তোমার কি আহুতি দেব এক্ষুনি বলে দিতে পারি—সংশয়। মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, আপনারও তাই···তবে দু'-জনেরটা দু'রকমের।

অবধূত গম্ভীর।—কি বুঝলেন মশাই?

আমার নিরীহ জবাব, বুঝে কাজ কি?

বেলপাতার ডাল থেকে মনের মতো একটা ত্রি-পত্র বেছে নিতে নিতে কল্যাণী বললেন, মায়ের সম-দৃষ্টি, বোঝার প্রারব্ধ থাকলে তুমিও বুঝবে উনিও বুঝবেন।

অবধূতের তর্কের মুড্।—সম-দৃষ্টি প্রারব্ধ এ-ও তো দুর্বোধ্য শব্দ!

পেটো কার্তিক বেল-কাঠ চূড়ো করে সাজাচ্ছে আর মা-বাবার কথায় মজা পাচ্ছে। বিল্ব ত্রি-পত্র একটু আড়াল করে কল্যাণী আঙুলে করে তাতে কিছু আঁকলেন কি লিখলেন জানি না। হাসছেন মিটিমিটি। ত্রি-পত্রটা অষ্টদল পদ্মের মাঝখানে উপুড় করে প্রথমে আমার দিকে পরে অবধূতের দিকে তাকালেন। জবাব দিলেন, কিছুই দুর্বোধ্য না। একই প্রদীপের আলোয় একজন মন দিয়ে গীতা-ভাগবত পড়ছে, আর একজন তেমনি মন দিয়ে সেই আলোতেই দলিল জাল করছে। প্রদীপের আলোটা হলো মায়ের সম-দৃষ্টি, আর যে যা করছে সেটা প্রারব্ধ।

কল্যাণীকে দেখলে চোখ জুড়োয়, কিন্তু তাঁর কথা শুনে কানও এমন জুড়োয় ধারণা ছিল না। অবধূত ঘটা করে নিজের স্ত্রীকেই দেখছেন।

আমার দিকে ফিরলেন।—কি মশাই আর সাহিত্য করবেন না ছেড়ে দেবেন ?

লজ্জা পেয়ে কল্যাণী ধমকের সুরে বলে উঠলেন, তুমি ওঁকে নিয়ে এখন যাবে এখান থেকে ! এই কার্তিক, তুইও যা এখন—

—চলুন সরে পড়া যাক। আড়ালে এসে অবধূত হাসি-ছোঁয়া নির্লিপ্ত সুরে জানান দিলেন, যজ্ঞ-কুণ্ড বেদীতে যোনি-চিহ্ন আঁকা হবে এখন, তারপর বেলপাতা চাপা দেওয়া হবে—তাই গলা ধাক্কা।

পুজোর পরে যজ্ঞ হবে, যজ্ঞের পরে আরতি এবং মঙ্গলানুষ্ঠান। পুজোর সময় গেলবারের মতোই আমি আর অবধূত বাইরের বারান্দায় এসে বসেছি। উনি কথা-বার্তা কম বলছেন, পর পর সিগারেট টেনে চলেছেন। ভরা খাওয়ার আগে আর পরে বোতলের জিনিস যে পরিমাণ উদরস্থ করেছেন, আর কেউ হলে ঘুমিয়ে পড়ত। থেকে থেকে আমারই ঝিমুনি আসছিল। উনি আমার তিনগুণ খেয়েছেন, কিন্তু চোখে ঘুমের লেশমাত্র আছে মনে হয় না।

একবার জিজ্ঞেস করলাম, কিছু যেন ভাবছেন মনে হচ্ছে ?

বারদুই সিগারেটে টান দিয়ে ওটা সামনের উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে জবাব দিলেন, ঠিক ভাবছি না, বার বার একটা কথা কেবল মনে আসছে—এ-সব কেন, আমি কেন, আপনি কেন, এইরকম—

হাল্কা সুরে বললাম, শ্রীরামকৃষ্ণ তো বলে গেছেন সব ঈশ্বরকে জানার জন্য, সেটাই বিশেষ জ্ঞান আর বিজ্ঞান।···কিন্তু শুনেছি কর্মের শেষে এ-সব প্রশ্ন মনে আসে, আপনার এখনই মনে আসছে এটা ভালো কথা নয়—

আর একটা সিগারেট বার করে শলাইয়ের বাক্সে ঠুকছেন। মনে হলো এই মুহূর্তে উনি নিজের মধ্যে নেই। চোখের দৃষ্টি যেন সামনের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অনেক দূরের কোথাও উধাও। প্রায় মিনিটখানেক বাদে তেমনি বিমনার মতো সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তার কিছু বাকি আছে, অন্তত সামনের বছরের গোড়ার দিক পর্যন্ত, দেখা যাক···

কি কথায় কি কথা ! আমি কি বলেছি সে কি ওঁর কানে গেছে ! উদ্‌গ্রীব

হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের কিছু বাকি আছে, সামনের বছরের গোড়ার দিক পর্যন্ত কি ?

আত্মস্থ হলেন আর হেসেও উঠলেন। বললেন, সামনের বছর গোড়ার দিকে আমার একটি কর্মের গাছে ফল ধরবে, সেটা বিষ ফল কি অমৃত ফল দেখা যাক। সেই টানে বাঁধা পড়ে আছি, তারপরে আর বোধহয় কল্যাণীকে আটকানো যাবে না। চলুন, ও-দিকে যজ্ঞ শুরু হচ্ছে—

আমার ভিতরটা কি-রকম দমে গেল। সবটাই দুর্বোধ্য লাগছে। তিনি কি অশুভ কিছু ইঙ্গিত করলেন ? কোন্ ফলাফল দেখার পর কল্যাণীকে আর আটকানো যাবে না ? আটকানো যাবে না মানেই বা কি ?

সকলে যজ্ঞের সামনের উঠোনে জমায়েত হয়েছে। কেউ কেউ দাওয়ায় বসে। পেটো কার্তিক আমাদের জন্য ছুটো চেয়ার এনে দাওরার অন্য ধারে পেতে দিল।

মৃদু-মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী কুণ্ডে আগুন দিলেন। বেলকাঠের ওপর ঘি ঢাললেন। আগুন বাড়তেই থাকল। আগুনের তাপে সামনের মেয়ে-পুরুষেরা সরে সরে যেতে লাগলেন। কিন্তু কল্যাণী ঠায় তাঁর আসনে বসে। আগুনের তাপে সমস্ত মুখ অগ্নি বর্ণ। মহিলা আমার কেন সকলের চোখেই এখন বোধহয় বড় বিচিত্র-রূপিণী। মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে হোমাগ্নি ছড়াচ্ছেন, তপ্ত বাতাস সুগন্ধে ভরপুর। আমার ভয় হচ্ছে যজ্ঞের আগুনে কল্যাণীর সোনার বরণ অঙ্গ না জ্বলেই যায়। অবধূতের দিকে তাকালাম। তিনি নিরুদ্বিগ্ন, স্থির নিশ্চল।

না, আহুতি দেবার জন্য কল্যাণী সকলকে ডাকলেন না। নিজেই যজ্ঞ-কাষ্ঠ তুলে নিয়ে নিয়ে এক-একবার মেয়ে পুরুষদের দিকে চেয়ে নিজেই মঙ্গলাহুতি দিলেন। আর পেটো কার্তিককে ডেকে দিয়ে আহুতি দেওয়ালেন। পেটো কার্তিকের পর সুষমাকে দিয়ে। তারপর ওই দূর থেকে সোজা তাকালেন অবধূতের দিকে। উনি উঠলেন, এগিয়ে গেলেন। স্ত্রীর হাত থেকে যজ্ঞ-কাষ্ঠ হাতে নিলেন। আহুতি দিলেন। তারপরেও সেখানেই বসে রইলেন।

···অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা এখানে বড় কিছু নয়, আমার মনে হলো এত-

গুলো মানুষের কোনো অদৃশ্য আবেগ মিলিত হয়ে অদ্ভুত নিটোলভাবে স্থির হয়ে আছে। কারো চোখে পলক পড়ছে না। সকলের দৃষ্টি ওই মহিলার আগুনের মতোই লালচে মূর্তির দিকে।

···একটা বেল-কাঁটা কল্যাণী নিজের কড়ে আঙুলের ওপর রেখে একটু জোরে টেনে নিলেন। অন্য আঙুল দিয়ে ওই আঙুলটা চেপে আহুতি বস্ত্রের ওপর ধরতে দেখলাম টপ টপ করে রক্ত পড়ছে। বেশ কয়েক ফোঁটা পড়ার পর একটা নারকেল তুলে সেই রক্তাক্ত আহুতি বস্ত্রে বেশ করে মুড়ে কুণ্ডের জ্বলন্ত আগুনের সামনে ঠেসে বসিয়ে দিলেন। পূর্ণাহুতি শেষে যজ্ঞকুণ্ডে গঙ্গাজল ঢেলে ধীর পায়ে তিনি আবার পুজোর ঘরের দিকে চললেন।

গেলবারের মতোই আরতি-পর্ব। কিন্তু আমার কাছে দু'চোখ ভরে দেখার মতোই নতুন। পেটো কার্তিক ঘরের আলোগুলো সব নিভিয়ে দিয়েছে। হল-ঘর আবছা অন্ধকার। দক্ষিণা কালীর সামনে দুটো প্রদীপের আলোয় কল্যাণীর মুখখানাই কেবল জ্বলজ্বল করছে। শুধু হাতের ওপর তুলোর প্রদীপ জ্বলে জ্বলে ছোট হচ্ছে, শঙ্খ-শুভ্র দুই সুঠাম বাহু মায়ের মূর্তির সামনে উঠছে নামছে ঘুরছে ফিরছে। এরপর তেমনি খালি হাতের চেটোয় কর্পূর জ্বালিয়ে কর্পূর-আরতি, বাঁ-হাতের ঘণ্টা বাজছে। তারপর তেমনি শূন্য হাতে চামর দোলানো আর হাতের শঙ্খমুদ্রায় শঙ্খ আরতি। শঙ্খ-মুদ্রা মুখে ঠেকিয়ে দীর্ঘ রবে তিনবার সত্যিকারের শঙ্খই বেজে উঠল যেন।

ভোর-ভোর। বিদায় পর্বে প্রায় সকলের চোখেই জল দেখেছি। কোটিপতি সারাওগিরা সকলেই কাঁদছেন। রতনলাল ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছলেন। যাবার আগে আমার দুহাত ধরে বললেন, জীবন সার্থক হলো, বাবা দেওতা, মাতাজী দেবী···আপনি বাবার পেয়ারের বন্ধু, আপনিও ভাগ্যবান।

চোখে জল সুষমার কাকা-কাকীমাদেরও দেখেছি।

অবধূতের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ভাগ্যের কথা সেটা এখন বিশ্বাস করি। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল ভাগ্যের থেকে অনেক দূরে সরে আছি। সহজ মানুষ সহজ বিশ্বাসে মাতোয়ারা হয়, অনায়াস সমর্পণে আত্মশুদ্ধি করে নিতে

পারে। সেটা সাময়িক হলেও অনন্তকালের সূচ্যগ্র অংশ তো বটে। কিন্তু আমার কি দশা। স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস দূরের বস্তু, সমর্পণ কাকে বলে জানি না।

মাতাজী কল্যাণী কি ভিতর দেখতে পান? তিনি বলেছিলেন সংশয় আহুতি দেবেন। নিজের স্বামী অবধূতকেও তাই বলেছিলেন। কিন্তু কোথায় অবধূত আর কোথায় আমি!

আমাদের যাওয়া দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর। নিরিবিলিতে পেয়ে এর মধ্যে বারকয়েক অবধূতকে জিজ্ঞাসা করেছি, কাল রাতে আপনি কর্ম, কর্ম ফল দেখা, তারপর আর কল্যাণীকে আটকানো যাবে না—এ-সব কি বলছিলেন?

হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। একবার বলেছেন, কাল রাতে মাল কতটা পেটে পড়েছিল সে খেয়াল আছে আপনার?

শেষে মিনতি করে বলেছি, শুধু এ-টুকু বলুন, অশুভ কিছু নয় তো?

—অশুভ! জোরেই হেসে উঠেছেন।—আরে মশাই, কোনো অশুভ কল্যাণীর ত্রি-সীমানায় ঘেঁষে না, বুঝলেন? ঘেঁষলেও তার দায় এখনো তাঁর শিবঠাকুর কংকালমালী ভৈরবই নিজের হাতে তুলে নেন—এ আমার প্রত্যক্ষ করা সত্য—আপনি নিশ্চন্ত থাকুন।

···মানুষ চাঁদে যাচ্ছে, দূর-নীরিক্ষে যাবার জন্য মহাকাশ-স্টেশন স্থাপন করেছে—এ-যুগ বিজ্ঞানের জয়-জয়কারের যুগ। কিন্তু পৃথিবীর কোণে কোণে অনন্তকাল ধরে আত্ম-দর্শনের এই যে সাধনা চলেছে—এ-ও বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান নয় বলে তো মন থেকে ছেঁটে দিতে পারছি না!

এই দুই জ্ঞান থেকেই আমি অনেক দূরে পড়ে আছি। প্রথমটার জন্যে মনে কোনো খেদ নেই কিন্তু দ্বিতীয়টার জন্য এক-ধরনের অগোচরের অস্থিরতা আর অসহায়-বোধ কেন?

৪

পৌষ মাস। দু'দিন হলো চেপে শীত নেমেছে। সন্ধ্যার পর কি কাজ নিয়ে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল গায়ে লেপ জড়িয়ে বসতে পারলে ভালো হতো। ও-ঘর থেকে হঠাৎ মেয়ের উৎফুল্ল গলা কানে এলো, ও মা, কার্তিকদা যে, খিচুড়ির গন্ধে গন্ধে কোন্নগর থেকে একেবারে কলকাতায়!

কড়া শীতের অজুহাতে রাতের মেনু খিচুড়ি ডিম ভাজা আর ঝাল আলুর দম।

বুঝলাম পেটো কার্তিক এসেছে, কাজ আর এগোবে না।···নিজের ইচ্ছেয় যদি এসে থাকে তো রাগ বা অভিমান করে এসেছে। আর অবধূত যদি পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কিছু খবর আছে।

খিচুড়ির নামে কার্তিকের রসনা খুব সিক্ত মনে হলো না। তারও নিরাসক্ত গলা কানে এলো, আজ খিচুড়ি বুঝি, বেশ···সার কোথায়?

—সার একটা দরকারি কাজ নিয়ে বসেছেন, এসেছ যখন তাড়া কি, এক কাপ চা খেয়ে গরম হয়ে নাও—

ওর আসার কারণ না জানা পর্যন্ত আমারই আর কাজে মন বসবে না। উঠে এলাম। কার্তিক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। এ-বেলা ও-বেলা দেখা হলেও পায়ের ধুলো নিতে ছাড়বে না। সোজা হতে মুখখানা একটু শুকনো মনে হলো।—কি খবর, রাত করে এই ঠাণ্ডার মধ্যে যে?

—কিছু ভালো লাগছিল না সার, থেকে থেকে আপনার কথা মনে হতে এসে গেলাম···

তক্ষুনি বুঝলাম কিছু ঘটেছে এবং ওর মেজাজপত্র খুব ভালো নয়। জিজ্ঞেস করলাম, জানিয়ে এসেছ না, না জানিয়ে···আমাকে আবার ফোন করতে হবে?

পেটো কার্তিক থমকে তাকালো। রাগ বা অভিমান নয়, জবাবের সুর

বিষণ্ণ। বলল, জানালেই বা কি না জানালেই বা কি, আমার ওপর নোটিস তো হয়েই গেছে, আমাকে তাড়াবার জন্য দুজনেই এখন এক-কাট্টা··· আমার মেয়াদ তো সামনের মাঘ মাস পর্যন্ত।

আমি কেন, মেয়ে চায়ের কথা বলতে যাচ্ছিল সে-ও হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে গেল। রাগ বা মান অভিমানের থেকেও গভীরতর ব্যাপার কিছু।

—বোসো, কি ব্যাপার খুলে বলো তো, কে তাড়াচ্ছে···তোমার বাবা আর মাতাজী?

—তাঁরা ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে আমি কেয়ার করি? এই রাইট আর কার? মোড়ায় বসল।

ওর রাগের কথাও এমন যে হাসি এসে যায়।—ওঁরা তোমাকে তাড়াতে চান?

চট করে বুঝছি না বলেই যেন অসহিষ্ণু।—চান মানে—আর চাওয়া-চাওয়ি নেই (হাত তুলে নিজের গলা জবাই দেখালো)—ফাইন্যাল সেন্‌টেন্স হয়েই গেছে, দিন-ক্ষণ এলেই আমাকে গলা পেতে দিতে হবে।

এবারে আমি সতর্ক একটু। অবধূত বা তাঁর স্ত্রী কল্যাণী যদি কোনো কারণে বিরূপ হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, না জেনে না বুঝে আমার প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। একটু বিরক্তির সুরে বললাম, ধানাইপানাই না করে কি হয়েছে সোজাসুজি বলো দেখি?

ওর মুখোমুখি খাটের ওপর বসলাম। পেটো কার্তিক একটু থমকে গিয়ে মেয়ের দিকে তাকালো। সাদা অর্থ ধরে নিয়ে মেয়ে বলল, আমি চা করে নিয়ে আসি —

পেটো কার্তিক ঈষৎ আবেগের গলায় বাধা দিয়ে উঠল, না দিদি আপনি যাবেন না, আপনিও থাকুন, আপনিও তো মেয়েই, একটা মেয়ের হয়ে বিচার বিবেচনা করুন। আমার দিকে ফিরল, আর আপনি তো মস্ত লেখক সার, গল্প উপন্যাসে উদার হয়ে কত ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ঠিক নেই —আপনিই বলুন আমি কি একটা বিয়ে করার মতো ছেলে? কোনো মেয়ে নিজের ভিতরের ইচ্ছেয় আমাকে বিয়ে করতে চাইতে পারে? আমার এই পোড়া দাগের মুখের দিকে এই জখম আঙুলগুলোর দিকে

ভালো করে দেখে নিয়ে বলুন।

আমি হাঁ খানিক। মেয়ের চোখ বড় বড়। আত্মস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে চেঁচিয়ে বলল, মা কার্তিকদা এসেছে, খিচুড়ির ভাগ রেখো, আর আমাদের জন্যে তিন পেয়ালা চা পাঠাও! প্রায় ছুটে ফিরে এসে ধুপ করে আমার পাশে বসল।—তোমার বিয়ে? এই মাঘে?

সমবেদনার বদলে মেয়ের এত আগ্রহ দেখে কার্তিকের আরো আহত মুখ। ইতিমধ্যে আমি সজাগ একটু। চকিতে কিছু মনে পড়েছে। …কালীপুজোর বিকেলে অবধূত বলেছিলেন, ছেলে বা মেয়ে দুজনের একজন দেখতে কুৎসিত হলেও মনের ছোঁয়া পেলে তাদের মধ্যে ব্যাপরট্ ভালো হয়। বলেছিলেন, এই মেয়েকে নিয়ে এখন আমার সামনে সেই পরীক্ষা। মেয়ের রং চাপা কিন্তু কুৎসিত আদৌ নয়। অতএব কুৎসিত বলতে ছেলে। মনে আছে সেই কালীপুজোর রাতে যারা উপস্থিত ছিল তাদের সকলকেই এই কারণেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু তেমন কুৎসিত মুখ একটিও দেখিনি।

…না পেটো কার্তিকের কথা আমার মনেই আসে নি। না আসার কারণ কুৎসিত সে মোটেই নয় বা ছিল না। তবু দেখলে গোড়ায় গোড়ায় ধাক্কা লাগত। সকলেরই লাগবে। বোমাবাজীর অঘটনের ফলে বাঁ চোখের পাশ ঘেঁষে গালে মুখে কপালে পুরনো পোড়া দাগ, বাঁ হাতের দুটো আঙুল আধখানা করে নেই, দু'হাতেরই অনেকটা জায়গা জুড়ে পোড়া দাগ। কিন্তু দেখে দেখে এমন সয়ে গেছে যে আর ধাক্কা লাগে না বলেই চোখও পীড়িত হয় না।

রাগত মুখে পেটো কার্তিক মেয়েকে বলছে, দেখে মনে হচ্ছে পারলে এক্ষুনি নেমন্তন্ন খেতে ছোটেন। সরোষে অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

আমি বললাম, দেখছিস তো ওর মেজাজ খারাপ, রাগাচ্ছিস কেন? গলার স্বর মোলায়েম করে আলতো সুরে জিজ্ঞেস করলাম, সুষমার সঙ্গে বিয়ে? এমন করে ঘুরে তাকালো আমার দিকে যার সাদা অর্থ, এট্টু্য ব্রুটে !! মুখেও তাই বলল, আপনিও এই যড়যন্ত্রের মধ্যে…আর আমি কিনা মন হাল্কা করতে আপনার কাছেই এলাম!

মেয়েও বলে উঠল, আঁ্যা বাবা তুমি জানতে আর আমাদের কিছুই বলো নি?

পেটো কার্তিক চুপচাপ মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। গলা দিয়ে ক্ষুব্ধ একটা শব্দ বেরুলো, চলি—

মেয়ে তার একটা হাত ধরে ফেলল, এই কার্তিকদা বোসো বলছি!

আমিও বললাম, বোসো—আমি সত্যিই কিছু জানতাম না, কিন্তু সেই কালীপুজোর দিন সুষমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে তোমার বাবা এমন একটু ইঙ্গিত করেছিলেন যে আমার বোঝা উচিত ছিল! এখন তুমি বিয়ের কথা বলতেই সে-কথা আমার মনে পড়ে গেল, আর তাইতে মনে হলো মেয়েটি সুষমাই হবে।

কার্তিক আবার গোঁজ হয়ে মোড়ায় বসতে স্ত্রী নিজেই চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে লাফিয়ে বলে উঠল, মা, কার্তিকদার বিয়ে —সুষমার সঙ্গে!

থতমত খাবার ফলে পেয়ালার চা ট্রেতে পড়ল একটু। ওমনি কার্তিক বলে উঠল, দেখলেন? সত্যি যা দেখলেন?—শুনে মাসিমার হাত থেকে চায়ের ট্রে পড়ে যাবার দাখিল!

স্ত্রী সামাল দিতে চেষ্টা করলেন।—না না ওর চেঁচানির চোটে আমি ধড়-ফড় করে উঠেছিলাম—খুব ভালো কথা তো, কবে ঠিক হলো—কোন্ মাসে বিয়ে?

—এই মাঘেই! আবার উঠে দাঁড়িয়ে কার্তিক ঠাস করে জবাবটা দিল। হাত বাড়িয়ে ট্রে থেকে একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে আবার বসল।—আমি চেষ্টা করব এমন আঙুল কাটা গাল-কপাল পোড়া অলক্ষুণের বিয়ে দেখতে বাবা যেন কাউকে না ডাকেন!

—ওমা কার্তিক দেখি রেগে আছে! স্ত্রী সাত পাঁচ না ভেবেই বলে বস-লেন, তা আপত্তি থাকলে তোমার বাবাকে বলো নি কেন?

কার্তিক খেঁকিয়ে উঠল, আমার বলার কোনো দাম আছে? আমি হুকুমের দাস না? আচ্ছা, আপনিই বলুন মাসিমা, এই মূর্তিকে কোনো মেয়ে মন থেকে বিয়ে করতে চাইতে পারে?

মাসিমা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। চোখের ইশারায় তাঁকে নিরস্ত

করে আমি বললাম, সুষমা তো বাচ্চা মেয়ে নয়, না চাইলে সে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে কেন ?

—রাজি হচ্ছে বাবা আর মাতাজীর কথায়, তাঁরা তার চোখে দেব-দেবী !

—এত দিন তোমার চোখেও তো তাঁরা তাই ছিলেন।

রাগত মুখে কার্তিক শূন্য ট্রে-তে ঠক করে পেয়ালাটা রাখল।

মেয়ে বলল, তুমি সরাসরি সুষমার সঙ্গেই কথা বলে নিলে না কেন কাতিকদা ?

—বলতে আর বোঝাতে বাকি রেখেছি ?

—অ্যাঁ ? সুষমা কি বলে ? আমরাও উৎসুক।

—কি আবার বলবে ? একবার ব্রেন ওয়াশিং হয়ে গেলে নিজস্ব আর কিছু বলার থাকে !

মেয়ে আরো উৎসুক, তার আরো জুলুম, তবু কি বলল শুনি না ?

—বলল, বাবা মায়ের দয়ায় সে আমার ভিতরের সুন্দর চেহারাখানা দেখতে পেয়েছে—কোনো মানে হয় !

আমারা হাসি চাপতে চেষ্টা করছি। কিন্তু মেয়ে ফুলে ফুলে হাসছে। শেষে হাসি সামলে বলে উঠল, ঠিক বলেছে কার্তিকদা, আর একটুও না ভেবে ঝুলে পড় !

কার্তিকের মুখ দেখে মনে হবে এই সংকটে সে সব থেকে বড় ভুলটা করেছে আমার এখানে এসে। স্ত্রী ওদিকের ব্যবস্থা দেখার অছিলায় সরে গেলেন। একটু বাদে আমি বললাম, একটা গল্প শুনবে কার্তিক ?

ও বোকার মতো আমার দিকে তাকালো।

—রবি ঠাকুরের নাম শুনেছ ?

—বি. এ. ফেল. নামটাও শুনব না !

—তাঁর লেখা। শোনো, সৌরসেন নামে স্বর্গের এক গন্ধর্ব ছিল, সবার সেরা মৃদঙ্গ বাজিয়ে। বাজনার তালে তালে উর্বশী নাচত, আর দেব-দেবীরা বাহবা দিত। একদিন প্রেয়সী মধুশ্রীর কারণে সৌরসেনের মন উতলা ছিল, তার বাজনার তাল কেটে গেল, উর্বশীর নাচে বাধা পড়ল, দেব-দেবীরা রেগে গেল, তাদের অভিশাপে কুৎসিত বিকলাঙ্গ হয়ে সৌরসেন

গান্ধার রাজার ছেলে অরুণেশ্বর হয়ে জন্মালো। মধুশ্রী শোকে অধীর হয়ে মর্ত্যলোকে আসতে চাইলো। ইন্দ্রের দয়ায় সে মদ্ররাজার ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মালো। মর্ত্যে কালে দিনে বিকলাঙ্গ গান্ধার রাজ অরুণেশ্বর মদ্ররাজ কন্যা কমলিকার ছবি দেখে মোহিত। সে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালো। কিন্তু রাজাকে রাজ্যের লোকই চেনে না, সে থাকে সকলের চোখের আড়ালে। অথচ মস্ত রাজা আর কলাবিশারদ হিসেবে তার নাম ডাক! মদ্ররাজ খুশি হয়েই মেয়ে কমলিকার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে রাজি হন। রাজার প্রতিনিধি হিসেবে কমলিকাকে বিয়ে করতে গেল তার বীণা, যে বীণা তিনি নিজের কোলে রেখে বাজান।

কমলিকা স্বামীর ঘরে এসে খুব খুশি। কিন্তু রাজ স্বামীকে কখনো চোখে দেখে না। রাতের অন্ধকার ঘরে তাদের মিলন হয়। রাজা বীণা বাজায় সেই বাজনা শুনে রানী কমলিকার বুক মন ভরে ওঠে। কবেকার কোন্ হারানো নাচ মনে আসে, রাজা বাজায় রানী নাচে। দুজনে দুজনের ভালোবাসায় বিভোর। কিন্তু রানীর মনে একটা বিষম দুঃখ। এমন প্রিয় রাজস্বামীকে সে চোখে দেখতে পায় না, দিনের পর দিন তার দু'চোখ বঞ্চিত। রোজ তাগিদ দেয় জুলুম করে, তার রাজাকে সে দেখবেই। রাজা নানাভাবে তাকে বোঝায়, ভোলায়। একদিন রানী বায়না ধরল, এই রাত পোহালে তোমাকে দেখবই।

...দেখল। দেখে শিউরে উঠল। কি কুৎসিত, কি কদাকার। দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে বনে পালিয়ে গেল সে। এই নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা তার অসহ্য। বনের নির্জনে রাজার মৃগয়া ঘরে সে আশ্রয় নিল।

কিন্তু রোজ রাতে রাজার বীণা বাজে। সেই বাজনা দিনে দিনে বনের ঘরের কাছে আসে। বাজনার ওই আকুতি মূর্ছনা শুনে কমলিকা পাগল হয়ে ওঠে। ছুটে যেতে চায়! কিন্তু চোখ বাধা দেয়। ওই কুৎসিতকে সে দেখবে কি করে?

কিন্তু ওই বাজনার আকুল ডাক শুনে শুনে কমলিকা একদিন আর সহ্য করতে পারল না। প্রদীপ হাতে উঠে দাঁড়ালো। নিজের মনে বলল, আমি যাব, এখন আর আমার চোখ দুটোকে আমি ভর করি না। কমলিকা

বেরিয়ে এলো। জন্ম জন্মান্তরের সেই নাচ আর সুরের মূর্ছনা তার বুকের তলায় বাজছে। কমলিকা রাজার কাছে এলো। বাজনা থামল। প্রদীপের আলো তুলে কমলিকা রাজার মুখ দেখল। বলে উঠল, প্রভু আমার, প্রিয় আমার, এ কি সুন্দর রূপ তোমার!

মেয়ের আদ্যোপান্ত জানা, সে সকৌতুকে দ্বিতীয় শ্রোতার মুখখানা দেখছিল। পেটো কার্তিক স্থান-কাল ভুলে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছে। বিস্ময়-বিস্ফারিত প্রশ্ন, বিকলাঙ্গ রাজার চেহারা আবার ভালো হয়ে গেল?

জবাবে একটু নিজস্ব ব্যঞ্জনা মেশালাম। বললাম, এ কি ম্যাজিক নাকি যে তক্ষুনি ভালো হয়ে যাবে! আসলে কমলিকার পূর্ব স্মৃতি সব মনে পড়ে গেছে, সেই চোখ দিয়ে রাজার ভিতরের আসল চেহারাখানা দেখছে।

যথা সময়ে বেশ আনন্দ করেই খিচুড়ি ভোজনে বসা হলো। পেটো কার্তিকের মেজাজ এখন দস্তুর মতো ভালো। মেয়ের ঠাট্টা ঠিসারায় রাগ করছে না।

শোবার ঘরে ফোন বেজে উঠল। স্ত্রী বললেন উঠতে হবে না, তোমার হলে বলে দিচ্ছি খেতে বসেছ। কিন্তু কি মনে হতে আমিই উঠলাম। যা মনে হয়েছিল তাই। ও-দিক থেকে চেনা পুষ্ট গলা।—কার্তিক আপনার ওখানে?

—হ্যাঁ। যে মন-মেজাজ নিয়ে এসেছিল, এখন ঠাণ্ডা হয়ে যেতে বসেছে।

অবধূতের প্রশ্ন, কি মন-মেজাজ নিয়ে গেছল?

সংক্ষেপে বললাম।

—খেতে বসলেও আপনি গিয়ে ওর কানটা আচ্ছা করে মলে দিন, কাপুরুষ কোথাকার, এতদিন ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছিল, যেই ঠিক হয়েছে এখন ঘাবড়েছে। ও ধরে নিয়েছিল এক-তরফা ভালোবাসার নৌকায় ভেসে বেড়াবে।

—বলেন কি?

—ঠিকই বলি। ব্যাপারটা প্রথমে ওর মাতাজীর চোখে ধরা পড়েছে।··· মেয়েটা আড়াই মাস ধরে আছে এখানে, দেখা গেল কার্তিক সহজে আর বাড়ি ছেড়ে বেরোয় না, তার আগে সুষমা যখন শ্রীরামপুরে মাসির

বাড়িতে ছিল আর চিকিৎসা চলছিল, কোনো কাজে কল্যাণী ওকে শ্রীরামপুরে পাঠালে কি খুশি। প্রভা ঘোষকে বলেছে, পারলে বাবা আর মাতাজীর কাছে ওকে একদিন অন্তত নিয়ে যাবেন, আপনি না পারেন আমি এসে নিয়ে যাব। দুই একবার এনেছে, পৌঁছে দিয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় নি, ওর মাতাজীকে বলেছে, বাবাকে তাগিদ দিয়ে ওকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলুন মা, মা-বাপ মরা দুঃখী মেয়ে, এ-রকম দেখলে খুব খারাপ লাগে। কল্যাণী কি ঠাট্টা করতে রাগ করে বলেছে, ছেলে-বেলায় বাপ-মা দুই-ই খোয়ানো কি ব্যাপার জানলে বুঝতেন। ···এখানে এনে রাখার পর আমাদের আড়ালে ও-ই সুষমার গার্জেনগিরি করত, যখন যা দরকার না চাইতে এনে দিয়েছে, ইদানীং আবার মান-অভিমান হম্বি-তম্বিও করত। ব্যাপার বুঝে কল্যাণীই আমাকে বলেছে, দুটোই তো আমাদের এখন, ছাখো যদি হয়ে যায় তো হয়ে যাক। কাতিকের মন আগেই বোঝা গেছল, মেয়েটার মন বুঝে তবে আমি এগিয়েছি।···দায়িত্ব নেবার ভয়ে হারামজাদার এখন স্নায়ুর ধকল চলেছে।

—আপনি ফোন করেছেন ওকে বলব ?

—এক্ষুনি বলবেন না। আগে ওকে বলুন, ওর বিয়ে করতে খুব আপত্তি থাকলে আমাকে বলে আপনি এখনো এ বিয়ে নাকচ করে দিতে পারেন, দেখুন ও কি বলে।

ফোন ছেড়ে বিরক্ত মুখ করে আবার খেতে বসলাম। নিজের মনেই বললাম, পাবলিশার তাগিদ দেবার আর সময় পায় না—

স্ত্রীর অনুযোগ, খাবার ফেলে সাত-তাড়াতাড়ি উঠে যাবার কি দরকার ছিল। খেতে খেতে একটু বাদে বললাম, কাতিকের মন-মেজাজ ঠাণ্ডা হয়েছে তো না হয় নি ?

কার্তিক বলে উঠল, আবার মনে করিয়ে দিয়ে দিলেন সার খাওয়াটা মাটি করে—

—শোনো কার্তিক, মুখে তোমাকে যা-ই বলি, মনে মনে আমি সেই থেকেই ব্যাপারটা ভাবছি···বিয়ে তো একটা ছেলেখেলা ব্যাপার নয়, অন্যের ইচ্ছেয় বা অনুরোধে বিয়ের ঢেঁকি গেলা যায় না, তোমার বাবা চট্ করে

আমার কথা উড়িয়ে দেন না···আমি গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বললে হয়তো আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

পেটো কার্তিকের শুকনো মুখ। ঢোঁক গিলে জবাব দিল, কিছু লাভ হবে না, ওঁরা তুজনে মিলে ঠিক করেই ফেলেছেন—

—কিন্তু তোমার এত আপত্তি সেটা তো তিনি বোঝেন নি, বিয়ে হয়ে গেলে আর তো সেটা ফেরনো যাবে না—একবার চেষ্টা করে দেখতে অসুবিধে কি, কাল তোমার সঙ্গেই চলে যাব ভাবছি।

পেটোর মুখের দিকে চেয়ে হাসি চাপা দায়। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, থাক্‌গে সার, আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে—তাই বাবা মায়ের আশীর্বাদ বলে মাথা পেতে নেব।

মেয়ে জোর দিয়ে বলে উঠল, এটাই খুব ভালো কথা।

আমার কথা তার বিরক্তির কারণ হচ্ছে বুঝতে পারছি। তুই এক গরাস জঠরে চালান করে এবারে ধীরে-সুস্থে বললাম, একটু আগে ওই ফোন অবধূত করেছিলেন, তিনি বললেন, এক্ষুনি তোমার কান ধরে আচ্ছা করে মলে দিতে···এই বিয়েতে কেন তাঁরা এগিয়েছেন তা-ও বলেছেন।

পেটো কার্তিকের তু'চোখ বিস্ফারিত খানিক। তারপর হড়বড় করে বলল, মাসিমা আর খিচুড়ি খেয়ে কাজ নেই, উঠি আমি, এক্ষুনি কোন্নগর রওনা হব—

স্ত্রীর ভেবাচাকা খাওয়া মুখ।—কি হলো, এ-সব বলে ছেলেটার তুমি খাওয়া নষ্ট করছ কেন?

বললাম ওর পাতে ডবল খিচুড়ি দাও। এই বিয়ে কেন হচ্ছে সেটা শুনেই এ-রকম বলছি, কার্তিকবাবু একতরফা প্রেমে হাবু-ডুবু খাচ্ছিল, সেটা ধরতে আর বুঝতে পেরেই ওর বাবা আর মাতাজী এই ব্যবস্থা করেছেন, এখন দায়িত্ব ঘাড়ে চাপছে বলে ঘাবড়াচ্ছে।

পেটো কার্তিক লজ্জায় অধোবদন। মেয়ে কোনো রকমে হাসি সামলে দাবড়ানি দিয়ে উঠল, কার্তিকদা খেতে শুরু করো বলছি নইলে মা-কে বলব তোমাকে খাইয়ে দিতে—সুষমার প্রেমে পড়ে তোমার হাবুডুবু খাওয়ার রাইট আছে আবার এখন ঘাবড়ে যাওয়ার রাইটও আছে।

বলতে বলতে নিজেই হেসে অস্থির।

খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবার পর কার্তিক এক ফাঁকে বলল, আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে কয়েকটা কথা ছিল সার...

ওকে নিয়ে লেখার ঘরে এসে বসলাম।—বলো...

একটু ইতস্তত করে পেটো কার্তিক বলল, আমি একটু নার্ভাস হয়েছি সত্যি কথা, কিন্তু আরো বেশি নার্ভাস হয়েছি অন্য কারণে বাবা আর মাতাজীর মতি-গতি ঠিক বুঝতে পারছি না—

এরপর যেটুকু জানান দিল তাতে আমারও একটু চিন্তার কারণ ঘটল।... বিয়ের পর ওদের কোন্নগরে বাবার বাড়িতে থাকতে দেওয়া হবে না, দূরে শহরে ওদের জন্য বাড়ি দেখা হচ্ছে। মাতাজী ওদের জন্য একটু জমিও দেখতে বলেছেন, নিজের খরচায় দোতলা একটা বাড়িও তুলে দেবেন, দোতলায় ওরা থাকবে, এক-তলায় ভাড়াটে বসবে—তাতে বাড়ি রক্ষার খরচ চলে যাবে।...শহরেই একটা দোকানঘর দেখা হচ্ছে, সেখানে কার্তিককে কবিরাজি দোকান দিয়ে বসানো হবে, যে বুড়ো কবিরাজ এখন বাড়িতে ওষুধ বানায় সে আর তার ছেলে কবিরাজ হিসেবে দোকানে বসবে—দোকানের আট আনার মালিক হবে কার্তিক, ছ'আনার মালিক হবে বুড়ো কবিরাজ আর ছেলে, বাকি দু'আনার মালিক হবে যোগানদার হারু। কার্তিকের ধারণা, বাবা নিজের কবিরাজি চিকিৎসা আস্তে আস্তে তুলে দেবেন। ওকে বলেছেন, আমি থাকতে থাকতে তোদের দোকান যাতে মোটামুটি দাঁড়িয়ে যায় সে-ব্যবস্থা আমিই করে যাব।

এই শোনা পর্যন্ত কার্তিকের ত্রাস। বাবা আর মাতাজী একটা কিছু মতলব আঁটছেন.. হয়তো এখান থেকে তাঁরা অন্য কোথাও চলে যাবেন।

খানিক চুপ করে থেকে বললাম, তাঁরা এখানে না থাকলে তাঁদের বাড়িই তো তোমাদের হাতে—তাহলে আর তোমাদের জন্য আলাদা বাড়ি হচ্ছে কেন?

পেটো জবাব দিল, মা অনেক বছর আগেই বলেছিলেন, ও-বাড়ি থাকবে না। ওপার শুকিয়ে গঙ্গা এ-পারে সরে আসছে, বর্ষায় বড় বান এলে এখন উঠোন ছাড়িয়ে দাওয়ার কাছাকাছি জল উঠে আসে—ফি বছর বানের

জলের হামলা বাড়ছে—চারদিক কেমন নোনা ধরে গেছে দেখেন নি? গঙ্গার কি কাজ হবে বলে এ-দিকটা বোধহয় রিকুইজিশনেও চলে যাবে।

খানিক চুপ করে থেকে কার্তিক আরো একটা ভয়ের আভাস দিল।—আরো একটা কথা আপনাকে বলছি সার, আপনি যেন কক্ষনো বাবাকে বলবেন না, তাহলে তিনি আর আমার মুখ দেখবেন না।···বাবার বোধহয় সামনেই কোনো বিপদ ওঁত পেতে আছে। আপনাকে একদিন বলেছিলাম না খুব উতলা হয়ে দু'বার বাবাকে শ্মশানে ছোটাছুটি করতে দেখেছি, একবার এই রতনলাল সারাওগিকে অপারেশনের হুকুম দেবার আগে। আর একবার এর চারগুণ বেশি উতলা দেখেছিলাম সেই সাতাত্তর সালের গোড়ায়—যে-বছর আপনাদের সঙ্গে পুজোর সময় আমরা হরিদ্বার হয়ে দেরাছুন যাই। খুব স্পষ্ট করে সব জানি না, কারণ বাবার কোন্ আত্মীয়-স্বজনরা আসত তখন, বাড়িতে ছেলে-পুলে হবে এমন একটি মেয়েছেলেও মাঝে মাঝে এসে থাকত—তখন আমি কাছেই অক্ষয়বাবুর বাড়িতে থাকতাম। যতদূর জানি, সেই এক আত্মীয়কে বাবা জেলে পাঠিয়েছিলেন, তার বোধহয় খালাস পেতে খুব বেশি দেরি নেই, সামনের বছর গোড়ার দিকে হয়তো ছাড়া পাবে—সেই লোক বলে গেছল জেল থেকে ফিরে তার প্রথম কাজ হবে বাবাকে খুন করা।

চমকে উঠলাম। গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠছে।

কার্তিক বলল, বাবার সত্যি ক্ষতি করতে পারে এমন লোক জন্মেছে বলে আমি মনে করি না, কিন্তু বলুন তো সার, ভয় হয় না? কোথায় বাবার পাশে থাকব, দরকার হলে তাঁর জন্য এই ছাইয়ের প্রাণ দেব, না বিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে বাড়ি থেকেই সরিয়ে দিচ্ছেন!

···সমস্তটা রাত ভালো ঘুম হলো না। থেকে থেকে এ-বারের কালীপুজোর রাতটা মনে পড়ছে। না, মদের নেশায় অবধূত কোনো বাজে কথা বলার লোক নন। তাঁর সে-দিনের প্রতিটি কথা আমার কানে বাজছে। আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, বার বার একটা কথা কেবল মনে আসছে—এ-সব কেন, আমি কেন, আপনি কেন, এইরকম—

···আমি রসিকতা করেছিলাম, শুনেছি কর্মের শেষে এ-সব প্রশ্ন মনে

আসে, আপনার এখনই মনে আসছে এটা ভালো কথা নয়।

…বিমনার মতো তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তার কিছু বাকি আছে, অন্তত সামনের বছরের গোড়ার দিক পর্যন্ত, দেখা যাক—আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করেছি, কিসের কিছু বাকি আছে—সামনের বছরের গোড়ার দিক পর্যন্ত কি?

…আত্মস্থ হয়ে হেসে উঠে বলেছিলেন, সামনের বছর গোড়ার দিকে আমার একটি কর্মের গাছে ফল ধরবে, সেটা বিষ-ফল কি অমৃত-ফল দেখা যাক। সেই টানে বাঁধা পড়ে আছি, তারপর আর বোধহয় কল্যাণীকে আটকানো যাবে না।

…পরদিন ও-কথার অর্থ কি জিজ্ঞেস করতে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন, বলেছেন, কাল রাতে মাল কতটা পেটে পড়েছে সে-খেয়াল আছে আপনার?

…পেটো কার্তিকও সেই সামনের বছরের গোড়ার দিকের কথাই বলল, সে-সময় জেল থেকে খালাস পেয়ে কার নাকি প্রথম কাজ হবে তার বাবাকে খুন করা।

…অবধূত এমন কি কর্ম করেছিলেন, যে কর্মের গাছে বিষ-ফল ধরবে কি অমৃত-ফল তিনি জানেন না? জানা হয়ে গেলে পরে কল্যাণীকে আর আটকানো যাবে না মানেই বা কি?

বিনিদ্র রাতে হঠাৎ কেন যেন অবধূতর ভক্ত হরিদ্বারের পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর কমনীয় মুখখানা মনে পড়ে গেল। নিঃস্ব অবস্থা থেকে মানবিক দয়ায় অবধূত যাঁকে বহু লক্ষপতির জীবনে ফিরিয়েছেন। আমার জন্য তাঁকে অতিমাত্রায় ব্যস্ত দেখে, আর মাত্র খাওয়া থাকা বাবদ এক-টাকা মূল্য ধরে দেবার কথা বলতে আমি জোর দিয়েই আমার সম্পর্কে তাঁর ধারণা বদলাতে চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, আপনি একটা বড় ভুল করছেন, অবধূতজীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ার পরে—তার আগে কেউ কাউকে চোখেও দেখিনি।

…ভক্ত পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর সাদা-সাপটা জবাব, আপনাকে দেখার জন্য মহারাজ দেরাদুন থেকে নেমে আসতে পারেন বলেছেন…আপনাকে

এখানে তাঁর নিজের ঘর ছেড়ে দিতে বলেছেন—আপনি কি লোক বা কতদিনের আলাপ আমার আর জানার দরকার নেই—আপনার সঙ্গে তাঁর কত জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক আপনি জানছেন কি করে ?

মনে পড়তে বিনিদ্র শয্যায় আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।···এই লোকের সঙ্গে মাত্র দু'বছরের আলাপ আমার। কিন্তু তাঁর বিপদের বা তাঁকে হারানোর ভয়ে আমার চোখে ঘুম নেই। মাত্র দু'বছরের আলাপে এ-রকম কি হওয়া সম্ভব ? জন্ম-জন্মান্তরের আত্মিক বন্ধন হলে বরং এটা স্বাভাবিক ভাবা যায়।

পেটো কার্তিকের বিয়েতে ঘটা দেখালেন বটে কালীকিংকর অবধূত। কোন্নগরে নয়, কলকাতায় সাতদিনের জন্য মস্ত একটা বাড়ি ভাড়া করে বিয়ে। নইলে বাইরের অভ্যাগতদের আসা এবং থাকার অসুবিধে। যে বাড়িতে বিয়ে সেই বাড়িতেই বউ-ভাত। আর দূর দূরান্তরের অতিথিদের সেই বাড়িতেই থাকা।

আমাকে আগেই হেসে বলেছিলেন, কার্তিকের বরাবরই খুব দুঃখ ছিল ওকে কেউ কিছু দেয় না, সবই বাবাকে দেয়, এবারে তোর পাওয়ার বরাতখানা দেখিয়ে দিচ্ছি।

···বেনারসের সেই মস্ত বড়লোক পার্টির তিন ভক্ত সস্ত্রীক এসেছেন। স্টেশনে মাছ নিয়ে এসে যাঁরা মাছ খাইয়ে একদিনেই অরুচি ধরিয়ে দিয়েছিলেন, লক্ষ্ণৌয়ের পোলাউ-মাংসের পার্টি এসেছেন। হরিদ্বারের তিন-তিনটে হোটেলের মালিক পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর সঙ্গে আবার দেখা হলো। বাবার চিঠি পেয়ে তিনিও সপরিবারে বিয়েতে এসেছেন। দেরাদুন বা মুসৌরী আর অন্যান্য জায়গার ভক্তদের আমি চিনি না, তারাও সকলেই এসেছেন এবং অবধূত তাঁদের সঙ্গেও আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অবাক হয়ে দেখলাম ফিরে পাওয়া সন্তানকে আর অবধূতের দেওয়া তিন পালিত ছেলে-মেয়েকে নিয়ে দ্বারভাঙার কাঁকুরঘাটির পার্বতী লাজবন্তী আর অনন্তরামও নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছে।

মোট নিমন্ত্রিতের সংখ্যা এক হাজারের কম নয়।

আমাদের তো বিয়ের আগের দিন থেকে বউ-ভাতের পরদিন পর্যন্ত নেমন্তন্ন। আমাকে অবধূত আগে থাকতেই বলে রেখেছিলেন, কলকাতার সব ব্যবস্থা-পত্রের কর্মকর্তা কিন্তু আপনি, সরে থাকলে চলবে না।
সরে থাকি নি। এত ভক্ত সমাগম দেখে আমার একবারও মনে হয় নি পেটো কার্তিককে কেবল পাওয়ানোর উদ্দেশ্য নিয়েই অবধূত তাঁর ভক্তদের এখানে ডেকেছেন বা সমবেত করেছেন। কেন যেন একটা কাল্পনিক দৃশ্য মনে আসতে বার বার আমার চোখের কোণ শিরশির করে উঠেছে। মানব-পুত্র যীশুর 'দি লাস্ট সাপার'। নিজের দিন শেষ বুঝে ক্রুশ-বিদ্ধ হবার আগে ভক্ত সমাবেশে যীশুর শেষ আহার—নিজে হাতে ভক্তদের তিনি সযত্নে সেবা করছেন, পরিচর্যা করছেন, খাওয়াচ্ছেন।···লিওনারডো দ্য ভিন্‌চির আঁকা 'দি লাস্ট সাপার'-এর সেই বিশাল তৈল-চিত্রের প্রতি-লিপি কলকাতার কোনো এক রাজপ্রাসাদে আমি দেখেছিলাম। ভক্তদের প্রতি অবধূতের আদর যত্ন আর অনাবিল স্নেহের আচরণ দেখে ভিতরটা বার বার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল সকলের এই শেষ মিলন।
—বাবারে বাবা, কোনো বিয়েতে এমন পাওয়া আর জীবনে দেখি নি, তার বাবার দৌলতে পাওয়ার ভাগ্য বটে কাতিকদা!
উচ্ছ্বাস আমার মেয়ের।
শুনলাম আসল হীরের সেট দিয়েছেন রতনলাল সারাওগি আর তাঁর দুই ছেলে দিয়েছেন আসল মুক্তোর সেট। কাঁকুরগাছির পার্বতী প্রসাদ দিয়েছে দামী জড়োয়ার সেট। বেনারসের পার্টি দিয়েছেন প্রত্যেকে এক-খানা করে দামী বেনারসী শাড়ির সঙ্গে বেশ ভারী ওজনের একটা করে গয়না। হরিদ্বারের পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীর দেওয়া হারের ওজন কম করে নাকি পাঁচ ভরি হবে। সব মিলিয়ে পাওয়ার আর শেষ নেই। সব মিলিয়ে সোনার গয়না পেয়েছে ষাট ভরির ওপর। খুব দামী মাঝারি আর সাধারণ মিলিয়ে শাড়ির সংখ্যা একশো সাতানব্বই। নগদ পেয়েছে তেরো হাজার ন'শ। এ-ছাড়া আর যা-সব পেয়েছে একটা ঘরে ধরে না। ডাইনিং টেবিল ডিনার সেট পর্যন্ত।
—কার্তিককে খুব খুশি দেখলি?

একটু ভেবে মেয়ে মাথা নাড়ল।—তা কিন্তু দেখলাম না বাবা। বিয়ের পরদিন একফাঁকে আমাকে বলেছিল, আমার কিছু ভালো লাগছে না দিদি, বাবার কথা সারকে যা বলে এসেছিলাম সার যেন তা না ভোলেন, আপনি সর্বদা তাঁকে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলবেন।···কি বলেছিল বলো তো বাবা?

জবাব এড়িয়ে গেছি।

পেটো কার্তিকের বিয়ে হলো মাঘের একেবারে শেষের দিকে, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিক এটা। নতুন বছরের শুরুই বলা যেতে পারে। পেটো কার্তিকের নতুন ঘর সংসার দেখার উপলক্ষ্যে কিছু দিনের মধ্যে কোন্নগরে গেছি এবং যতটা সম্ভব অবধূতের সঙ্গেই কাটিয়েছি। কিন্তু তাঁর কথাবার্তা বা আচরণে কোনোরকম দুশ্চিন্তার ছায়াও আমার চোখে পড়ে নি।

অবধূতের সব তড়িঘড়ি কাজ। কার্তিক তার ছিম-ছাম ছোট ভাড়াটে বাড়ি দেখালো, নতুন দোকান দেখালো। কবিরাজী দোকান আগেই দেখা ছিল, সরঞ্জাম সব তো অবধূতের বাড়িতেই ছিল। কেবল তুলে নিয়ে সাজানো। বুড়ো বাপ তার ছেলেকে নিয়ে দোকানে বসা শুরু করেছেন। রাত পর্যন্ত হারুও দোকানেই থাকে। পেটোর জন্য তিন কাঠা জমিও কেনা হয়েছে। বাড়ি তোলার টাকাও নাকি মাতাজী ওর আর সুষমার নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছেন।

কিন্তু আনন্দ বা উৎসাহের বদলে পেটো কার্তিকের উতলা মুখ। আমাকে বলেছে, সব বড় বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, আমার কিছু ভালো লাগছে না সার।

সুষমা বলল, ও খুব ঘাবড়ে যাচ্ছে, আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলে যান তো, বাবা মা আমাদের বিপদে ফেলার মতো কিছু একটা করবেন এ কখনো হয় নাকি!

কার্তিককে বোঝার কি আমার নিজেরই একটু ভাবনা ধরে গেছে। অবধূতের কাছে এসে তাঁকে জেরা করতে ছাড়ি নি, আপনাদের ব্যাপার-খানা কি, সব ছেড়েছুড়ে বিবাগী হবার মতলবে আছেন নাকি?

—কি ছাড়লাম ? অবাক-অবাক মুখ।

—আপনি আর রোগীর চিকিৎসা করবেন না ?

—কেন করব না, প্রেসক্রপশন করে ওষুধের জন্য কার্তিকের দোকানে পাঠাবো, আর দোকানের কবিরাজও ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট প্র্যাকটিসের সুযোগ পাবেন, ওদের দুজনারই পসার বাড়বে—আমার ব্যবসা বুদ্ধি কম ভাবেন নাকি ! হাসতে লাগলেন, কার্তিকের বিয়েখানা কেমন দিলাম দেখলেন না ?

—দেখলাম। ভাবলাম জিজ্ঞেস করে বসি, লাস্ট সাপার নয় তো ? বললাম না। তার বদলে জিজ্ঞেস করলাম, এখন যেমন আছেন তেমনি চলবে, না কোনো প্রোগ্রাম আছে ?

হেসে জবাব দিলেন, আমার কোনোদিনই কোনো প্রোগ্রাম ছিল না। ···ঘটনার সাজে ডাক পড়লে সাড়া দিতে হবে নয়তো যেমন আছি তেমনি থাকব।

—শিগগির কোনো ঘটনার সাজে ডাক পড়বে আশা করছেন ?

মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। এমন সময় কল্যাণী এদিকে আসতে গম্ভীর। যেন লক্ষ্য করেন নি এই ভাবে আমার দিকে চেয়ে জবাব দিলেন, আর আমি কিছু আশাও করব না, কোনো কর্তৃত্বও নিজের হাতে রাখব না, এখন থেকে আমি সর্বদা আমার স্ত্রীর অনুগত হয়ে চলব ঠিক করেছি।

কল্যাণী ভ্রূ-ভঙ্গি করে প্রসঙ্গ বুঝতে চেষ্টা করলেন, তারপর মন্তব্য করলেন, বরাবরই অনুগত হয়ে চলেছে, বাকি আছে বুড়ো বয়সে।

অবধূত আমাকেই সালিশ মানলেন, বিবেচনা করে দেখুন। আরে, যৌবন ধর্মে পাঁচ-দিকে ছোটাছুটি করতে পারি, পাঁচ জনের অনুগত হতে পারি —কিন্তু বুড়ো বয়সে তো কেবল তুমিই ভরসা !

কল্যাণীও হাসি মুখে আমাকেই বললেন, এটা নালিশ বুঝলেন তো ? সমস্ত জীবন ছেড়ে দিয়ে এখন একটু রাশ টানার দিকে চলেছি বলে ঠেস দেওয়া হচ্ছে।···আচ্ছা আপনিই বলুন, সব কিছুতেই একটা রিটায়ার-মেণ্টের সময় থাকা উচিত নয়···আপনিও কি লেখার থেকে কোনোদিন রিটায়ার করবেন না ?

অবধূতের গম্ভীর মন্তব্য, রবীন্দ্রনাথ রিটায়ার করেন নি।

কল্যাণীর মুখে আরো সপ্রতিভ হাসি।—বলে ঠকলে। সে ভাবে চিন্তা করলে ত্রৈলঙ্গস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ বামাক্ষ্যাপা বিবেকানন্দ কেউ রিটায়ার করেন নি—খুব ভালো কথা, তুমিও এদের রাস্তাই ধরো!

স্বীকার না করে পার নেই, মহিলাকে দেখলে ভালো লাগে, চুপ করে থাকলে ভালো লাগে, কথা বললেও ভালো লাগে।

৫

ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে মার্চ গড়াতে চলেছে। বলা নেই কওয়া নেই সকাল দশটায় সুষমাকে নিয়ে পেটো কার্তিক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। ওকে অবশ্য বলা ছিল, বউ নিয়ে একদিন যেন আমার বাড়িতে আসে। কিন্তু আসার খবরটা অবধূতের ওখান থেকে একটা ফোন করতে পারত, ডাকে একটা চিঠিও ফেলে দিতে পারত। নতুন বউটা প্রথম এলো, আমি তক্ষুণি বাজারে যাবার জন্য ব্যস্ত হলাম।

সেটা বুঝেই কার্তিক আমাকে চোখের একটু ইশারা করল। খানিক বাদে ওকে নিয়ে আমার ঘরে এসে বসতে বলল, আপনি আমাদের জন্য একটুও ব্যস্ত হবে না, ঘরে যা আছে তাই খাব···বাবা আর মাতাজী জানেন আপনি আমাদের অনেকবার করে ডেকেছেন বলেই আজ আসছি, কিন্তু আসলে দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি—আমার মনে হয় বাবার সামনে বিপদ, আপনার এখানে বসে থাকা চলবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আমারও ভিতরে উৎকণ্ঠার দাপাদাপি।—কেন, কি হয়েছে?

—যে আত্মীয়কে পাঁচ বছর আগে বাবা জেলে পাঠিয়ে ছিলেন, সে হয়তো শিগগিরই ছাড়া পেতে চলেছে। মাকে ধরে পড়তে তিনিও বললেন কিছু দিনের মধ্যেই ছাড়া পাবে। সে বলে গিয়েছিল, জেল থেকে বেরুলে তার প্রথম কাজ হবে বাবাকে খুন করা—

—তা বাবা কিছু বলছেন ?

—বলছেন না, তিনি যা করছেন দেখেই আমার হাত-পা ভিতরে সেঁধিয়ে গেছে।

—কি করছেন তিনি।

—গত কাল গিয়ে দেখি ভিতরের দাওয়ায় বসে বড় একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া আর কি তেল দিয়ে ঘষে ঘষে একটা রিভলবার ঝকঝকে করে তুলছেন।…চামড়ার পাতের মতো খাপে রিভলবারের গোটা কতক গুলীও দেখলাম।

—রিভলবার! আমিও আঁতকে উঠলাম।—রিভলবার তিনি কোথায় পেলেন ?

—কি করে জানব। ও সময়ে আমাকে দেখেই তো বিরক্ত। ধমক লাগালেন এ-রকম কাজের মন হলে ব্যবসার বারোটা বাজতে বেশি সময়, লাগবে না।

আমি নির্বাক খানিক।—তোমার মাতাজীকেও চিন্তিত দেখলে ?

—তেনাদের মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় ? তবু একটু গম্ভীরই মনে হলো।

ভিতরের ভয় আর আবেগে কার্তিক অস্থির হয়ে উঠল। কাতর স্বরে বলল, বাবার বিরাট বিরাট অবস্থার সব ভক্ত আছেন, আমি তাঁদের সক্কলকে দেখেছি—কিন্তু আপনার মতো বন্ধু তাঁর একজনও নেই, আপনাকে তিনি কত শ্রদ্ধা করেন কত ভালোবাসেন সে কেবল আমিই অনুভব করতে পারি—আপনি সার তাঁর কাছে যান, কিছুদিন তাঁকে আগলে রাখুন, আমি এসে আপনাকে এ-রকম বলেছি জানলে আমাকে হয়তো জুতোপেটা করবেন—করুন—তবু আপনি যান সার, আমার মন বলছে বাবার সামনে ভয়ংকর বিপদ!

আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাওয়ার দাখিল। অবধূত রিভলবার প্রস্তুত রেখে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন এ কি কারো কল্পনা করতে পারার কথা! এই ল' অ্যাণ্ড অর্ডারের যুগে খুন-জখম-হত্যা কিছু কম হচ্ছে না। কিন্তু সেটা যাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ অবধূতে তো তাদের কেউ নন। আত্মরক্ষার জন্য রিভলবার প্রস্তুত না রেখে তিনি আগে থাকতে পুলিশের সাহায্য

নিচ্ছেন না কেন। পুলিশের হোমরাচোমরাদের মধ্যে অনেকে তাঁর ভক্ত এ-তো কার্তিকের বিয়ের সময় নিজের চোখেই দেখেছি। আগেও জানতাম। খাতিরের জোরেই পেটো কার্তিককে তিনি পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

বউ নিয়ে কার্তিক বিকেলে চলে গেল। আমি পরদিন সকালে ট্রেনে রওনা হলাম। সঙ্গে ছোট স্যুটকেশে খান-কয়েক জামা-কাপড় আর কিছু প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সরঞ্জাম। বাড়িতে বলে গেলাম, ফিরতে দিন-কতক দেরি হলে কিছু ভেবো না, অবধূতকে টানতে পারলে একটু পুরী ঘুরে আসার ইচ্ছে।

বাড়িতে এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। অবধূতকে কেউ হত্যা করার জন্য আসতে পারে, আত্মরক্ষার জন্য তিনি রিভলবার নিয়ে প্রস্তুত হয়েছেন, আর তার মধ্যে আমি গিয়ে পড়ছি জানলে বাড়ির আত্মজনদের আহার-নিদ্রা ঘুচে যাবে।

অবধূত বাইরের বারান্দার চেয়ারে বসেছিলো, কল্যাণী ও-দিক ফিরে তাঁকে কি বলছেন। বাঁশের ছোট গেটের সামনে রিক্স দাঁড়াতে দুজনেই ফিরলেন। স্যুটকেশ হাতে আমাকে রিক্স থেকে নামতে দেখে দুজনেই বেশ অবাক। ওঁদের মুখ দেখে উল্টে আমারই অস্বস্তি এখন, কার্তিকটার পাল্লায় পড়ে আমি বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কিনা কে জানে—কারণ দুজনের কারো মুখে উদ্বেগের ছায়ামাত্র নেই।

দাওয়ায় উঠতে অবধূতই প্রথম বলে উঠলেন, রিক্সয় চেপে স্যুটকেশ হাতে ···কি ব্যাপার ?

সপ্রতিভ জবাব দিলাম, ব্যাপার মতিভ্রম, হাওড়া স্টেশনে এসে দূরের যে-কোনো টিকিট কাটার বদলে কোন্নগরের টিকিট কেটে বসলাম···আশা যদি সঙ্গী পাই।

অবধূত আরো অবাক।—কোথায় যাবেন ঠিক না করেই শুধু একটা স্যুটকেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ?

—পুরনো দিনের অভ্যাস ঝালানোর ঝোঁক চাপল, লেখা-পত্র নেই এখন, সকাল কাটে তো দুপুর কাটে না—কল্যাণী দেবী তো এখন রিটায়ার-

মেণ্টের পক্ষে, কিন্তু মুখে বললে তো হবে না, প্রমাণ চাই—চলুন তিনজনে মিলে দিন-কয়েক কোথাও থেকে ঘুরে আসি। কল্যাণীর আয়ত চোখে এখনো একটু বিস্ময়, চেয়ে আছেন। অবধূত গম্ভীর, বললেন, তিনজনে তো আর মেলা হয় না—আপনি ইচ্ছে করলে কল্যাণীকে নিয়ে যেতে পারেন, আমার আপত্তি নেই।

এমন স্থূল রসিকতায়ও কল্যাণীর মুখ লাল হতে দেখলাম না। আমার দিকেই চেয়েছিলেন, এবারে ফিরলেন, তুমি ওঁর কথা বিশ্বাস করছ?

অবধূতের নির্লিপ্ত জবাব, আমি হাবাগোবা মানুষ, যে যা বোঝায় তাই বুঝি, তাই বিশ্বাস করি। তুমি যখন করো না, বেরিয়ে একটা রিক্স নিয়ে দোকান থেকে কান ধরে কার্তিককে এখানে নিয়ে এসে যা ব্যবস্থা করার করো। হেসে উঠলেন, আরে মশাই, মিথ্যে কথা বলার সময় যুধিষ্ঠিরেরও আপনার মতো ধরা-পড়া মুখ হতো কিনা সন্দেহ—আপনি দেখি তার থেকেও কাঁচা।

হাল ছেড়ে ধুপ করে সুটকেশটা মাটিতে ফেলে চেয়ার টেনে বসে বললাম, ঘাট হয়েছে, আর কোনোদিন চেষ্টা করব না—কেবল একটা কথা বিশ্বাস করতে পারেন, সেই কালীপুজোর রাতে আপনি আপনার কর্মের গাছে বিষ ফল কি অমৃত ফল ফলে দেখার অপেক্ষায় আছেন শোনার পর থেকে আমি অস্বস্তির মধ্যে আছি, কার্তিকের বিয়ের পর থেকে আপনাদের জন্য আমার অস্বস্তি আরো বেড়েছে, আর কাল কার্তিকের মুখে যা শুনলাম, সমস্ত রাত আমার ঘুম হয় নি—তাই সত্যিই একটা দুরাশা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম যদি আপনাদের টেনে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়তে পারি।

শুধু অবধূত নয়, কল্যাণীর মুখখানাও অপূর্ব কমনীয় মনে হলো। দুজনেই আমার দিকে চেয়ে আছেন। অবধূত আলতো সুরে বললেন, হ্যাঁ মশাই, এ-দেশের সব লেখকরাই কি আপনার মতো নাকি?

জবাব দিলাম, আমার থেকে ভালো ছেড়ে খারাপ নয়।

অবধূতের সখেদ মন্তব্য, এত দেখলাম, মানুষ আর কটা দেখলাম, কেউ দেবতা বলে কেউ ভণ্ড বলে, রক্ত-মাংসের মানুষ যে, কেউ ভাবে না। স্ত্রীর দিকে তাকালেন, রাগের বদলে কার্তিকদের বরং রাতে এসে এখানে

খেতে বলো, ওই হারামজাদার দৌলতেই এঁকে দিন-কয়েকের জন্য কাছে পাওয়া গেল।
আমি তক্ষুণি জোরাল দাবি পেশ করে ফেললাম, আপনার কথার জালে পড়ে আমি আর চুপ করে থাকব না, কিছু করতে পারি না পারি আপনাদের ভালো মন্দের শরিক ভেবে আমাকে সব বলতে হবে।
শোনার মতো কিছু বলার থেকে অন্তরঙ্গ অতিথি অভ্যর্থনার উৎসাহই ভদ্রলোকের বড় হয়ে উঠল। আর এক প্রস্থ চা খেয়ে আমাকে নিয়েই বাজারে যাবার জন্য তৈরি হলেন। স্ত্রীকে বললেন, চান্স যখন পেয়েছ, ভদ্রলোককে একটু ভালো খাইয়ে দাইয়ে পুণ্যি করো—রাতে আমাদের বোতলের জন্য হাড়-ছাড়ানো চিলি মাংস চাই—
আমি জোর দিয়েই বাধা দিলাম, এ-সব নিয়ে এখন ব্যস্ত হবেন না, সব জানতে বুঝতে দিয়ে আগে আমাকে নিশ্চিন্ত করুন, তার আগে আমার কিছুই ভালো লাগবে না।
এবারে কল্যাণীই আগ বাড়িয়ে বললেন, আমাদের কোনো ক্ষতিই কেউ করবে না জেনে নিশ্চিন্ত থাকুন, তবু আপনি এলেন খুব ভালো হলো, আপনি ছাড়া যত লোকই আসুন না কেন উনি নিঃসঙ্গ, কটা দিন চুপ মেরে ছিলেন আজ আপনি আসতেই এত উৎসাহ কেন বুঝছেন না? প্রত্যেক বারই আপনি চলে যাবার পরে বলেন, সব্বাই তাদের ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে যায়, আমাদের কথা ভাবতে কেবল ওই একজনই। যা করছেন করতে দিন—
বললাম, কিন্তু ভেবে করতে পারছি কি, করার সাধ্যই বা কতটুকু!
করার সাধ্য কারোই নেই, করতে চাওয়াটাই আসল। অবধূতকে বললেন, রাতের জন্য তাহলে যতটা পারো হাড়-ছাড়ানো মাংস বেছে এনো।
হঠাৎ একটা কৌতুকের কথা মনে পড়ে যেতে অবধূতের দিকে চেয়ে বললাম, হাড়-ছাড়ানো মাংসয় কাজ কি, এক-সময় উনি হাড় চিবুতে ভালো-বাসতেন শুনেছিলাম?
উনি বলতে কল্যাণী। অবধূত হা-হা করে হেসে উঠলেন।—সে-তো বিয়ের আগে! বিয়ের পর হাড়ের ওপর এমনি বীতশ্রদ্ধ যে মাংস খাওয়াই ছেড়ে

দিয়ে বসলেন।

এটা আজই প্রথম জানলাম। কল্যাণী হেসে মন্তব্য করলেন, দুজনেরই দেখছি রসের দিনের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করতে খুব ভালো লাগে।

খবর পেয়ে পেটো কার্তিক বিকেলের মধ্যে সুষমাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির। অবধূত ঘুরিয়ে কার্তিককে এক হাত নিলেন। গম্ভীর মুখে সুষমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন ক'হাত শাড়ি পরো?

এতদিনে বাবার ধাত কিছুটা বুঝেছে হয়তো সুষমাও। সঠিক না বুঝেও হাসছে অল্প অল্প।

—বাজারে চৌদ্দ হাত শাড়ি পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করো, এখন তো শুধু নিজে পরলেই হবে না, আর একজনকেও ঢেকেঢুকে নিরাপদে রাখতে হবে—ও একদিন বোমবাজি করে নিজের মুখ পুড়িয়েছে আঙুল উড়িয়েছে —সে-সব দিন ভুলে যাও।

কিন্তু যার উদ্দেশে বলা সে-ও ত্যাঁদড় কম নয়। নিরীহ মুখে আমার দিকে তাকালো।—বিপদ ভেবে আপনার কাছে ছোটা মানে মেয়েছেলের কাছে ছোটার সামিল বলছেন বাবা…।

—এই হারামজাদা! তোব কান দুটো ছিঁড়ে নিয়ে আসব আমি! ওঁর কথা বলছি না তোর বীরত্ব দেখে অবাক হচ্ছি?

রাত আটটা নাগাদ অবধূত আমাকে নিয়ে বসেছেন। দুজনের এক-প্রস্থ করে গেলাস খালি হতে উনি দ্বিতীয়-প্রস্থ রেডি করে কার্তিক আর সুষমাকে খাবার তাড়া দেবার জন্য উঠে গেলেন। ওদের সাইকেল রিক্সার জন্য ছ'সাত মিনিট পথ হাঁটতে হবে, তার পরেও মাইল তিনেক দূরে বাড়ি। ছেলেমানুষ বউ নিয়ে বেশি রাত করা এইদিনে কারোরই পছন্দ নয়। দুপুরের ভারী খাওয়ার পর ড্রিংকের সঙ্গে চাট হিসেবে এখনো যা এসেছে আর আসবে তাতেই আমাদের রাতের আহার শেষ হবে এ-কথা কল্যাণীকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কার্তিক তাকে-তাকে ছিল বোধহয়। তার বাবা উঠে যেতেই তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কি বুঝছেন সার?

—কিছুই বুঝছি না, বহাল মেজাজে আছেন দেখছি।

—ওতে ভুলবেন না, উনি ওই-রকম সবকিছু ঝেড়ে ফেলতে ওস্তাদ, আমি বলছি সামনে খুব বিপদ।

কিন্তু তোমার মাতাজীও তো বলছেন নিশ্চিন্ত থাকতে, তাঁদের কোনো ক্ষতিই কেউ করতে পারবে না।

ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে কার্তিক বলল, মাতাজী তো বাবার থেকেও এক-ধাপ ওপর দিয়ে চলেন·· কেউ মাথার খুলি উড়িয়ে দিলেও সেটা ক্ষতি বলবেন না, বলবেন ভবিতব্য। আপনি সার এসে গেছেন যখন একটু বুঝেসুজে যেতে চেষ্টা করুন, আমি জানি শিগগিরই কিছু ঘটবে।

অবধূত ফিরে আসার আগেই সরে গেল।

ওরা খেয়ে-দেয়ে বিদায় হবার পর কথায় কথায় উনিই প্রসঙ্গান্তরে আসতে আমার সুবিধে হলো। হেসে বললেন, কার্তিকের মুখে রিভলবার সাফ করতে বসেছি শুনে ঘাবড়ে গিয়ে আপনি ধেয়ে-পেয়ে চলে এলেন?

—আপনার হাতে রিভলবার শুনলেও সেটা ঘাবড়ার কথা নয় বলছেন?

জবাব না দিয়ে হাসতে লাগলেন।

তাগিদ দিলাম, বলুন এবার কি ব্যাপার···।

গেলাসে একটা ছোট চুমুক দিয়ে বললেন, ছোট-খাটো তো নয়, লম্বা ব্যাপার। কি ভাবলেন একটু, আমার মুখের ওপর চাউনি উৎসুক একটু।

—আচ্ছা, আপনি তো আমাকে নিয়ে দিন-কতকের জন্য কোথাও সরে যাবার মতলব ফেঁদেই এসেছিলেন···এ-দিকে যা ঘটার সম্ভাবনা তার এখনো সাত-আটদিন দেরি আছে, তাহলে চলুন আমাতে-আপনাতে কয়েকটা দিন ঘুরেই আসি।

প্রস্তাব শুনে খুশি।—কল্যাণী যাবেন না?

হাঁক দিলেন, কল্যাণী! উনি আসতে গম্ভীরমুখে হুকুম করলেন, রাতের মধ্যেই যেটুকু পারো গোছগাছ করে নাও, কাল সকালেই আমরা কয়েক-দিনের জন্য বেরিয়ে পড়ব—ইনি তোমাকে ছাড়া নড়তে রাজি নন, বয়েস-কালে তোমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হলে মুশকিলেই পড়তাম দেখছি—

অন্তরঙ্গ রসিকতা স্থূল হলেও তার ভিন্ন মাধুর্য। আমি গম্ভীর-মুখেই আর একটু ইন্ধন যোগালাম।—আপনার কথার আমি প্রতিবাদ করছি, আমার বিবেচনায় এঁর বয়েস-কাল এখনো গত হয় নি।

অবধূত হা-হা করে হেসে উঠলেন। হাসছেন কল্যাণীও।

—আ-হা, অবধূতের আক্ষেপ, যাঁরা তোমাকে মাতাজী-মাতাজী করেন তাঁরা যদি এঁর সরস বিবেচনার কথা শুনতেন!···তা কি করবে?

জবাবটা কল্যাণী আমার দিকে চেয়ে দিলেন, নিয়ে যেতে পারেন তো যান, বেশ কিছুদিন ধরে ভিতরটা ওঁর সত্যি সুস্থির নয়, আপনার সঙ্গে গেলে ভালোই থাকবেন।

—আমরা তো যাচ্ছিই, প্রশ্ন আপনাকে নিয়ে।

—উনি খুব ভালো করেই জানেন এখান থেকে আপাতত আমি এক পা-ও নড়ছি না—

অবধূতের গম্ভীর মন্তব্য, 'আপাতত', শব্দটা মার্ক করবেন।

কল্যাণী তাঁর দিকে ফিরলেন, কোথায় যাবে ঠিক করেছ?

অবধূত জবাব দিলেন, প্রথমে তারাপীঠ তারপর বক্রেশ্বর। আমার দিকে তাকালেন, আপত্তি নেই তো?

—একটুও না। কোথায় যাওয়া হবে শুনে আমি সত্যি মনে মনে খুশি।

কল্যাণীর পরের প্রশ্ন শুনে আমি ঈষৎ সচকিত। প্রশ্ন তাঁর স্বামীকে।—তপু ঠিক কবে জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছে খবর পেয়েছ? গেলাসে আবার একটা ছোট চুমুক দিয়ে অবধূত জবাব দিলেন, কাল মঙ্গলবার, তার পরের মঙ্গলবার সকালে।

—দুই একদিন আগেও তো ছাড়া পেতে পারে···?

—পারে। আমি দিন দুই আগেই ফিরব। হেসে আমার দিকে তাকালেন।—স্ত্রীর কেমন দুশ্চিন্তা দেখুন আমার জন্য। তপু মানে তপন চ্যাটার্জী হলো একটি ছেলে যার প্রতিজ্ঞা পাঁচ বছর বাদে জেল থেকে বেরিয়ে প্রথম কাজ হবে আমার মতো নরাধমকে এই পৃথিবী থেকে স'রিয়ে দেওয়া—সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সে যদি আসে—আসে কেন আসবেই—উনি তাই বলির পাঁঠার মতো আমাকে আগে থাকতে এনে প্রস্তুত রাখতে

চাইছেন।

আমার চোখে শংকা উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল কিনা জানি না। কল্যাণী হেসে বললেন, কেন ভদ্রলোককে মিছিমিছি ভাবাচ্ছ—

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে অবধূত বললেন, হ্যাঁ, ভাবনার কি আছে, কার্তিকের মুখে তো শুনেছেন আমিও রিভলভার সাফ করে তাতে গুলি পুরে প্রস্তুত হয়ে আছি!

কল্যাণী হাসতে হাসতে চলে গেলেন! তক্ষুনি বুঝলাম এঁদের মনে কোনো-রকম শংকার ছিটেফোঁটাও নেই।

···বোতলের তরল পদার্থ খুব একটা কাজ করল না, ঘুম আসতে দেরিই হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে আমি কিছু মনে করতে চেষ্টা করছিলাম। মাত্র মাস কয়েক আগে কিছুটা স্বেচ্ছায়ই খবরের কাগজের অফিসের চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি। যতদিন ছিলাম, পদস্থ একজনই ছিলাম। প্রায় টানা তিরিশটা বছর সংবাদ-জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তাই কোনো বড় খবর স্মৃতির বাইরে চলে যাবার কথা নয়। এই রক্তক্ষয়ের যুগে যা মনে করতে চেষ্টা করছি তা অবশ্য খুব বড় খবর নয়। তবু যেন ধূ-ধূ মনে পড়ছে, বছর পাঁচ সাড়ে পাঁচ আগে কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল, কলকাতার কাছাকাছি কোনো জায়গার একজন গৃহী সাধক তাঁর আশ্রিত এক খুনীকে পুলিশের হাতে সঁপে দিয়েছিল যার বিরুদ্ধে শুধু ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার নয়, মেয়ে অপহরণ ও ধর্ষণ, লুঠ আরসন আর নানারকম অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাকটিভিটিরও অভিযোগ ছিল।·· সন বা বছর মনে পড়ল না, (পেটো কার্তিক অবশ্য বলেছিল সাতাত্তর সালের গোড়ার দিকের ঘটনা) আর বিচারে অপরাধীর কি সাজা হয়েছিল তা-ও মনে পড়ল না। কেবল এটুকু শুধু মনে পড়ছে, যে মেয়েকে অ্যাবডাকশান আর রেপিং-এর চার্জ দেওয়া হয়েছে—সেই মেয়েই আসামীর অনুকূলে সাক্ষী দিয়েছিল এবং তাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল।

পরদিন সকালের গাড়িতে আমরা রায়পুর হাটে। অবধূত আমাকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ মোহিনী ভট্চার্যের বাড়ি দেখালেন—যেখানে ছেলে-

বেলা থেকে কল্যাণী বড় হয়েছেন। বিয়ের পরও অনেকবার কল্যাণীকে নিয়ে শুধু এই এক জায়গাতেই এসেছেন শুনলাম। ভট্‌চায্‌ মশাই অনেক-কাল গত, তাই ওঁদের ওখানকার আকর্ষণও শেষ।

একটা হোটেলে দুপুরের খাওয়া সেরে সাইকেল রিক্সয় তারাপীঠ রওনা হলাম। মাইল তিনেক পথ। অপ্রশস্ত নদী দ্বারকার (দ্বারক) ব্রিজ পেরুলে মহাশ্মশান তারাপীঠ। অবধূত জিজ্ঞেস করলেন, আপনি রাতের জন্য হোটেলে বা ধর্মশালায় ঘর নেবেন একটা ?

শেষ যখন এসেছিলাম এখানে হোটেল ছিল না। এখন হয়েছে দেখলাম। মস্ত ধর্মশালা অবশ্য আগেই ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কদিন থাকার ইচ্ছে আপনার ?

তা তো জানি না, ভালো লাগলে দুই এক রাত থাকব, নয়তো চলে যাব। দুজনের দুটো স্যুটকেশ রাখার জন্যও ঘর একটা নিতেই হলো। হোটেলের ঘরই নিলাম। আমাকে ছেড়ে দিয়ে অবধূত তারামায়ের মন্দিরে উঠে গেছেন। হোটেলের খুপরি ঘরে হাত পা ছড়িয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে রইলাম। এখানে এলে মনে একটা অকারণ ছাড়া-ছাড়া ভাব আসে। ঘণ্টাখানেক বাদে মন্দিরের সামনে এসে দেখি একটা ছাপরা দোকানঘরের সামনে কাঁচা মাটির রাস্তার ওপর টুলে বসে অবধূত আয়েস করে ভাঁড়ের চা খাচ্ছেন। আমাকে দেখে দোকানীকে হুকুম করলেন, বাবুকে, এক ভাঁড় চা দে। আর একটা টুল দেখিয়ে বললেন, বসুন—

বসলাম। চার-দিক যেমন নোঙরা, যেমনি রাজ্যের মাছি খাবারের দোকানে ভনভন করছে, কিছু মুখে দিতে প্রবৃত্তি হয় না। সেটা বুঝেই হয়তো অবধূত বললেন, ফুটন্ত জল ভিন্ন চা হয় না মশাই, নির্ভয়ে খেয়ে নিন, এখানে নার্ভাস হয়েছেন কি পেট বিগড়েছে, মনে একটা তুরীয় ভাব এনে ফেলুন।

রাত্রি সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে বেশ পরিতোষ সহকারে মাংস রুটি খেলেন, আমাকেও খাওয়ালেন। তারপর বললেন, এবারে আমি শ্মশানে বশিষ্ঠদেবের আশ্রমের চাতালে বসব···ওসব জায়গা আপনার ভালো লাগবে না, হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করুন বা ঘুমোন।

সঙ্গে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, সমস্ত রাত ওখানেই থাকবেন?

—তা বলতে পারি না।

আমরা শ্মশানে নেমে এলাম। নদীর পাড়টা আগাগোড়াই শ্মশান। তবু শব নিয়ে শব-বাহকরা বেশিরভাগ এ-দিকেই আসে। এই পরিবেশও যেমন নোঙরা তেমনি পীড়াদায়ক। হাড়-গোড়, শেয়ালে খাওয়া মৃতদেহের অংশ, আর শতচ্ছিন্ন কাঁথা ন্যাকড়া বা জীর্ণ তোষকের ছড়াছড়ি। একপ্রস্থ ঘুরে এসে আমাকে নিয়ে অবধূত চাতালে উঠে বসলেন। বললেন, এখানেই ছিল বশিষ্ঠদেবের সহস্রমুণ্ডীর আসন। বামাক্ষ্যাপাও এখানে বসেই তপস্যা করতেন। ওই আসনের ওপরই এই মন্দির তোলা হয়েছে। শুনি, অনেকে নাকি এই সহস্রমুণ্ডীর আসনে বেশিক্ষণ স্থির হয়ে বসতে পারে না।

কিন্তু স্থির হয়ে বসার পক্ষে বড় অসুবিধে অন্য কারণ। মশার উৎপাত। অজস্র মশা মুহুর্মুহু ছেঁকে ধরছে। খানিক বাদে অবধূত হেসে বললেন আপনি হোটেলে চলে যান, বললাম তো আপনার অসুবিধে হবে—

ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলাম, ছেলের অসুখের সময় একজনের নির্দেশে আমি পর-পর তিন-রাত এই চাতালের আসনে বসে কাটিয়েছি, জলাহার ফলাহারে থেকেছি।

অবধূত নির্বাক খানিক। তারপর বলে উঠলেন, দিলেন মশাই মনটা খারাপ করে, আপনার ছেলের কথা মনে হলেই আপনার স্ত্রীর মুখখানা আমার চোখে ভেসে ওঠে। আবার খানিক চুপ করে থেকে মন্তব্য করলেন আপনি ভিতরে ভিতরে মানুষটা বেশ শক্তই···।

বসে আছি। হঠাৎ অদূরে শ্মশানের এক-দিক থেকে একটু শোর-গোল ভেসে এলো। আবছা অন্ধকারে তুটো লোক ছুটে বেরিয়ে গেল। আরো জনাকয়েক না ছুটলেও হনহন করে এ-দিকেই আসছে।

অবধূত বললেন, চলুন দেখি কি ব্যাপার—

তুজনে নেমে এলাম। একজনকে থামিয়ে উনি জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে—

তুজন লোক, তাদের স্পষ্টই ভয়ার্ত মুখ। আরো তিনটি লোক দ্রুত এ-দিকে আসছে দেখলাম। তুজন জ্যান্ত মানুষ দেখে এই তু'জন একটু যেন

আশ্বস্ত হলো। তার ওপর অবধূতের পরনে আর গায়ে ঝকঝকে রক্তাম্বর। হাঁপাতে হাঁপাতে যা নিবেদন করল, তাজ্জব হবার মতোই। কারা একটা মৃতদেহ ফেলে রেখে সৎকার না করেই চলে গেছে। হয়তো খুব গরিব, কাঠের খোঁজে গেছে। এরা একদল এসেছিল শিবা-ভোগ অর্থাৎ শেয়ালের ভোগ দিতে। দগ্ধ অর্ধ দগ্ধ, বা মৃতদেহের সামনে ভোগ দিতে পারলে সেটা সব থেকে প্রশস্ত। তাই সৎকার হয় নি এমন একটি মৃতদেহ দেখে খুশি হয়ে সেখানেই তারা শিবা-ভোগ সাজিয়েছিল। একটু বাদে তারা দূরে বসে অপেক্ষা করবে, শেয়ালের ভোজ খাওয়া দেখবে। কিন্তু তার আগেই তাজ্জব কাণ্ড, আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা শব নড়ছে, একটা হাত বাড়াতে চেষ্টা করছে। তারা শুনেছিল, সৎকার হয় নি এমনি একটি মৃতদেহ নাকি ইদানীং খাবার চায়। ভয় পেয়ে কয়েকজন ছুটে পালিয়েছে। সাহস করে যারা দাঁড়িয়েছিল মৃতদেহকে আরো বেশি নড়াচড়া করতে দেখে তারাও পালাচ্ছে।

অবধূত বললেন, চলুন তো কি ব্যাপার দেখি—আপনার পকেটে টর্চ আছে তো?

টর্চ পকেটেই ছিল। দুজনে এগিয়ে চললাম। শ্মশান বাঁক নিয়ে বরাবর গেছে। গজ বিশেক গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে আপাদ-মস্তক নোঙরা কাপড়ে ঢাকা দেওয়া একটা দেহই বটে। তার গজ কয়েক তফাতে শাল-পাতায় শিবা ভোগ রয়েছে। টর্চটা আমার হাত থেকে নিয়ে অবধূত ওই দেহের ওপর ফেললেন। দেহ নড়ছে। আবার একটা হাত আস্তে আস্তে চাদরের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে আছি।

অবধূত হেসে উঠলেন।—বুঝেছি, ওরে ব্যাটা জ্যান্ত মড়া! উঠবি তো ওঠ নইলে জ্যান্ত চ্যালা-কাঠ দিয়ে এখানে তোকে পিটিয়ে মারব আমি!

হাতটা আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে গেল।

অবধূত প্রায় গর্জন করে উঠলেন, আর তিন সেকেণ্ড, তার পরেই আমি পিটাতে শুরু করলাম, আমাকে চিনিস না!

অন্ধকার স্তব্ধ শ্মশানে তারপর একটা কাণ্ডই হলো। এক মূর্তি চাদর

ফেলে শোয়া থেকে উঠে বসল। গাল-ভর্তি দাড়ি। চোখ দুটো গর্তে। জীর্ণ, কংকালসার। জ্যান্ত দেখেও অস্বস্তি। টর্চের আলোয় তাকাতে অসুবিধে হচ্ছে, অবধূতের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে জোড় করল।

ধমকের সুরে অবধূত জিজ্ঞেস করলেন, মড়া সেজে পড়ে আছিস কেন—শিবা-ভোগ খাবার লোভে?

করুণ জবাব এলো, হ্যাঁ বাবা, বড় গরিব—

—লোককে এ-রকম ভয় দেখিয়ে তুই এই কাণ্ড করিস?

—ভয় না দেখালে যে বাবা কেউ চলে যায় না, শিবা-ভোগ খাওয়া দেখার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকে—ওরা শেয়ালের ভোগ খাওয়া দেখে পুণ্যি করে, আমি জিয়ন মুনিষ খাতি পাই না—

অবধূত ওর মুখ থেকে সরিয়ে টর্চের আলোটা কলাপাতার ওপর ফেললেন। সেই আধ-সেদ্ধ মাংস-ভাত আরো কি-সবের চেহারা দেখেই গা ঘিনঘিন করে উঠল। আর ওই খাবার জন্য লোকটার দুচোখ জ্বল জ্বল করছে।

—উঠে আয়।

চাদরটা কাঁধে ফেলে আবার হাত জোড় করে লোকটা উঠে এলো।

—আয় আমার সঙ্গে।

লোকটা প্রায় ডুকরে উঠে অবধূতের পায়ে ধরতে এলো।—এই ইট্টিবার ছাড়িন দে বাবা, ধরিন দিলে উয়ারা মু-কে মাইর্যে লাশ ফেলি দিবে, ছাড়িন দে বাবা—

অবধূত থমকে তাকালেন তারপর লালজামার নিচে গোঁজা কাপড়ের থলে বার করে হাত ঢোকালেন। যা বেরুলো তার থেকে একটা পাঁচ-টাকার নোট তুলে তার দিকে বাড়ালেন।—নে ধর, পিটুনি খেয়ে মরাই বরাতে আছে তোর, ক'দিন লোককে ফাঁকি দিবি—আজ দোকান থেকে ভালো কিছু কিনে খেয়ে নেগে যা—

লোকটা টাকা নিল। ওর মুখ দেখে মনে হলো একসঙ্গে পাঁচটা টাকা কমই চোখে দেখেছে।

পরদিনই আমরা বক্কোমুনির থানে অর্থাৎ বক্রেশ্বর মহাশ্মাশানে। তখন বিকেল। খোঁজ নিয়ে মন্দিরের চাতাল থেকে অবধূত যে আধ-বয়সী

লোকটিকে ধরে নিয়ে এলেন সে-ই হলো কংকালমালী ভৈরবের ডেরা দেখাশুনোর ভার নিয়ে আছে। কর্তাদের অর্থাৎ ভট্চায মশাই আর তাঁর ভাইয়ের ছেলেদের ব্যবস্থা এটা। আজ এটা তাদের তীর্থক্ষেত্র। ফি সপ্তাহে রামপুর হাট থেকে তাদের কেউ না কেউ এখানে এসে ভৈরব বাবা আর ভৈরবী মায়ের পুজো দিয়ে যায়। লোকটার নাম যশোদাকান্ত। অবধূতকে দেখা-মাত্র চিনেছে এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেছে। সাগ্রহে মাতাজীর খবর নিয়েছে। জোয়ান বয়সে দু'বার কলকাতা গেছল আর মাতাজীর সঙ্গে দেখা করেছিল বলল। বড় দুঃখ ছিল একবারও বাবার সঙ্গে দেখা হয় নি। আমাদের নিয়ে সে ডেরার সামনে এসে দাঁড়াতে অবধূতের মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখলাম। গম্ভীর শুধু নন, তাঁর প্রাণমন যেন নিজের কাছে নেই। প্রথমে দাওয়ায় মাথা কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর দাওয়ায় উঠে সোজা উপুড় হয়ে শুয়ে মেঝেতে কপাল রেখে পড়ে রইলেন প্রায় মিনিট খানেক। উঠলেন। যশোদাকান্ত সামনের ঘরের শিকল নামাতে বাইরে পা রেখে আবারও ঘরের মেঝেতে উপুড় হলেন। এবারে মিনিট দুই।

পরিবেশ গুণ আর এখানকার অনেককিছু অবধূতের মুখে শোনা বলেও হতে পারে, এক অননুভূত ভাবের আবেগে আমিও নির্বাক। বিকেলের আলোয় তখনো টান ধরে নি। ঘরে ধূপ-ধুনো দেবার ব্যবস্থা দেখলাম। সামনের দেয়ালে জটাজুটধারী ত্রিশূল হাতে দীর্ঘাঙ্গ এক নগ্ন তান্ত্রিকের মস্ত ছবি টাঙানো। বলাবাহুল্য ইনিই কংকালমালী ভৈরব। শোনার সঙ্গে মেলে। দেখে মনে হবে এই পৃথিবীর ওপরেই ক্রুদ্ধ বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু চোখ-দুটো ঝকঝকে। হাতখানেক দূরে অবধূতের পরম ইষ্ট ভৈরবী-মা অর্থাৎ কল্যাণীর মা মহামায়ার ছবি টাঙানো। দুজনের মাথার ওপরে মস্ত কালীর ছবি। অবধূত একে একে ছবির পায়ে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। আমিও করলাম। তারপর দুজনকে ভালো করে দেখায় মন দিলাম।

হ্যাঁ, এই ভৈরবী মা-ও অপূর্ব সুন্দরীই বটে। কিছুটা কল্যাণীরই মুখের আদল। কিন্তু বেশ-বাসের জন্য হোক, বা মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধার জন্য হোক, আমার অন্তত মনে হলো তুলনা করলে কল্যাণীকেই বেশী

সুন্দরী বলতে হবে।

অবধূত একবার এঁকে দেখছেন একবার ওঁকে।

···মনে পড়ল, বাইরে উগ্ররাগী এই কংকালমালী ভৈরবকে নাকি কল্যাণী শিব-ঠাকুর বলে ডাকতেন, আর তাই শুনে মহাভৈরব গলে যেতেন।··· আঠারো উনিশ বছরের কল্যাণীর ভিতরে ঢোকার আগে জিজ্ঞেস করতেন, শিব-ঠাকুর, ঠিক-ঠাক মতো আছ? ভিতরে ঢুকব? ···সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে খুশি-ঝরা দরাজ গলা শোনা যেত, আমি ঠিক-ঠাক মতোই আছি, তোর অসুবিধে হলে একটু দাঁড়া, বাঘছালটা কোমরে জড়িয়ে নিই।

···আর একবার কল্যাণী জন্মাষ্টমীর দিনে এই মহাতান্ত্রিককে ফুলের মুকুট চুড়ো আর বাঁশি দিয়ে সাজাতে এসেছিল, বলেছিল, আমার হাতে পড়ে তুমি আজ মুরলীধর হবে। কংকালমালী ভৈরব হা-হা হেসে বলেছিলেন, ঠিক আছে, সাজা—তারপর থেকে রাধিকা হয়ে আমার কোলে বসে আমার সঙ্গে বাঁশী ধরতে হবে—যা ডবকাখানা হয়েছিস—রাধিকাও এমন ছিল না! সাজানোর পরে বজ্র হুংকারে ডেকে উঠেছিলেন, অবধূত! এই শালা ভূত। অবধূত ভিতরে ঢুকে দেখেন ভৈরব-বাবাকে সত্যিই ফুল-সাজে সাজানো হয়েছে, ফুলের মালা, ফুলের বালা, ফুলের বাজুবন্ধ মাথায় শিখী-চূড়া, হাতে বাঁশী। বলে উঠেছিলেন, দ্যাখ্ শালা, ভালো করে দ্যাখ্, রাধিকা বলল, ডেকে দেখাও, হিংসায় জ্বলে যাবে···ঠিক বলেছে, জ্বলছিস, হা-হা-হা—

···রাধিকা (অর্থাৎ কল্যাণী) কেন বলেছিল হিংসায় জ্বলে যাবে, অবধূত কল্পনাও করতে পারেন নি। ওই একজনের তাঁর জীবনে আসাটা আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখার মতো, কিন্তু কল্যাণী তখন থেকেই এই ভবিতব্য অব-ধারিত জানতেন। সবই অবধূতের মুখে শোনা আমার, কিন্তু এই পরি-বেশে এসে সেইসব শোনা স্মৃতি আমার কাছেই জ্যান্ত হয়ে উঠছে। অবধূতের স্থির ভাবাবেগ আঁচ করা কঠিন নয়।

যশোদাকান্ত জানান দিল, সন্ধ্যার আগে রোজ এসে সে ভৈরব বাবার এই ঘর আর দাওয়া পরিষ্কার করে, বাবার ঘরে প্রদীপ জ্বেলে ধূপ-ধুনো দিয়ে যায়। ঘরের কোণে দু'খানা শিতলপাটিও গোটানো দেখলাম। এখনকার

কর্তারা এসে বসেন বোধহয়। জলের কুঁজো গেলাসও আছে।

প্রায় আধ-ঘণ্টা বাদে বাইরে এসে অবধূত বললেন, বিয়ের আগে পর্যন্ত আমি এই দাওয়াতেই থাকতাম, এখানেই তিন রাত থাকব···আপনার তো অসুবিধে হবে।

জবাব দিলাম, আমি থাকার জন্য আপনার অসুবিধে না হলে আমার অসুবিধে হবে না।

হাসলেন। খুশিও হলেন মনে হয়। যশোদাকান্তকে জিজ্ঞেস করলেন, হোটেল থেকে আমাদের তুজনের রাতের খাবার এখানে দিয়ে যেতে পারবে?

—যা বলবেন এনে দেব।

—ঠিক আছে, আমরা একটু ঘুরে আসি। তুমি তোমার কাজ সারো, আর রাত আটটা নাগাদ আমাদের খাবার দিয়ে যেও—বলা-টলার কিছু নেই, রুটির সঙ্গে মাছ মাংস তরকারি যা পাও নিয়ে আসবে। শিতলপাটি তুটো বাইরে পেতে রেখো, কুঁজোয় যেন জল থাকে।

কিছু টাকা ওর হাতে দিয়ে অবধূত আমাকে নিয়ে শ্মশানে বেড়াতে বেরু-লেন। তাঁর গুরু কংকালমালী ভৈরব যেখানে বসতেন সেই জায়গাটা দেখা-লেন, সেখানেও কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

সন্ধ্যায় লোকালয়ের দিকে এলেন। এ-দিক সে-দিক হয়ে একটা নির্জন জায়গায় এসে দেখি সামনে একটা দিশি মদের দোকান। বেপরোয়ার মতো ঢুকে পড়ে তুটো সীল করা পাঁইট কিনলেন। বলাবহুল্য নির্জলা দিশি।

বেরিয়ে এসে বললেন, ঘাবড়াচ্ছেন কেন, যে দেশের যা—খাসা জমবে দেখবেন।

ফিরে এসে দেখি বাইরের দাওয়ায় পাটি পেতে যশোদাকান্ত আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বলল, শেয়াল-টেয়াল এসে টেনে নিয়ে যাবে, তাই যেতে পারছিলাম না।

—ঠিক আছে।···ভালো কথা, আগে তুটো মাঝারি সাইজের ভাঁড়, এই ধর টাকা খানেকের ছোলা-সেদ্ধ কয়েকটা কাঁচা-লঙ্কা কিছু আদা কুচি, একটা পাতি লেবু আর খানিকটা নুন দিয়ে যাবে।

মনে হলো উদ্দেশ্য বুঝেই লোকটা চলে গেল। আমি মন্তব্য করলাম, যে দেশের যা—

—না তো কি, তিনি এখন নিজের মেজাজে, এই জিনিসের ওপর দিয়েই দ্বারভাঙার কমলাগঙ্গার ধারে কাঁকুড়ঘাটির মহাশ্মাশানে আমার তিন-তিনটে বছর কেটেছে মশাই।

—কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে আমি তো নার্ভাস হচ্ছি!

—সঙ্গদোষে সব ঠিক হয়ে যাবে। পাটিতে বসে বোতল দুটো সামনে রাখলেন। নিজের গায়ের জামা খুলতে খুলতে বললেন, জামা খুলে ফেলুন, গরম লাগছে—ঘরে হাত পাখাও আছে বোধহয়, যশোদাকান্ত আসুক—সত্যি বেশ গরম লাগছে। যে ঘরে ঢুকতে লোক ভয়ে কাঁপত, যশোদা-কান্তর অপেক্ষায় না থেকে আমি অনায়াসে সেই ঘরে ঢুকে গেলাম। একটাই হাত পাখা আছে, সেটা এনে বসলাম।

সরঞ্জাম নিয়ে যশোদাকান্ত আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরল। অবধূত হুকুম করলেন ভাঁড় দুটো ভালো করে ধুয়ে দিয়ে যাও, আর জলের কুঁজোটাও বাইরে রেখে যাও।

যাবার আগে যশোদাকান্ত বলে গেল ঘণ্টা দেড়েক বাদে আমাদের রাতের খাবার দিয়ে যাবে, মাংসও পাওয়া যাবে।

অবধূত বললেন, ভেরি গুড—এসো।

দিশি জিনিসের গন্ধটা আমার ভালো লাগছে না। কিন্তু অবধূত দেখলাম নির্বিকার। স্কচ হুইস্কি আর মাংসের চাট যে পরিতৃপ্তি নিয়ে খান, এই দিশি বস্তু আদাছোলা কাঁচা লংকা আর নুন সহযোগে সেই পরিতৃপ্তি নিয়ে খেয়ে চলেছেন। অন্ধকার রাতের এই পরিবেশ বড় অদ্ভুত লাগছে আমার। অনেক দূরে একটা চিতা জ্বলছে। এ-দিক ও-দিক থেকে শেয়াল ডেকে উঠছে। দাওয়ায় একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঘরের দরজার সামনে রাখা হয়েছে। পুরনো দিনের কথাই বেশি বলছিলেন অবধূত। রোগীরা কতদূর পর্যন্ত লাইন করে দাঁড়াতো, ভৈরবী মা কোথায় কি-ভাবে বসতেন, তাঁর চোখের দৃষ্টিই এমন এমন ছিল যে কত লোক ভাবত ওই চোখ দিয়েই মা অর্ধেক রোগ তুলে নিচ্ছেন। অবধূতকে নিয়ে কল্যাণী কত ভাবে তার মায়ের সঙ্গে

ঝগড়া করার ফিকির খুঁজে বেড়াতো, ইত্যাদি।

প্রথম পাঁইট শেষ হবার পর দ্বিতীয় বোতল খোলা হতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিয়ের পর আর আপনি এখানে মোটে আসেন নি?

—গোড়ায় কল্যাণীকে নিয়ে বছরে দু'একবার রামপুরহাট আসতাম, তখন দুই এক ঘণ্টার জন্য এখানেও ঘুরে যেতাম। শেষ এই দাওয়ায় বসে এক রাত কাটিয়েছি সেই একষট্টি সালে আরো বাইশ বছর আগে···আমার দু' বছরের ছোট বৈমাত্রেয় ভাই সুবীর—সুবুকে নিয়ে।

মনে পড়ল ঘর ছাড়ার সময়ে ওঁদের সংসারের বিমাতাটি ছিলেন কড়া স্কুল মাস্টার। তাঁর দুই ছেলে আর এক মেয়েকে কড়া শাসনে মানুষ করতেন, এঁটে উঠতে পারতেন না কেবল এই সতীনপো'র সঙ্গে। তাঁর নালিশে বাবার হাতে এই ছেলেকে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করতে হতো। কল্যাণীকে বিয়ে করে কোন্নগরে বসবাসের সময় ওই সংসারের সঙ্গে অবধূতের নিশ্চয়ই আবার যোগাযোগ হয়েছিল, নইলে বৈমাত্রেয় ভাইকে তিনি পেলেন কোথায়? উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ওই বৈমাত্রেয় ভাইয়েরও বুঝি এ লাইনে মন ছিল?

ভাঁড়ে একটা বড় চুমুক দিয়ে মুখে দু'চারটে ছোলা ফেলে চিবুতে চিবুতে অবধূত জবাব দিলেন, তখন এক কল্যাণীর দিকে ছাড়া ভাইয়ের আর কোনো দিকে মন ছিল না, কল্যাণীর দিক থেকে ওর মন ফেরানোর চেষ্টাতেই এক রাতের জন্য এই ডেরায় তাকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম।

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম খানিক। তারপর নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলাম। প্রশ্নটা আপনিই বেরিয়ে এলো, বলেন কি···বাষট্টি সালে মানে তখনকার কত বয়েস?

—আমার চুয়াল্লিশ, ভাইয়ের আটতিরিশ আর কল্যাণীর পঁয়তিরিশ —ভাই অবশ্য সেটা কখনো বিশ্বাস করে নি, কল্যাণীর বয়েস ও কখনো কুড়ির বেশি ভাবে নি—বিয়ের সাত বছর বাদে প্রথম ও কল্যাণীকে দেখেছিল, তখনই নিজের মাকে বলেছিল, দাদা এত বড় তন্ত্রসাধক হয়েছে যে তার মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে—পঁয়তিরিশেও একই রকম দেখে অবশ্য ওর ভুল কিছুটা ভেঙেছিল, কিন্তু মাথাটা সেই

জন্যেই আরো বেশি বিগড়েছিল।

আবার ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়ে শরীরে ছোট একটু ঝংকার তুললেন। সেটা তরল পদার্থের কারণে হতে পারে, আবার অপ্রিয় স্মৃতির আলোড়নেও হতে পারে। গলার স্বরে খেদও স্পষ্ট একটু, যেমন কপাল, হতভাগা চোখ দিতে গেল কিনা কল্যাণীর দিকে, চেষ্টা করেও ফেরানো গেল না ...যাবে কি করে তাকে পাবার অন্ধ আক্রোশে তখন যে কাঁধে শনি চেপে বসেছে ওর।

...প্রসঙ্গের শুরু এখান থেকে হতে পারে আমার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। খুব ঢিমে তালে অতীতের ওপর থেকে একটা পর্দা সরে যেতে লাগল। একদিনে নয়, দূরের সেই চিত্র আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরো তিন রাত কেটে গেল। তার কারণ রাত না হলে অবধূতকে ঠিক বলার মুডে পাওয়া যায় না। আবার রাত এগারোটা না বাজতে একলা তিনি শ্মশানে চলে যান। রাত এগারোটা অবশ্য এই পরিবেশে গভীর রাত্রি। কখন ফেরেন টের পাই না।...সকাল থেকে আমি রাতের এই দুই আড়াই ঘণ্টার অপেক্ষায় থাকি। নিজেই দুটো দিশি বোতল কিনে রাখি। যশোদাকান্ত আনুষঙ্গিক সব দিয়ে যায়। সন্ধ্যার পর সব নিয়ে পাটি পেতে প্রস্তুত হয়ে দাওয়ায় বসি। অবধূত তাঁর খুশি মতো শুরু করেন আবার খুশি মতোই চুপ মেরে যান। তখন আর তাগিদ দিয়ে লাভ হয় না। আবার পরের সন্ধ্যার প্রতীক্ষা।

...এবারে আমি অবধূতের-জীবনের আর একটি অধ্যায় পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারি। সেই সঙ্গে দিব্যাঙ্গনা স্থির যৌবনা অধ্যাত্ম তেজের ঘরের মেয়ে কল্যাণীর শান্ত জীবনের আর একটি অনাবৃত দিকও। এঁদের একজনকে ছেড়ে আর একজন কত যে অসম্পূর্ণ সেটা এই মহাশ্মশানে কংকালমালী ভৈরবের ডেরার দাওয়ায় বসে যত অনুভব করেছি, ততো আর কখনো করি নি।

৬

··সেটা সাতচল্লিশ সালের শেষের দিক। এই বাংলার মানুষ স্বাধীনতার মাশুল গুণছে। পৃথিবীর অনেক দেশকেই রক্তের মূল্যে স্বাধীনতা পেতে হয়। কিন্তু এই বাংলার মাটি লাল চোরাগোপ্তার অন্তর্ঘাতী রক্তে, সাম্প্রদায়িক হানাহানির রক্তে। এই সময়ে কোন্নগরে গঙ্গা আর শ্মশানের কাছাকাছি কল্যাণীকে নিয়ে নির্জনে বাসা বেঁধেছেন অবধূত। সঙ্গে লোক বলতে তখন একমাত্র হারু।

এই নব-দম্পতীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো লোকালয় নয় তখন এটা। আশপাশে তখনো কোনো বাড়িই হয় নি। সামনের দিকে দূরে ছাড়া ছাড়া দুই একটা বাড়ি। পড়শী বলতে বেশ কিছু উদ্বাস্তুর চালা-ঘর। কলকাতার থেকে পুব-বাংলার ঘর ছাড়া মানুষ এই উপকণ্ঠেও উপছে পড়েছে।

কালীকিংকর অবধূত এখানে এসেই বেশ-বাস বদলেছেন। রক্তাম্বর ধরেছেন। রক্তবর্ণ ধুতি, রক্তবর্ণ পাঞ্জাবি বা ফতুয়া। ম্যাড়মেড়ে নয়, দস্তুর মতো সৌখিন কাপড়ের অথবা সিল্কের। এ-ব্যাপারে কল্যাণীর নির্দেশ মেনেছেন। তিনি হেসে বলেছেন, যা খুশি পরো, কিন্তু ভালো জিনিস এনো বাপু।

অবধূতের এই পোশাক আর তাঁর নিঃশব্দ আচরণ অনেকটাই পাবলিসিটির কাজ করেছে। উদ্বাস্তুরা আর কিছু, দূরের মানুষেরাও লক্ষ্য করেছে, তাদের চোখে লালের ধাক্কা লাগে। দেখে, মানুষটা কারো সঙ্গে মেশে না, প্রায়ই শ্মশানে যায় আসে, শ্মশানের শব-বাহকরা এক-একদিন তাঁকে রাতেও ধ্যানস্থের মতো বসে থাকতে দেখে। অনেকে বিশেষ করে উদ্বাস্তুরা সাগ্রহে আলাপ করতে আসে। তান্ত্রিক যে এটা সকলেই বুঝেছে, কিন্তু মানুষটা কখনো তন্ত্রীয় আচার বিচার বা অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি কথাও বলেন না। বরং কারো অসুখ করলে দেখতে আসেন, ওষুধ দেন। আর অশ্চর্য, তাঁর ওষুধ যেন কথা বলে। দেখতে দেখতে এটাই প্রচারের বড়

জিনিস হয়ে উঠতে লাগল। শহর ছাড়িয়ে এই দূরের নির্জনে আস্তানা নিলেও হারুকে নিয়ে অবধূতের দোকান-হাটে পাটে-বাজারে যাওয়া তো আছেই। লোকে সসম্ভ্রমে ঝক-ঝকে লাল-বসন পরা প্রসন্নমুখ তান্ত্রিককে দেখে। কোথা থেকে এলো তা নিয়েও গবেষণা করে।

আর একটা প্রচারও একটু একটু করে দানা বেঁধে উঠল। লাল বসন তান্ত্রিকের ঘরে একটি অনন্য রূপসী বউ আছে। কখনো তাঁকে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কোনোদিন বা গঙ্গা স্নান সেরে ফিরতে দেখা যায়। তান্ত্রিকের ভৈরবী-টৈরবী মনে হয় না, দেখে বিয়ে করা বউই মনে হয়। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর, গলায় সোনার হার, হাতে সোনার চুড়ি শাঁখা। কিন্তু রোগের ওষুধ বিসুদ জানে একজন তান্ত্রিক এমন এক দিব্যাঙ্গনা বউ যোগাড় করলেন কি করে? মানুষটার উপার্জন কিছু আছে বলেও তো মনে হয় না, ওষুধ-টসুধ যা দেন তারও দাম পর্যন্ত নেন না। চলে কি করে?

এ-প্রসঙ্গে হেসে অবধূত মানবাচরণের একটু ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সাধকরা যদি সাধনা নিয়ে কচকচি না করেন, আর কিছু আধি-ব্যাধি তাক্-লাগানোর মতো করে সরিয়ে দিতে পারেন—লোকের তাঁর সম্পর্কে কৌতূহলের সীমা থাকে না, আর তাঁর প্রতি এক ধরনের ভয়-মেশানো শ্রদ্ধাও উপছে ওঠে। কোন্নগরের মানুষেরা এই রীতির ব্যাতিক্রম নয়। এই দুটো কারণেই কাছের দূরের আর আরো দূরের লোকের আনাগোনা বাড়তে থাকল। অনেকেরই কর্মক্ষেত্র কলকাতায়। এমন লোক সম্পর্কে প্রচার সর্বত্রই মুখে মুখে ছড়ায়। কলকাতার মানুষদেরও আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। এর মধ্যে অবশ্য কয়েকটা বছর গেছে। ততদিন বহু-রোগের ধন্বন্তরী চিকিৎসক হিসেবে তিনি অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত। হারুর কাজ দিনে দিনে বাড়ছিল। কিন্তু তাঁর চিকিৎসার সঙ্গে চোখ-ধাঁধানো লাল-বসন তান্ত্রিকের সাধনার কিছু অলৌকিক যোগ লোকে নিজেরাই কল্পনা করে নিয়েছে। তা যদি না হবে, লোকটা শ্মশানে যান কেন, কোনো কোনো রাত সেখানে কাটান কেন?

শুধু শরণার্থী নয়, উপদ্রবও এসে জুটত গোড়ার দিকে। এই প্রজন্মে

মাস্তানের আবির্ভাব কোথায় না ঘটেছে। ঘরে ওই বয়সের রূপসী বউ থাকলে উপদ্রব এড়ানো খুব সহজ নয়। আর চোখে দেখার থেকে না-দেখা সুন্দরীর আকর্ষণ ঢের বেশী। রমণীর যে রূপ দেখে অনেক মুনি-ঋষির ধ্যান ছুটেছে, যে রূপ দেখে পৃথিবীর অনেক রাজা-বাদশার মাথা বিগড়েছে, অনেক রক্ত ঝরেছে, অনেক আগুন জ্বলেছে—তেমনি তিলে-তিলে গড়া এক তিলোত্তমা আছে তান্ত্রিকের ঘরে, তাকে একবার চোখে না দেখলে চলে? অনেকেই সকাল বিকেলে এ-দিকে ঘুরঘুর করত, যাদের ভাগ্যে দর্শন মিলত তাদের প্রচারে কল্যাণীর রূপ এক-আধগুণ বেড়ে যেত। অসুখের ভান করেও এইসব মাস্তানদের কেউ কেউ এসে হাজির হয়েছে। এঁদের মুখ দেখলেই অবধূত রোগ বুঝতে পারতেন, আর অন্দর মহলের দিকে চোরা-চাউনি দেখলে চিনতে তো পারতেনই। অবধূত বলতেন, আপনাদের সহজ আর স্বাভাবিক রোগ ভাই, এক্ষুণি সেরে যাবে। বলেই হাঁক দিতেন, কল্যাণী!

তিনি সামনে এসে দাঁড়ালে বলতেন, এঁদের অসুখ করেছে তাই তোমাকে ডাকা, তারপর রোগী দুজন বা তিনজনকে বলতেন (একা কেউ আসত না), দেখুন ভাইয়েরা, খুব ভালো করে দেখে নিন, বার বার তো ওঁকে বিরক্ত করা যাবে না—কিন্তু ভাই একটা কথা রাত-বিরেতে যেন খাঁড়া হাতে মা-কালীকে স্বপ্নে-টপ্নে দেখে আঁৎকে উঠবেন না।

মান বাঁচাতে কেউ কেউ চোখ লালও করছেন, স্ত্রীকে ডেকে এ-কি রকম যাচ্ছেতাই রসিকতা মশাই আপনার!

কল্যাণীরও চোখে মুখে হাসি উছলে উঠত। বলতেন, ওঁর ওই-রকমই বিচ্ছিরি কথাবার্তা, আপনারা বসুন, মায়ের প্রসাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হারু প্রসাদ নিয়ে আসত। তাই খেয়ে তারা খাবি খেতে খেতে চলে যেত। ···কাকতালীয় কিছু কি ঘটে না? তা-ও একবার ঘটেছিল। এদেরই একজনের চোখের কি খারাপ ব্যামো হয়েছিল। ওমনি রটে গেছল, এটা পাপের শাস্তি। শ্মশানচারী তান্ত্রিকের ঘরে গিয়ে তাঁর বউয়ের রূপ গিলতে চাওয়ার শাস্তি। এমনকি যার ব্যাধি তারও পর্যন্ত এই ধারণাই হয়েছিল। আবার এসে অবধূতের পা জড়িয়ে ধরেছে। অবধূত নিজে টাকা খরচ করে

তাকে কলকাতার ভালো চোখের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছেন, চিকিৎসা করিয়ে রোগ সারিয়েছেন। পরবর্তী জীবনে সেই মাস্তান মাতাজীর মহা ভক্ত শিষ্যদের একজন।

একে একে সাত বছর কেটে গেছে, কিন্তু এর মধ্যে কালীকিংকর অবধূতের নিজের সমাচার সুস্থির নয় খুব। অস্থিরতার সবটুকুই মানসিক। হঠাৎ-হঠাৎ রোগের মতো সেটা চাড়িয়ে ওঠে। কল্যাণীর লক্ষ লক্ষ টাকা। এ-জন্য অবশ্য নিজের প্রতি ভদ্রলোকের কোনোরকম হীনমন্যতা বোধ নেই। এই সম্বলের ব্যবস্থা বক্রেশ্বরের ভৈরবী মা অন্যথায় শাশুড়ী শুধু মেয়ের জন্য করেন নি। আর কংকালমালী ভৈরবের অনুমোদন ছাড়া এ বিয়ে কখনোই হতে পারত না। তিনি কি আর কতটুকু তা জেনেই এবং তাঁর কাছ থেকে বিষয়-গত কোনো প্রত্যাশা না রেখেই এই বিয়ে হয়েছে। আর ঠাণ্ডা মাথায় আর একটা সত্যও তিনি অনুভব করতে পারেন। কল্যাণী যে-রকম স্থির মেজাজের মেয়ে, তাঁর অপছন্দেও এই বিয়ে কখনোই হতো না। হয়তো বা তার মায়ের চেষ্টায় এ-পছন্দটা কিছুটা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে এই মেয়ের আচরণের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করেও অবধূতের মনে হয়েছিল তাঁরও নিজস্ব পছন্দ কিছু আছেই।
মুখেও জানতে বুঝতে কসুর করেন নি।—আচ্ছা, তুমি শুধু তোমার মায়ের ইচ্ছেয় আর ভৈরবগুরু মত দিলেন বলেই আমাকে বিয়েটা করলে, তাই না?
কল্যাণীর সাদা-সিধে জবাব, তা কেন, তাঁদের জন্য মনে একটু বেশি জোর পেয়েছিলাম অবশ্যই—কিন্তু প্রথম দিন দেখেই আমার কেমন মনে হয়েছিল বিয়েটা তোমার সঙ্গে হতে পারে।
—নাঃ, আমি বিশ্বাস করি না—কেন মনে হয়েছিল?
—তা কি করে বলব, তার আগে অবশ্য মেসোমশাইয়ের মুখে শুনেছিলাম, এম. এ. পড়া একটি ঘর-ছাড়া ছেলেকে মা নিজের ছেলের আদরে শিবঠাকুরের আশ্রয়ে রেখেছেন—তখন অবশ্য একটু খটকা লেগেছিল, বরাবরই জানি আমার মা অনেক দূরের চিন্তা করতে পারেন···। তবে আমার

পছন্দ ভিন্ন এ বিয়ে হতো না এটা জেনে রেখো, শিবঠাকুরও আগে আমার মত জেনে তারপর নিজের মত জারি করেছিলেন।

অবধূতের শোনার লোভ।—তোমার পছন্দ হতে গেল কেন?

কল্যাণীর সোজা জবাব, হলে কি করব!

না, টাকার জোর নয়, টাকা রোজগারের বরাত অবধূতের নিজেরই শুরু হতে খুব সময় লাগে নি। কল্যাণীর চালচলন আচরণে আর একটা সহজ অথচ অব্যর্থ জোরের আভাস তিনি পান যা তাঁর নিজের নেই মনে হয়। এটা বলিষ্ঠ আর স্বতঃস্ফূর্ত সত্তার জোর কিনা তিনি ভেবে পান না। সবকিছু সহজে আর অনায়াসে গ্রহণ করার যেন একটা অদ্ভুত শক্তি আছে তাঁর মধ্যে। অবধূত সেটাই পরখ করতে চান, ধাক্কা দিয়ে দেখতে চান—সময় সময় এই চেষ্টাটা আঘাতের মতোও হয়ে ওঠে—কিন্তু কল্যাণী সব বুঝে সব-কিছু মেনে নিয়েই তাঁকে আরো বেশি জব্দ করেন। ফলে থেকে থেকে মনে হয়, তিনি যেন কল্যাণীর জীবনে অপরিহার্য একজন হয়ে উঠতে পারছেন না এমনি তাঁর সত্তার জোর। এই শক্তি কল্যাণী তাঁর শিবঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছেন ভাবেন, তবু চ্যালেঞ্জ করার ঝোঁক। পরখ করার ঝোঁক। ভৈরবী মা হঠাৎ চলে যেতে অবধূতের চোখে জল এসেছিল, ভৈরব-গুরুর জন্যও মনটা বিষাদে ভরে গেছল, কিন্তু আশ্চর্য সহজ নির্বিকার দেখেছেন নিজের এই স্ত্রীটিকে। এ-রকম হবে এ-যেন তাঁর জানাই ছিল। উল্টে বলেছেন, আমার দুঃখ হবে কেন, শিবঠাকুরকে তো চোখ বুজলেই দেখতে পাই, ডাকলে তো পাই-ই।

প্রায় আড়াই বছর বাদে অবধূতের হঠাৎই মনে হলো, কল্যাণীর ছেলেপুলে হচ্ছে না কেন? না হবার তো কোনো কারণ নেই, ভোগের সময় কোনো-রকম সাবধানতারও ধার ধারেন না তিনি। তাহলে কি ব্যাপার?

কথাটা কল্যাণীকে বলতেই তিনি খুব সহজেই একেবারে অবাক-করা কথা বলেছেন।—ছেলেপুলে তো হবে না, শিব-ঠাকুর তো বলেই ছিলেন, শুধু তোমাকে নিয়েই আমার এ-জন্ম শেষ, প্রারব্ধও শেষ, সন্তান-সন্ততি হবে না।

শুনে অবধূত রেগেই গেছলেন।—আলবত হবে! ছেলেপুলে হওয়াটা

তাঁর হাত না আমার হাত ?

কল্যাণী হেসে ফেলেছিলেন, তোমার হাতেই তো আড়াই বছর ধরে আছি চেষ্টার কসুর করেছে ? হলে হতো না ?

অবুঝের মতো গোঁ-ধরে অবধূত বলেছেন, সে-রকম সংকল্প নিয়ে চেষ্টা করি নি—একটা ছেলে বা মেয়ে অন্তত চাই আমার। বলতে বলতে বসে আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছিলেন।—চেষ্টাটা প্রায় অত্যাচারের মতোই হয়ে উঠেছিল···বুঝলেন, তবু অন্যজনের সহিষ্ণুতার অপবাদ দিতে পারব না।

আবার বছর ঘুরে গেল। ছেলেপুলে হবার কোনো লক্ষণ না দেখেও অবধূত কংকালমালী ভৈরবের উক্তি মেনে নিতে রাজি নন। বলেছেন, দুজনের কারো কিছু গণ্ডগোল আছে, কলকাতায় গিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে হবে। কল্যাণীর কাছে এ-ও যেন এক কৌতুকের ব্যাপার। একবারও আপত্তি করেন নি। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পরীক্ষা করে কোনো রকম দেহগত ত্রুটি খুঁজে পান নি কারো। অবধূত নিজের বা কল্যাণীর ঠিকুজির খোঁজ রাখেন না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর বা স্ত্রীর হাতে দুই একটি করে সন্তানের স্বাভাবিক রেখা আছে।

তাঁর মন্তব্য কানে লেগে আছে। বলেছিলেন, ঘটনা কোন্ পর্যায়ে গেলে সেটা অলৌকিক বলব আমি ঠিক জানি না। অভ্যাস বা অনুশীলনে অনেক কিছুই পারা যায় যা সাধারণ লোকের বিচার-বুদ্ধির অগোচরে। কিন্তু আমার কাছে শুধু এ-সব ধরনের ব্যাপারগুলোই অলৌকিক।

···ক্রমশ অবধূত একটু বেশি আত্মসচেতন হয়ে উঠতে লাগলেন। নিজের ভিতর দেখেন, প্রবৃত্তি দেখেন, বিশ্লেষণ করেন। নিজের তুলনায় কল্যাণীর সত্তার জোরের পাল্লাটা অনেক বেশি ভারী মনে হয়। অসহিষ্ণুতা বাড়ে। তাঁরও ভিতরে বিবাগী সুপ্ত মন একটা আছেই। সে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় তাঁর মনের একটা দিক স্ত্রীর ক্রীতদাস হয়ে আছে। অবধূত মাঝে মাঝে ঘর ছাড়তে শুরু করলেন, মাঝে মাঝে পালাতে শুরু করলেন। নিজের কাছ থেকে নিজেকে উদ্ধার করা বড় কঠিন ব্যাপার।

ঘটনার সাজ দেখা শুরু হলো তখন থেকে। পুরী বেনারস গেছেন, লক্ষৌ হরিদ্বার দেরাদুন মুসৌরি করেছেন। সর্বত্র কিছু না কিছু ঘটেছে। কারো না কারো সঙ্গে আশ্চর্য রকম যোগাযোগ হয়েছে। পরে মনে হয়েছে কেউ যেন তাঁকে নাকে দড়ি পরিয়ে টেনে নিয়ে গেছল। তাঁর পার্টটুকু তাঁকে দিয়ে করিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এক-দিক দিয়ে তাঁর লাভ হয়েছে বইকি। মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তি তাঁর কাছে থেকে এসেছে।

কিছুদিন বাদে ফিরে এসে কিছুটা সুস্থির হয়ে বসেন। তারপর আবার ছটফটানি শুরু হয়। ক্রীতদাসের বন্ধন ছেঁড়ার তাগিদে সময় সময় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন। কিন্তু কল্যাণী নির্লিপ্ত, তার মনে যেন কোনো আঁচড়ই পড়ে না। কিছু বললে হেসে জবাব দেন, শিবঠাকুর তো বলেই রেখেছিলেন কারণে অকারণে তুমি জ্বালাবে আমাকে।

ঘটনার সাজ একটা বড় রকমের বাঁক নিল কোন্নগরে আসার সাত বছর বাদে। পাটনা যাবেন বলে কলকাতায় এসেছিলেন। বয়েস তখন সাঁই-তিরিশ। রক্তাম্বর বেশ-ভূষা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে লম্বা সিঁদুর টিপ, মাথার চুলে কদম-ছাঁট—সব মিলিয়ে চেহারার মধ্যে বলিষ্ঠ গোছের তন্ত্র-সাধকের ছাপ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে। জিনিস-পত্রের মধ্যে কাঁধে কেবল একটা ভারী ঝোলা। বাইরে বেরুনোর সময় প্রয়োজনীয় যা-কিছু সব ওই ঝোলাতে।

পাটনার গাড়ি রাতে। একজন ভক্তের সঙ্গে কথা হয়েছিল সকালের দিকে তাঁর বাড়িতে এসে রাতে রওনা হবেন। পাটনার টিকিটও তাঁরই কেটে রাখার কথা। তাঁর ছেলের রোগ নিরাময়ের বিনিময়ে অবধূত কিছু গ্রহণ করেন নি বলে সাগ্রহে এটুকু তিনি করতে চেয়েছিলেন।

বসে আছেন। ভিড় এড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের অন্য ধার দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে বছর তিরিশ একত্রিশের একটি লোক বসে আছে, পাশে ছোট একটা সুটকেশ। পরনে প্যাণ্ট শার্ট, কিন্তু তেমন দামী কিছু নয়। আপাতদৃষ্টিতে স্মার্ট। তাঁকে দেখে অবধূত দাঁড়িয়ে গেলেন। দেখতে লাগলেন। খুব মনে হলো এই লোকের সঙ্গে তাঁর কিছু নাড়ির যোগ আছে।

লোকটি বিমনা ছিল। গোড়ায় খেয়াল করে নি। কিন্তু লাল বেশ-বাসের এমনি মজা, চোখে পড়তেও খুব সময় লাগে না। লোকটি দেখল। তার-পর অমন বেশের একজনকে ও-ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে বেশ অবাক। ঝক-ঝকে দু'চোখ যেন তাঁর মুখের ওপর বিঁধে আছে।

অবধূত পায়ে পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দৃষ্টি মুখের ওপর তেমনি অপলক। লোকটি যেন একটু অস্বস্তি নিয়ে নিজের অগোচরে উঠে দাঁড়ালো।

—বলবেন কিছু ?

—সুবু···?

জবাব দেবে কি, ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

অবধূত আবার জিজ্ঞেস করলেন, সুবীর চ্যাটার্জী ?

এবারে তেমনি অবাক মুখেই মাথা নাড়ল। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল, আপনি···?

—চাঁদু নামে তোর কোনো দাদা ছিল কখনো ?

—দাদা···চাঁদুদা তুমি !

এই বেশ না হলেও চিনতে পারা আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য তিনি ভাইকে চিনেছেন। ষোল বছর হয়ে গেল ঘর ছেড়েছিলেন। এই ভাইয়ের বয়েস তখন বছর পনেরো! পনেরো বছরের ছেলেকে একতিরিশে চেনা খুব সাধারণ চোখের কাজ নয়। বিশেষ করে যে ভাই বা বাড়ির কথা এত বছরের মধ্যে কখনো মনেও আসে নি।

অবধূত হৃষ্ট মুখে বসলেন, তাকেও বললেন বোস। এই যোগাযোগ বড় অদ্ভুত লাগছে তাঁর। আজ সাত বছর হয়ে গেল কলকাতার এত কাছে আছেন। নিজের ভিতরেই বিবেকের খোঁচা খেলেন একটু। কর্তব্য বোধেও বাবা বা বৈমাত্রেয় মা ভাই বোনদের কথা একবার মনে পড়ে নি। ভাইয়ের মুখের দিকে একবার চোখ দুটো হোঁচট খেল কেন বুঝলেন না। ভিতরের ঈষৎ আবেগে ফের ভালো করে দেখার কথা মনে হলো না। বললেন, ঠিক ঠিক চিনেছিস না এখনো সন্দেহ আছে ? ··বাড়ির খবর কি ?

ছ'বছরের বড় ভাইকে এতকাল পরে দেখে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার কথা। কিন্তু ভাই তা করল না খেয়াল করেও অবধূত ভাবলেন, বেশি

রকম হকচকিয়ে গেছে বলেই ভুলে গেছে।

সুবীর চ্যাটার্জী পাশে থেকে আর একদফা নিরীক্ষণ করল।—এখন আদল আসছে ··কিন্তু চেহারা অনেক বদলে গেছে তোমার।···বাড়ির খবর বলতে সাত বছর হলো বাবা নেই, তারও বছর দুই আগে আবু গেছে, বাবা সেই শোকই মৃত্যু পর্যন্ত সামলাতে পারেন নি।

আবু···আবির, সব থেকে ছোট ভাই, তারও নিচে অবশ্য বোন স্থলু—স্থলতা।···বেঁচে থাকলে আবুর বয়েস এখন উনত্রিশ হতো, আট বছর আগে মারা গেছে মানে একুশ বছরে গেছে। জিজ্ঞেস করলেন, আবুর কি হয়েছিল?

—পুরী বেড়াতে গিয়েছিল, সমুদ্রে ডুবে শেষ।

অবধূত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন একটু। নিজেকে স্বার্থপরই মনে হচ্ছে এখন।—স্থলুর বিয়ে হয়ে গেছে তো? কোথায়?

—ধানবাদে। ওর হাসব্যাণ্ড সেখানে এক কলিয়ারির অ্যাকাউনটেণ্ট।

—আর মা···?

মা এখনো চাকরি করছে, ওই পুরনো স্কুলেরই অ্যাসিসট্যাণ্ট হেড-মিসট্রেস এখন, ষাটে রিটায়ারমেণ্ট, আরো একবছর চাকরি আছে···তার পরেই ভাবনা।

অবধূতের দু'চোখ আবার ভাইয়ের মুখের ওপর থমকালো একটু।

—ভাবনা কার···কেন ভাবনা?

এড়ানো গোছের জবাব শুনলেন, নানারকমর ঝামেলা, ভাবনা চিন্তা। ভুগছেও খুব।

তক্ষুনি বুঝলেন সরল জবাব পেলেন না। চেয়ে রইলেন একটু। চাউনিটা মুখের ওপর হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে সুবীর চ্যাটার্জী থতমত খেল একটু।

অবধূত বললেন, তোরও তো দিন খুব সুবিধের যাচ্ছে মনে হচ্ছে না··· মদ-টদ বেশি মাত্রায় খাস নাকি?

শুনে প্রথমে সচকিত একটু। তারপর হেসে সহজ হবার চেষ্টা।—বেশি মাত্রায় আর জোটে কোথায়, তুমি মুখ দেখেই বুঝে ফেললে?

—মুখ দেখে আমি কিছু কিছু বুঝতে পারি।

বেশ-বাস, গলায় রুদ্রাক্ষ, আঙুলে রূপোর ওপর মস্ত পলার আংটি সুবীর চ্যাটার্জী আর এক প্রস্থ ভালো করে দেখে নিল।—তান্ত্রিক সাধু-টাধু হয়ে গেছ নাকি?
প্রশ্নের মধ্যে একটু তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই স্টেশনে যে, চলেছিস কোথায়?
—রাউরকেল্লা।
—সেখানে কেন?
—একটা চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে। হঠাৎ উৎসুক একটু।—মুখ দেখে কিছু-কিছু বুঝতে পারো···মুখ দেখে বলে দিতে পারো চাকরিটা হবে কি না?
অবধূতেব তখনো ধারণা ভাই যে চাকরি করছে তার থেকে কোনো ভালো চাকরির ইণ্টারভিউ হবে। স্থির দুটো চোখ আবার তার মুখের ওপর বিদ্ধ হলো। ছোট ভাই দুটো আর বোনকে ভালোই বাসতেন তিনি। কিন্তু এতকাল বাদেও ভিতরে একটা অপ্রসন্ন অনুভূতি কেন জানেন না। জবাব দিলেন, পারি। হবে না।
আধফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল। ক্রোধের স্পষ্ট অভিব্যক্তি। একটা হতাশার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হলো যেন। সুবীর চ্যাটার্জীও ভুলে গেল দীর্ঘ ষোল বছর বাদে বড় আকস্মিক ভাবে এই দাদাটির সঙ্গে তার দেখা। বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল, আর যদি হয়···তোমার দেখা পাব কোথায়?
—কোন্নগরে। গঙ্গার ধারে শ্মশানের দিকে যেতে যে কোনো লোককে জিজ্ঞেস করলে বাড়ি দেখিয়ে দেবে।
···বাড়ি না তোমার আশ্রম?
—বাড়ি। তোর গাড়ি ক'টায়?
আটটা পঞ্চাশ, এখন কটা বেজেছে?
অবধূত লক্ষ্য করলেন, ইণ্টারভিউ দিতে চলেছে, কিন্তু হাতে একটা ঘড়িও নেই।—সাড়ে আটটা।···মা সেই আগের বাড়িতেই আছেন তো?
—না। একটু ইতস্তত করে সুবীর চ্যাটার্জী জবাব দিল, বাবা জীবিত থাকতেই দুজনে মিলে ধার দেনা করে ছোট একটু বাড়ি করেছিল, বেশির

ভাগই মায়ের টাকায় হয়েছে, এখনো ধার শোধ হয় নি বলে মায়ের মাইনে থেকে টাকা কাটান যায়, তার জন্য মা-কে টিউশনিও করতে হয়—

অবধূত থমকে চেয়ে আছেন। হেসে ফেললেন, তোর অত ফিরিস্তি দেবার কোনো দরকার নেই, তোদের বাড়িতে আমি কোনো ভাগ বসাতে যাব না—কোথায় বাড়ি? নম্বরটা কি?

বাড়ি ফার্ন রোডের কাছে। নম্বরও বলল। অবধূতের মনে হলো চাকরি হবে না বলায় এখনো তার ভিতরের উষ্মা যায় নি।...আশা নিয়ে যাচ্ছে এ-রকম না বলাই উচিত ছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য কেন যে একটা বিরূপতা তাঁকে পেয়ে বসল কে জানে।

—এখন গেলে মায়ের সঙ্গে দেখা হবে? স্কুলের জন্য ক'টা থেকে তৈরি হন?

ভাইয়ের চাউনি দেখে মনে হলো এক্ষুনি বলবে যাওয়ার দরকার কি তোমার? মোলায়েম না হলেও অন্য জবাবই পেলেন।—দুদিন ধরে মা হাঁপের টানে খুব কষ্ট পাচ্ছিল, স্কুলে যাচ্ছে না।

আর কিছু না বলে অবধূত উঠে পড়লেন। যাবার আগে বলে গেলেন, ফিরে এসে পারলে কোন্নগরে যাস একবার, আমি আজই দিন পাঁচ সাতের জন্য পুরী যাচ্ছি।

ট্রামে বাসে এ-সময় প্রচণ্ড ভিড়। অবধূত একটা ট্যাক্সি নিলেন। মন থেকে ভক্তের চিন্তা বা পুরীর চিন্তা সরে গেছে। ড্রাইভারকে বললেন বালীগঞ্জের দিকে যেতে।...ভিতরটা টানছে খুব। কেন? জানেন না। ভাই সুবুকে দেখে একটুও ভালো লাগল না। এত কালের সমাচার জানেন না, কিন্তু মনে হলো তার ভিতরে অনেক রাগ ক্ষোভ আর অসহিষ্ণুতা জমে আছে। আর মনে হলো সে-রকম সহজ সরল রাস্তায় চলে নি।...স্কুলমাস্টার মায়ের কড়া শাসনে থেকেও ভাইটা এ-রকম হলো কি করে? বাড়ি ছাড়ার সময় তো ক্লাস নাইনে পড়ত, স্কুলে তো বরাবর ফার্স্ট সেকেণ্ড হতো, এই ছেলের জন্য মায়ের মনে মনে বেশ গর্ব ছিল। বাবাকে শোনাতেন, শাসনে রাখতে পারলে ছেলে-মেয়ে আবার বিগড়য় কি করে?...এই বয়সে সুবু নতুন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে রাউরকেল্লা, তার মানে যে কাজে আছে

তাতে আদৌ খুশি নয়।

রাস্তাটা সরু হলেও ট্যাক্সি ঢোকে। বন্ধ দরজার গায়ে বাড়ির নম্বর আঁটা। যাঁর কাছে আসা দোতলার ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তিনিই তাঁকে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মেটাতে দেখলেন। তারপর তারই দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে আরো অবাক। নমিতা দেবী ভিতরের দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। নিচে কর্মব্যস্ত ঠিকে ঝি দরজা খুলে দিতে চোখে আবার লালের ধাক্কা।

ভারী গলার প্রশ্ন শুনলেন, মা কোথায়?

ঝিয়ের জবাব, ওপরে···ডেকে দিচ্ছি। এই বেশের মানুষ দেখে সে-ও সন্ত্রস্ত।

—তিনি অসুস্থ শুনেছি, ডাকতে হবে না, আমাকে ওপরে নিয়ে চলো।

নমিতা দেবী ওপরে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে দেখছেন। তাঁর কথা শুনছেন। পরিচিত জনের মতোই ওপরে নিয়ে যাবার প্রস্তাব। তাড়াতাড়ি তিনিই নিচে চলে যাবেন না অপেক্ষা করবেন ভেবে পেলেন না। ততক্ষণে ঝিয়ের পিছনে রক্তাম্বর বেশ-বাসের আগন্তুক দোতলায় হাজির।

অবধূত থমকে দাঁড়ালেন। স্থির চোখে কয়েক পলক চেয়ে রইলেন। সাদাটে চামড়ায় মোড়া কংকাল-সার রমণী দেহ।···মা কোনোদিনই স্বাস্থ্যবতী ছিলেন না, কিন্তু তা বলে এই চেহারা কল্পনা করা যায় না। অবধূত পায়ে পায়ে এগোলেন।···মায়ের বিভ্রান্ত ফ্যালফেলে চাউনি।

অবধূত বারান্দাতেই জানু মুড়ে হাঁটুর ওপর বসলেন, উপুড় হয়ে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করলেন।

নমিতা দেবী শশব্যস্তে দু'পা পিছিয়ে গেছেন, নিজের অগোচরে দু'হাত জোড় করে ফেলেছেন। আর তেমনি বিমূঢ় চোখে চেয়ে আছেন। রক্তাম্বর বেশ-বাসের দরুন শুধু নয়, অনায়াসে ওপরে উঠে আসা, এগিয়ে আসার মধ্যে এক-ধরনের স্নিগ্ধ সৌম্য ব্যক্তিত্ব দেখেও হঠাৎ অভিভূত তেমনি। তাঁরই উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে দেখলে। সন্ত্রস্ত হবার কথা।

অবধূত মুখ তুলে সোজা হলেন। চোখে চোখ রেখে বললেন, আমি চাঁদু।

রক্তশূন্য কোনো শীর্ণ মুখে বিস্ময়ের এমন রেখাপাত অবধূত কমই দেখেছেন। ···চাঁতু ! গলার স্বরেও বিস্ময় ঝরল। চাঁতু কে এ-ও ভালো করে মাথায় বসছে না যেন। এবারে ছু'তিন পা এগিয়ে এলেন।—তুমি ···তুই চাঁতু ! সেই চাঁতু···!

অবধূত উঠে দাঁড়ালেন। সহজ ভারী গলায় বললেন, আমি বছর কয়েক হলো কোন্নগরে আছি, পুরী যাব বলে সকালেই কলকাতায় চলে এসেছিলাম, স্টেশনে সুবুর সঙ্গে দেখা, শুনলাম ইন্টারভিউ দেবার জন্য রাউরকেল্লা যাচ্ছে, তার কাছ থেকে তোমাদের ঠিকানা নিয়ে চলে এলাম।

কোটরাগত ছু'চোখে এখনো যেন বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব।—সুবু তোকে দেখে চিনতে পারল···?

—তা পারে নি, আমিই ওকে দেখে চিনেছি।···কিন্তু এ-কি তোমার চেহারা হয়েছে মা ! সুবুর মুখে শুনলাম হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছ খুব, ডাক্তার কি বলে, কার্ডিয়াক কিছু নয় তো ?

নিজের স্বাস্থ্য সমাচার বলবেন কি, বিমাতাটির এখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। কোনোরকমে জবাব দিলেন, না, আজ ছ'সাত বছর হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি দেয়ালের দিক থেকে একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে এলেন, বোস—তুই সেই চাঁতু···আমার কথা শুনে আমাকে দেখতে এসেছিস, তোকে এত কষ্ট দেবার পরেও আমাদের মনে রেখেছিস।

শুনে ছুঃখই হলো অবধূতের। বিমাতা বলে ইচ্ছাকৃত ভাবে কখনো কোনো কষ্ট তাঁকে দেন নি। সর্ব ব্যাপারে নীতির দিকে প্রখর দৃষ্টি ছিল, তাই রেগে যেতেন আর বাবার কাছে নালিশ করা কর্তব্য ভাবতেন। অবধূত কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে দেওয়ালের কাছে রাখলেন। নিঃসংকোচে বিমাতার ছুই কাঁধে নিজের ছু হাত রেখে তাঁকে ওই চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।—আগে তুমি স্থির হয়ে বোসো মা, উত্তেজনাতে আবার হাঁপাচ্ছ দেখছি—

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আর একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে মুখোমুখি বসলেন।···মায়ের ছু'চোখ ও-রকম হয়ে উঠল কেন ! সন্তানের হাতের দরদরে স্পর্শ কতকাল পান নি ? এই ব্যাপারগুলো অনুভব করতে অবধূতের সময় লাগে না।

—এবার সব খবর বলো, বাবা নেই আর আবুটাও নেই শুনেছি—

নমিতা দেবীর শীর্ণ মুখের পাতলা ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল বার কয়েক। তারপর বললেন, সবই আমার অদৃষ্ট আর কর্মের ফল বাবা, নিজের ছেলেদের নিয়ে বড় গর্ব ছিল···সব থেঁতলে দিয়ে গেল। তুই অমানুষ হয়ে যাচ্ছিস ভেবে তোকে কত যন্ত্রনা দিয়েছি, নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবলে এখনো মনে হয় আমার জ্বালাতেই তুই ঘর ছেড়েছিস।

—ও-কথা তুমি আর একবারও বলবে না মা, কেউ আমার উপকার বই অপকার করে নি, জীবনে যা পেয়েছি তার জন্য আমি সক্কলের কাছে ঋণী।···যাক, স্বলুর কেমন বিয়ে হলো, ধানবাদে থাকে শুনলাম, ছেলে-পুলে কি?

—মোটামুটি পর পর তিনটেই মেয়ে, এ হয়েছে আমার আর এক চিন্তা। মেয়েগুলোর অসুখ লেগেই আছে, খরচে টান পড়লে চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকেই টাকা পাঠাতে লেখে···ভাই-বোন দু'জনেই ভাবে আমি টাকার গাছ—ঝাঁকালেই পড়বে। উৎসুক হঠাৎ, ও-কথা থাক, আগে তোর কথা বল, তোর এই বেশভূষা কেন?

অবধূত ফিরে প্রশ্ন করলেন, খারাপ লাগছে?

—খারাপ লাগছে না, হঠাৎ তোকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে আমার মনে হচ্ছিল কোন্ মহাপুরুষ এলো!···সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে গেচিস?

অবধূত হেসে জবাব দিলেন, লোকে আমাকে তান্ত্রিক কালীকিংকর অবধূত বলে জানে···কিন্তু সাধু হয়েছি কি ভণ্ড হয়েছি সেটা এরপর তুমি কোন্নগরের বাড়ি এসে নিজে বিচার করবে—কবে তোমাকে নিয়ে যাব বলো—আমার ইচ্ছে করছে আজই নিয়ে যাই।

মায়ের পাতলা ঠোঁট আবার একটু থরথর করে কেঁপে উঠল কেন বুঝলেন না। অস্ফুট স্বরে বললেন, যাওয়া অদৃষ্টে থাকলে যাব, কবে হবে কে জানে। পরের প্রশ্নটা স্বুবুর মতোই, কিন্তু আদৌ তির্যক নয়।—কোন্নগরে তোর আশ্রম।

অবধূত হেসে জবাব দিলেন, গার্হস্থ আশ্রম বলতে পারো, সেখানে তোমার বৌ-মা আছেন, তাঁর তদারকে খেয়েদেয়ে বহাল তবিয়তে আছি।

—কতদিন বিয়ে করেছিস ?

—তা প্রায় আট বছর হতে চলল।

—ছেলেপুলে কি ?

—নেই।

এম. এ. বি. টি. পাস অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস মা বলে উঠলেন, এত দিনেও নেই কেন রে ?

অবধূত হাসতে লাগলেন। তারপর জবাব দিলেন, তোমার বউমাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলবেন, তাঁর শিবঠাকুর মানে বক্রেশ্বর থানের কংকালমালী মহা-ভৈরবের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর প্রারব্ধ এ-জন্মেই শেষ—তাই কোনো পিছু-টান নেই, সন্তানও নেই।

নমিতা দেবীর কোটরের দু'চোখ উৎসুক।—সেখানকার মস্ত সাধক বুঝি তিনি ?

—মস্ত সাধকই বলতে পারো, কিন্তু সেখানে আর নেই—আদৌ কোথাও আছেন কিনা তাও জানি না।

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, তুই তাঁকে দেখেছিস ?

আগে হলে এই এম. এ. বি. টি. মা সাধুসন্তদের প্রসঙ্গে নাক সিঁটকোতেন !

অবধূত জবাব দিলেন, তিনি আমার সাক্ষাৎ গুরুদেব, পাঁচ বছর ধরে দেখেছি।

নমিতা দেবী সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে আছেন। কেন বোধগম্য হলো না। একটু বাদে জিজ্ঞেস করলেন, তোর পুরীর গাড়ি কখন ?

—রাতে।···কিন্তু পুরী আর যাব কিনা ভাবছি।

—কেন ?

—এখনো তোমার বেশ হাঁপের কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি।···নাঃ, পুরী আর যাবই না, শোন মা, তোমার এই ছেলেকে লোকে মস্ত উঠতি তান্ত্রিক সাধু ভাবে, কিন্তু সত্যিই সে-রকম কিছু না—আসলে যেটা কিছু জানি সে হলো চিকিৎসা বিদ্যা—তার ফল পেয়েই লোকে অলৌকিক শক্তি ভাবে —যেতে দাও, এতক্ষণ তোমাকে দেখে আমি আঁচ করতে পারছি কি ওষুধ তোমার দরকার, আর কয়েকটা কথা কেবল জেনে নেব, সে হবে'খন,

পুরী যাওয়া থেকে আগে তোমাকে সারিয়ে তোলা বেশি দরকার—তুমি তোমার অসুখের ভাবনা এবার আমার হাতে ছেড়ে দাও মা।

বিমাতার দুই পাতলা ঠোঁট আবার থরথর করে কেঁপে উঠতে দেখলেন অবধূত। কোটরের চোখও ঝাপসা হয়ে উঠল। বিড়বিড় করে বললেন, মা···মা···মা বলে এখন কেউ আর ডাকেও না।

অবধূত নির্বাক। চেয়ে আছেন।

সামলে নিলেন, বললেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তোর কোনো অসুবিধে নেই তো? এখানে খেয়ে যেতে পারিস না?

—পারি। কে রাঁধে?

—কে আবার। অমিই।

—কি খাও?

—আমি তো সেদ্ধ আর সুক্তো-ভাত খাই, তা বলে তোকেও তাই খাওয়াব নাকি! কি খাস জেনে এক্ষুণি ঝি'টাকে বাজারে পাঠাব—ও-ই আমার বাজার-টাজার করে।

—ওকে বাজারে পাঠালে আমি খাব না। আজ আমি মায়ের প্রসাদ পাব —মায়ে-ছেলেতে সেদ্ধভাত খাব।

বিমাতার দুচোখ আবারও ঝাপসা হয়ে আসছে। উঠে চলে যেতে বললেন, বোস, আসছি—। একটু এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন।—তোর আমিষ চলে কি চলে না বল্—

—আমর'সব চলে, কিন্তু কিছু দরকার নেই বললাম তো।

চলে গেলেন। দশ মিনিটের মধ্যে একটা ডবল ডিমের ওমলেট আর দু'পিস টোস্ট ডিশে নিয়ে এলেন।—পাশেই দোকান, কিছু অসুবিধে হয় নি, খেতে তো একটু দেরি হবে, পরে আমার সঙ্গে খাবি। অবধূত খুশি হয়েই ডিশ হাতে নিলেন।

মা-কে বলে পনেরো বিশ মিনিটের জন্য বেরুলেন। কিন্তু ধারে'কাছে কোনো দোকানে ফোন পেলেন না। খোঁজ করতে করতে একেবারে পোস্ট অফিসে এসে তবে পেলেন। কলকাতার ভক্তকে জানালেন তাঁর ওখানে যাওয়া হচ্ছে না, পুরীও না। ট্রেনের টিকিট বিক্রী করে দিতে বলে ফিরতে আধ

ঘণ্টার বেশী সময় লেগে গেল।

এসে দেখেন বিমাতা রান্নায় ব্যস্ত। সেদ্ধ আর স্থক্তো ছেড়ে বাসনে ছু' রকমের তরকারিও কোটা রয়েছে। পাশে ছুটো ভাঁড় দেখেই বুঝলেন, দই আর মিষ্টি আনানো হয়েছে। মায়ের রান্নার ব্যবস্থা দোতলাতেই। এক তলার পর পর ছুটো ঘরেই দোকান, তার মানে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। খুশিমুখে বলে উঠলেন, এ-যে মস্ত ব্যবস্থা দেখছি!

মা হাসলেন একটু। বললেন, রান্নার আনন্দ ভুলেই গেছি, আজ তুই খাবি বলে আমার উৎসাহ বেড়ে গেছে।

অবধুত বারান্দা থেকে একটা বেতের চেয়ার এনে কাছে বসলেন। তুই এক কথার পর জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মা, সুবুর বউ ছেলে মেয়ে কাউকেই এখানে দেখছি না, কি ব্যাপার বলো তো?

শীর্ণ মুখে টান ধরতে দেখলেন। একটু বাদে জবাব দিলেন, ও হতভাগার কথা থাক এখন বাবা—

অবধুত স্তব্ধ একটু। ও-প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে একটু বাদে বললেন, তুমি কষ্ট পেলে থাক মা···মুখ দেখে আমারও মনে হয়েছিল ও খুব ভালো নেই। আমার সত্যি সে-রকম কোনো ক্ষমতা আছে কিনা বোঝার জন্য জিজ্ঞেস করেছিল, যে ইণ্টারভিউ দিতে রাউরকেল্লা যাচ্ছে সেই চাকরিটা হবে কি না। আমি হবে না বলতে ও রেগেই গেল—

মা ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, তুই না বললি···সত্যি হবে না তাহলে? হতভাগার দূরে কোথাও চাকরি হলে যে আমি বেঁচে যেতাম···তুই এ-রকম বলতে পারিস?

—মুখ দেখে ভাগ্যের লক্ষণ কিছু কিছু চিনতে পারি, দ্যাখো, আমার ভুল হতেও পারে। ভাইকে ও-রকম বলার জন্য অবধুত মনে মনে আর এক দফা পস্তালেন। একটু চুপ করে থেকে আবার মুখ খুললেন, তারপর তোমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে দিতে চায় না মনে হলো, ওর ভয় পাছে আমি বাড়ির অংশ দাবি করি—

রাঁধতে রাঁধতে মা রূঢ় মন্তব্য করলেন, যেমন স্বভাব, ছুনিয়ায় ও ভালো কিছু দেখে না—

—যাক, শেষে দিল অবশ্য, কিন্তু এ-ও জানিয়ে দিল, এ-বাড়ির বেশির-ভাগই তোমার টাকায় হয়েছে, তুমি এখনো দেনা টানছ আর অসুস্থ শরীর নিয়ে এ-জন্য তোমাকে টিউশানিও করতে হচ্ছে·· সত্যি নাকি ?

মা জবাব দিলেন না। তাইতেই বোঝা গেল সত্যি। অবধূতের জানার আগ্রহ কত দেনা। কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারলেন না।

দুপুরের খাওয়া-দাওযার পর ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করে কোন্নগরে ফেরার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর আগে মায়ের অসুখ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ কর-লেন। নাড়ি দেখার অছিলায় হাতের রেখাও দেখে নিলেন। হিজিবিজি রেখাগুলো সব টানা অশান্তির চিহ্ন, শারীরিক এবং মানসিক। কিন্তু ঋণের চিহ্ন তেমন স্পষ্ট নয়, ফিকে হয়ে এসেছে। সে-রকম বড় অবস্থার কারো হাতে ঠিক এটুকু চিহ্ন থাকলে ঋণের পরিমাণ বেশি হতো। কিন্তু মায়ের অবস্থা যতটুকু আঁচ করতে পেরেছেন তাতে ঋণের পরিমাণ চার-পাঁচ হাজার টাকার বেশি হতে পারে না মনে হলো। বলে গেলেন, পরশু সকালের মধ্যে আমি তোমার ওষুধ নিয়ে আসছি—সেদিনও আমি তোমার হাতের ঠিক এই রান্নাই খেয়ে যাব কিন্তু।

·· অনেকদিন বাদে অবধূত একটা আত্মতৃপ্তির কাজ হাতে নিয়েছে যেন। একদিন বাদ দিয়ে তার পরদিন সকালেই এলেন। মা-কে দেখে আজ আগেরদিনের থেকে একটু প্রফুল্ল মনে হলো। বললেন, আমি ভাবছিলাম তুই কতক্ষণে আসবি।

জলখাবারের আয়োজনও করে রেখেছিলেন। মুখ হাত ধোয়া হতে নিয়ে এসে সামনে বসলেন। বললেন, তুই পরশু চলে যাবার পর থেকে আমার সমস্তক্ষণই মনে হয়েছে তুই আর এক মানুষ হয়ে ফিরেছিস, তোর এখন মস্ত শক্তি—

অবধূত হেসে উঠলেন। বললেন, শক্তি বলতে গুরুর দয়ায় আর আমার শাশুড়ী মায়ের দয়ায় রোগের চিকিৎসা কিছু শিখেছি, এ-ছাড়া মোটা-মুটি এক-রকমই আছি। আসলে তোমার নিজের মন বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই এতকাল পরে দেখা ছেলের অনেক শক্তি ভাবতে ভালো

লাগছে। জলখাবারের দিকে তাকালেন, অনেক আয়োজন করেছ দেখছি, ভালোই হয়েছে, খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু তার আগে তুমি একটা কাজ করো—

থলে থেকে একটা প্যাকেট বার করে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন, এটা ধরো দেখি—

কিছু না বুঝেই হাতে নিলেন, ওষুধের মোড়ক এ-রকম হয় কি করে ভেবে পেলেন না।—এতে কি ?

—তোমার বউমার সামান্য কিছু প্রণামী. আগে তুলে রেখে এসো।

শোনা-মাত্র আঁতকে উঠলেন, এত টাকা, না না না—

অবধূত বসা থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।—খিদের মুখে চলে যাব তুমি চাও ? আমার রাগ আর অভিমান কিন্তু এখনো সেই রকমই আছে—

মা ধড়ফড় করে উঠলেন, পাগলের মতো এ তুই কি কাণ্ড করছিস, এখানে তো অনেক টাকা ! তোকে আবার পেলাম এই ঢের—

—আমাকে আবার পেতে হলে এ ক'টা টাকা তোমাকে নিতে হবে। শোনো মা, আমার মা চাকরির পর এই শরীর নিয়ে টিউশনি করবে এ আর আমি হতে দেব না। খুব বেশি নয়, এখানে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা আছে এ-দিয়ে তোমার সব ধার শোধ হয়ে যাবে না ? হ্যাঁ কি না বলো ?

অস্ফুট জবাব দিলেন, হয়েও বেশি হবে, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর লাইফ ইনসিওরেন্স লোন মিলিয়ে আর চার হাজার দু'শ টাকা বাকি···কিন্তু এতকাল পরে এসে আমাকে তুই এ-ভাবে—

—বললাম তো আমাকে যদি ছেলে ভাব, এ নিয়ে আর একটি কথাও বলবে না। হাসলেন।—তাছাড়া আমি পরের ধনে পোদ্দারি করি মা, নিশ্চিন্ত থাকো, এ-টাকা আমারও না, তোমার বউয়ের।

—ছি ছি, যাকে চোখেও দেখি নি, তার থেকে তুই টাকা নিয়ে এলি ! কি ভাবল আমাকে···

—সে কিছু ভাবার মেয়ে কিনা একবার চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে, তুমি গ্রহণ করলে নিজেকে ধন্য ছাড়া আর কিছু ভাববে না, যাও, চট্

করে রেখে এসো—আমার খিদে পেয়েছে বললাম না ?

···চেয়ে আছেন। পাতলা দুই ঠোঁট থরথর করে এবারে বেশ কাঁপল। চোখের দৃষ্টি জলে ঝাপসা। বিড়বিড় করে বললেন, তোর কিছুই খিদে পায় নি, আমাকে টাকা নেওয়াবার জন্য খিদে-খিদে করছিস। টাকার প্যাকেট শাড়ির আঁচল টেনে বড় করে জায়গা করে বেঁধে গলায় জড়ালেন।—ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে রাখব, তুই খা।

অবধূত আনন্দ করে খেতে শুরু করলেন। মা অপলক চেয়ে আছেন। একটু বাদে জিজ্ঞেস করলেন, বেশি না হলেও এই দেনাটুকু শোধ হবার আগে যদি মরে যাই এ-জন্য আমার মনে খুব দুশ্চিন্তা ছিল···তুই সেটা আমাকে দেখে বুঝতে পেরেছিলি ?

—কিছু পেরেছিলাম, তাছাড়া সুবুও বলেছিল। কি মনে হতে তাড়াতাড়ি বললেন, তুমি কিন্তু টাকার কথা সুবুকে একদম বলবে না মা—ও শুনলেই ধরে নেবে আমার কোনো মতলব আছে।

অনুচ্চ কঠিন স্বরে মা বললেন, ওর মতলবের আর আমি ধার ধারি না, দিনে দিনে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে আমাকে···তবে তোর টাকা আছে জানলে তুই মুশকিলে পড়তে পারিস—

অবধূত উতলা।—কেন, ও চাকরি বাকরি করছে না ?

—সব গেছে! বলব, খেয়ে নে···ওই ভাইয়ের যদি মতি ফেরাতে পারিস এই পৃথিবীতে আর আমি কিছুই চাই না।

···মাকে ওষুধপত্র বুঝিয়ে দিয়ে ঘড়ি ধরে তা খাবার তাগিদ দিয়ে অবধূত বিকেলের দিকে কোন্নগর রওনা হয়েছেন। পনেরো দিন ওষুধ চলার পর আবার এসে খবর নেবেন বলে গেছেন।

মনটা বড় বিষণ্ণ। কড়া নিয়ম-নীতির এই মাটির কপালে সুবুকে নিয়ে এত দুঃখ আছে ভাবতে পারেন নি। এত ভালো ছেলে এমন পরিণামের দিকে গড়ায় কি করে, কে এই ভাবে কাকে সুখের বিপরীত দিকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেয়, কেন দেয়, ভেবে পেলেন না।

···সুবু ম্যাট্রিকে বেশ ভালো রেজাল্ট করেছিল। ছোট-খাট স্কলারশিপও একটা পেয়েছিল। বি. এ. আর এম. এ.-তে খুব অল্পের জন্য ইকনমিক্স-এ

ফার্স্ট ক্লাস পায় নি। চব্বিশ বছরের মধ্যে পরীক্ষা দিয়ে ভালো চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। গেজেটেড অফিসারের পোস্ট। মা দেখে শুনে একটি পছন্দের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন চাকরির এক বছরের মধ্যে। মেয়েও বি. এ. পাশ, এমনিতে বেশ ভালো, কিন্তু একটু মেজাজী।

···স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যে সুবুর চাকরির কপাল আরো খুলে গেল। আর সেটাই কাল হলো। রিলিফ অ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশনের পদস্থ অফিসার হয়ে বসেছে। উদ্‌বাস্তুদের নিয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় বিস্তর মাথা ঘামাচ্ছেন। সুবু তাঁরও নেক-নজরে পড়েছিল। ফলে ওর হাতে তখন অনেক ক্ষমতা, তার তদারকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে।

এর কিছুকাল পর থেকেই মা লক্ষ্য করলেন, বউয়ের সঙ্গে সুবুর প্রায়ই খিটির-মিটির ঝগড়াঝাঁটি বাঁধছে। তিনি জানেন কাজের চাপে সুবুর বাড়ি ফিরতে রাত হয়। পরে ওই বউয়ের কাছ থেকে জেনেছেন সুবু মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। মা কঠিন হাতে শাসনের চেষ্টা করেছেন। স্পষ্ট বলে দিলেন, এ-ভাবে চললে এ-বাড়িতে ঠাঁই হবে না। এরপর থেকে সুবু কিছুটা গোপনতার আশ্রয় নিল। তার প্রায়ই ট্যুর থাকে, ক্যাম্প ইন্সপেকশন থাকে। তখনকার খবর আর তিনি পাবেন কি করে।

কিন্তু অনেক খবর রাখত সুবুর বউয়ের এক মামাতো দাদা। সে ওই বিভাগের না হলেও অন্য বিভাগের ছোট-খাটো অফিসার। সে এই ভগ্নি-পতির সম্পর্কে অনেক খবর রাখত। ফোনে সাবধানও করত। কাগজে মাঝে মাঝে উদ্বাস্তু মেয়ে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগও থাকত। নাম না করলেও কোনো কোনো অফিসার এ-সব কেলেংকারির সঙ্গে যুক্ত এমন ইঙ্গিত বা কটাক্ষও থাকে। মা বউয়ের সঙ্গে সুবুর তুমুল ঝগড়ার আভাস পান। এক-এক রাতে সুবুর চাপা গর্জনও কানে আসে, মিথ্যে কথা! সব মিথ্যে! কাগজের লোকের চোখ টাটায় তাই এ-রকম লেখে।

···এরপর দেখা গেল কটাক্ষ এক-এক সময় এমন স্পষ্ট যে, এই অফিসার কে বা কারা স্পষ্টই ধারণা করা যায়। গণ্ডগোলের সূচনা দেখা দেয়। কিন্তু এত ক্ষমতা যাদের, যাদের হাত দিয়ে স্রোতের মতো টাকা খরচ

হচ্ছে, তাদের ধামা-চাপা দেবার শক্তিও খুব কম নয়। কিন্তু সুবুর বউ তো কাগজের খবরের ধার ধারে না, নিজস্ব কোনো ধারণা নিয়েও বসে নেই, সে তার মামাতো ভাইয়ের কাছ থেকে সঠিক খবরই পায়। ওদের ঝগড়ায় মায়ের ওই বাড়ি দিনে দিনে নরক হয়ে উঠতে লাগল।

এরপর এক উদ্‌বাস্তু ক্যাম্প থেকে বাইশ বছরের একটি বিধবা মেয়ে নিখোঁজ হওয়া নিয়ে কাগজে তোলপাড় কাণ্ড। পরে জানা গেছে এটা একই মেয়ে নিয়ে দুই অফিসারের মধ্যে ঈর্ষা আর রেষারেষির ফল। কিন্তু ওই গণ্ডগোল দানা বেঁধে উঠেছে মেয়েটি নিখোঁজ হবার মাস তিনেক পরে। তার আগে পর্যন্ত ধামা-চাপা দিয়ে চলছিল। ওই দুজনের মধ্যে ব্যর্থ অফিসারটি একজন পরিচিত সাংবাদিককে গোপনে খবর সরবরাহ করেছে, মেয়েটিকে উধাও করে কোথায় রাখা হয়েছে, কোথায় তাকে ছোট-খাটো একটি শেলাইয়ের দোকান করে দেওয়া হয়েছে, এমনকি সেই মেয়ের ছবি পর্যন্ত এক কাগজে ছাপা হয়ে গেছে।

মেয়েটি ধরা পড়েছে। অভিযুক্ত অফিসার সুবীর চ্যাটার্জী। মেয়েটির নাম বকুল মিত্র। পূর্ববঙ্গের ভালো ঘরের উদ্‌বাস্তু। একটু কালোর ওপর যেমন স্বাস্থ্য তেমনি পটে আঁকা সুন্দর চেহারা। পরীক্ষা করে দেখা গেছে বকুল মিত্র সন্তান-সম্ভবা। জেরায় সে বাধ্য হয়ে কবুল করেছে, সুবীর চ্যাটার্জী বিবাহিত সে জানত না, এবং সে বিশ্বাস করেছিল সুবীর চ্যাটার্জীর মহৎ অন্তঃকরণ বলেই তার মতো অনাথা মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তাকে সময়ে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। সে জেনেছিল, বর্তমানে বিয়ে করার ব্যাপারে নানা-রকম অসুবিধে আছে। মোট কথা, বিশ্বাসের ভুলে হোক বা যে কারণেই হোক স্বেচ্ছাতেই সে ক্যাম্প থেকে উধাও হয়েছিল।···হ্যাঁ, শেলাইয়ের ওই ছোট দোকান সুবীর চ্যাটার্জীই তাকে করে দিয়েছেন, সে-জন্য তাঁর প্রতি সে কৃতজ্ঞ। সে কার সন্তান ধারণ করছে এই জেরার কোনো উত্তর দেয় নি, মুখ শেলাই করে ছিল।

বিচার সাপেক্ষে সুবু চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হয়ে গেল। এর কয়েক দিনের মধ্যে কাগজে আবার হৈ-চৈ ব্যাপার। সুবীর চ্যাটার্জীর স্ত্রী অঞ্জলি চ্যাটার্জী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। লিখে গেছে

তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। কিন্তু দায়ী নয় লিখে গেলেই সুবুর পক্ষে দায় থেকে খালাস পাওয়া সহজ নয়।···তার বিরুদ্ধে অমন একটা কেলেংকারির মামলা ঝুলছে। পুলিশের টানা-হেঁচড়া আর দুই বিচার পর্বে সে আধ-মরা হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত জেল খাটা থেকে মুক্তি অবশ্য পেল। বকুল বিচারে একই কথা বলে গেছে, সে স্বেচ্ছায় ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। আর অন্যজন লিখে গেছে তার আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয়। অতএব জেল খাটা থেকে অব্যাহতি।

কিন্তু চাকরিটা গেলই।

···এর পর এই বাংলায় এ-রকম ছেলেকে আর চাকরি কে দেবে? কলকাতার বাইরে কলেজে চাকরি পেতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সুবীর চ্যাটার্জী নামটা তখন স্ট্যাম্প-মারা হয়ে গেছে।

···এর পরেও সুবু বকুলকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। মা তাকেসুদ্ধ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বকুলও আর তাকে বিয়ে করে নি, কিন্তু আশ্রয় দিয়েছে। ওর ছেলে হয়েছে একটি। সেই ছেলের এখন তিন বছর বয়েস। ওইটুকু শেলাইয়ের দোকান থেকে কি-বা আয়। কে কাকে আশ্রয় দেয়। নাম ভাঁড়িয়ে টিউশানির রোজগারই সুবুর এখন একমাত্র সম্বল। কলকাতার শহরে ইকনমিক্সে এম. এ. পাশ ছেলে গোঁ ধরলে টিউশানিতেও খুব কম রোজগারই হবার কথা কম নয়। কলেজের ছাত্র পর্যন্ত পড়াতে পারে। কিন্তু টিউশানি বেশিদিন টেঁকে না। মাস্টার মদ খায় জানলে কোন্ গাডিয়ান বা ছাত্র তাকে রাখবে? ওর মদ খাওয়াটা একদিন না একদিন ধরা পড়েই যায়। এখন এমন হয়েছে যে দূরের এলাকায় টিউশানি খুঁজে নিতে হয়। তারও কোনোটা রাখতে পারে কোনোটা বা পারে না।

প্রায়ই এসে মায়ের কাছে হাত পাতে, ছেলের ওই হয়েছে, এই হয়েছে—টাকা দাও। না দিলে চিৎকার চেঁচামিচি। এই ভয়েই মা যা পারেন ত্থান। কিন্তু ছেলের মদের খরচ যোগানোর মতো টাকার সম্বল তাঁর কোথায়?

বাড়ি ফিরতেই কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, মা-কে টাকা দিতে পেরেছ?

অবধূত ছোট্ট জবাব দিলেন, অনেক কষ্টে।

৭

মাস আড়াই বাদে সকালের দিকে একদিন সুবীর চ্যাটার্জী কোন্নগরে এসে হাজির। মা-কে দেখে আর মায়ের মুখে দাদার অজস্র প্রশংসা শুনে তার একটু কৌতূহল হয় নি এমন নয়। মায়ের এতদিনের হাঁপানির রোগ প্রায় সেরে এসেছে। তাঁর মুখের রং ফিরেছে। সুবীর চ্যাটার্জীর কাছে এটাই একটু আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু তাঁর কোন্নগরে আসার কারণ আদৌ এই নয়। ···দেখা হলেই নমিতা দেবী এই ছেলেকে কোন্নগরে যাবার তাগিদ দ্যান। ধারণা শুধু নয়, তাঁর বিশ্বাস চাঁচুর এখন অনেক ক্ষমতা, অনেক শক্তি . হাজার হোক পেটের সন্তান, তাঁর আশা দাদার সাহচর্যে এসে এই ছেলের মনে যদি কিছু পরিবর্তন আসে।

সুবীর চ্যাটার্জীর কোন্নগরে আসা দাদার ক্ষমতা আর শক্তির কথা শুনে শুনে। লেখা-পড়া জানা মানুষ, এই জীবনের প্রতি যেন্না সময়-সময় কি তারও ধরে না? অদৃষ্ট বলে কিছু আছেই, নইলে তার এই দশা হলো কি করে? ওই অদৃষ্ট ফেরানোর ক্ষমতা যে তাঁর নেই, দেখতেই পাচ্ছে।··· কারো যদি থাকে একবার দেখে আসতে ক্ষতি কি? দেখতেই এসেছিলো।

এই দেখতে আসা থেকেই ঘটনার সাজে রং-বদল শুরু।

অবধূতের ঘরে তখন বেশ কয়েকজন লোক। বাঁশের গেটের সামনে তিন-তিনখানা চকচকে গাড়ি দাঁড়িয়ে। লোকগুলোকে দেখেও রীতিমতো অবস্থাপন্ন মনে হলো সুবীর চ্যাটার্জীর। কিন্তু দাদার সামনে বশংবদের মতো বসে আছে। ভাইকে দেখে অবধূত খুশিই হলেন। ডাকলেন, আয়, কলকাতা থেকে কোন্নগরে আসতে তোর তিন মাস লেগে গেল? মা বলেছিলেন তুই রাউরকেল্লা থেকে ফিরলেই এখানে পাঠিয়ে দেবেন।

তাঁকে নিয়ে ভিতরে এলেন।—কই গো, কে এলো ছাখো--

কল্যাণী ভিতরের দাওয়ায় ছোট পিঁড়ি পেতে বসে চালবাছছিলেন। প্রায় শুকনো চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। পরনে চওড়া লালপেড়ে মিহি শাড়ি,

গায়ে লাল রঙের ব্লাউজ। মাথায় সিঁদুর টিপ সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর রেখা। মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

প্রথম দেখার এই মুহূর্তটুকু শুভ ছিল কি? সুবীর চ্যাটার্জী স্থান-কাল ভুলে চেয়ে রইলো।...দাদার ঘরে এমন এক দিব্যাঙ্গনার অবস্থান যেন পৃথিবীর বহু আশ্চর্য ব্যাপারের সেরা কিছু। তার চোখে পলক পড়ে না। দৃষ্টির এমন বিমূঢ় তন্ময়তার ধাক্কায় কল্যাণীর সুন্দর ছুই ভুরুর মাঝে একটু ভাঁজ পড়ো-পড়ো হলো। এক হাতে আঁচলটা চুলের ওপর দিয়ে পিঠ বেড়িয়ে মাথায় তুললেন।...অবধূত সকৌতুকে লক্ষ্য করছেন। এই ভাইয়ের চরিত্রের আদ্যোপান্ত তিনি জানেন। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে সেটা মনে রাখার ব্যাপার মনে হলো না একবারও। কল্যাণীকে দেখে কেউ অবাক হলে এমনকি অভিভূত হলেও মজাই পান। আর কত শক্ত ঘাঁটি সেটা অনুভব করতে পারেন বলেই স্ত্রীকে নিয়ে মনে কোনোরকম ছুশ্চিন্তা কখনো রেখাপাতও করে না।

—কি রে একেবারে হাঁ হয়ে গেলি যে।...প্রথম দেখে একটা প্রণামও করলি না! শেষের খোঁচাটুকু ইচ্ছে করেই দিলেন, নইলে হাওড়া স্টেশনে ষোল বছর বাদে যোগাযোগ সত্ত্বেও সেদিন প্রণাম এই ভাই তাঁকে করে নি বা আজও করে নি এটা মনে আছে।

সুবীরের বিমূঢ় দৃষ্টি এবারে তাঁর দিকে ঘুরল।—এ কে? তোমার বউ নাকি?

—কেন, তোর সন্দেহ হচ্ছে? · আমার বউ হলে তোর কে হয়?

কল্যাণী চালসুদ্ধ কুলোটা নিয়ে আস্তে আস্তে উঠলেন। ঈষৎ গম্ভীর। ঘরের দিকে এগোলেন। বাধা পড়ল, অবধূত বললেন, কি হলো, আমার ছোট ভাই সুবু বুঝতে পারছ না?

—বুঝছি। সোজা ছোট ভাইয়ের দিকেই তাকালেন। আয়ত ছু'চোখে চোখ পড়তে সুবীর আবার বিহ্বল। আঙুল তুলে সামনের ঘরটা দেখিয়ে কল্যাণী বললেন, আপনি ও-ঘরে গিয়ে বসুন, আমি আসছি। স্বামীর দিকে তাকালেন, তোমার ঘরে কত লোক, দেরি হবে?

—তা আরো আধ-ঘণ্টা খানেক তো বটেই, তুমি ওকে চা-টা দাও, আমি

যত তাড়াতাড়ি পারি আসছি।

চলে গেলেন। কল্যাণী পুজোর ঘরে ঢুকতে গিয়েও আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। সোজা আবার চোখে চোখ। বিহ্বল, স্থান-কাল বিস্মৃত এখনো। কল্যাণীর ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসির আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। ভিতরে ঢুকে গেলেন। অবধূত এই ভাইয়ের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তাঁকে কিছুই বলেন-নি। কিন্তু মানুষটাকে দেখে তিনি খুশি হতে পারেন নি।

মিনিট কুড়ির মধ্যে ট্রে-তে পেয়ালা চায়ের পট আর ডিশে জল-খাবার সাজিয়ে নিজেই নিয়ে এলেন। সুবীর চ্যাটার্জী বসে নি। বসতে পারে নি। ঘরে পায়চারি করেছে, আর এক-একবার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এবারে ব্যস্ত হয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলো।

টেবিলে জল-খাবার রাখতে রাখতে কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, মা কেমন আছেন?

—ভালো। চোখ ফেরানো সম্ভব হচ্ছে না। হেসে আত্মস্থ বা সহজ হবার চেষ্টা। —দাদার হাত যশ আছে, এতদিনের পুরনো অসুখ অনেকটাই সেরে গেছে।

—দেখবেন, ওষুধ যেন বন্ধ না হয়। দেওরটি যে তার মায়ের কাছে থাকেও না, কল্যাণীর এ-খবরও জানা নেই। এম. এ. পাশ, ভালো চাকরিটা অদৃষ্টের দোষে গেছে—কেবল এটুকুই শুনেছিলেন।

সুবীর চ্যাটার্জী খেতে শুরু করেছে। ভালো খাওয়াই তেমন জোটে না, মুখ-রোচক জল-খাবার কাকে বলে তা প্রায় ভুলতে বসেছে। কিন্তু এরই মধ্যে চোখের জরিপের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ফাঁকে ফাঁকে সহজ এবং অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা। মুখে কৃত্রিম হাসি।—তোমাকে দেখে আমার তাক্ লেগে গেছে, দাদার ঘরে এমন একটি বউ আছে জানলে আমি ঢের আগেই আসতাম।

তুমি বলাটা কানে লাগল। যদিও দু'দিক থেকেই তাই বলাটা স্বাভাবিক। কল্যাণী আলতো চোখে তাকালেন।—এমন বলতে?

হাসি। চায়ের কাপে চুমুক দেবার ফাঁকে দু'চোখ আবার বুক হয়ে মুখের ওপর। —এমন বলতে কি তুমি জানো না—আয়নায় নিজেকে দেখো না?

নিলপ্ত জবাব।—আমার আয়না তো আপনার দাদা ··।

···সুঠাম স্বাস্থ্য নিটোল যৌবন অনন্যরূপা হলেও ছেলেমানুষ তো বটেই, কিন্তু কথাবার্তা হাব-ভাব চাউনি বেশ পাকা মনে হলো সুধীরের আর সেই জন্যেই আরো ভালো লাগছে। কি মনে হতে প্রশ্নটা মনে এসেই গেল, আচ্ছা দাদা তো চিকিৎসা করে জানি, কিন্তু সে কি তন্ত্র-সাধক ?

কল্যাণী লক্ষ্য করেছেন, অতবড় দাদাও এই লোকের কাছে সে-রকম সম্মানের পাত্র নয়—চিকিৎসা করেন না বলে 'করে' বলা হলো, আর তিনি বা উনির বদলে 'সে'। জবাব দিলেন, লোকে তো তাই বলে।

—লোকে বলে মানে···তুমি জানো না ?

—আমাদের জানা-জানিটা কেবল আমাদের মধ্যেই।

কেন·· ?

হ্যাঁ, বেশ পাকা, আর সেই কারণে আরো লোভনীয়—এই জন্যে যে আমি জানতাম তান্ত্রিকদের সাধারণত ভৈরবী থাকে···তুমি দাদার বউ না আসলে ভৈরবী ?

ফিরে আলতো প্রশ্ন।—কোন্‌টা হলে আপনার পছন্দ হয় ?

নাঃ, এই মেয়ের কথাবার্তা রূপের থেকে কম কিছু নয়। শোনার জন্য কান দুটোও মাতোয়ারা হতে চায়। জোরে হেসে আরো সহজ আরো অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা।—আমারপছন্দ অনুযায়ী তো কিছু হয় নি, জবাবটাই দাও না ?

—মা অগ্নিসাক্ষী রেখে আর সাতপাক ঘুরিয়ে সম্প্রদান করেছেন, তার নাম বিয়ে কিনা আপনার দাদাকেই জিজ্ঞেস করবেন। একটু রসিকতাও করে বললেন, আমাকে ভৈরবী হিসেবে গ্রহণ করেছেন কি বউ হিসেবে তিনিই জানেন।

—ও···বিয়েই তাহলে। কতদিন আগে তোমাদের বিয়ে হয়েছে ?

—বছর আষ্টেক।

এবারে সত্যিই অবাক।—আট বছর! তাহলে এখন তোমার বয়েস কত ?

—কত মনে হয় ?

—বড়জোর কুড়ি···

কল্যাণীর বিনীত চাউনি।—আর একটু কমানো যায় না?

সুবীর চ্যাটার্জীর দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর থমকে রইলো খানিক। তারপর গলার স্বরে উষ্মাই ঝরল।—দাদা তান্ত্রিক হোক বা যা-ই হোক পাষণ্ডের কাজ করেছে বলতে হবে—আট বছর আগে সে তোমার মতো একটি না-বালিকাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছে! আর তোমার মা সেই বিয়ে দিয়ে নিজের মেয়ের এমন সর্বনাশ করলেন?

কল্যাণীর দু'চোখ বড় বড়।—সর্বনাশ বলতে?

সর্বনাশ নয়! দাদার বয়েস কত এখন জানো?

···কল্যাণীর মুখ দেখে মনে হবে দাদার বয়েস আঁচ করতে চেষ্টা করছেন। না পেরে বললেন, তান্ত্রিকদের বয়েস আন্দাজ করা শক্ত শুনেছি···কত, সাতচল্লিশ আটচল্লিশ? অত না হোক আটত্রিশ তো হবেই—আমার থেকেও কম করে—

থমকাতে হলো আবার।—আমার সঙ্গে তুমি কি সেই থেকে ঠাট্টা করে যাচ্ছ?

কল্যাণী থতমত খেলেন যেন। —ছি, ছি, আপনি কি ঠাট্টার পাত্র।

অবধূত ঘরে ঢুকলেন।—কি রে চা-টা খাওয়া হয়েছে? স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তেই ভ্রূ কোঁচকালেন একটু। এই মুখ তিনি খুব ভালোই চেনেন। হাসি চাপার চেষ্টায় মুখে রক্ত উঠছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি কথা হচ্ছিল?

—উনি বলছিলেন তুমি একটি পাষণ্ড, আট বছর আগে একটি না-বালিকাকে বিয়ে করে এনে তার সর্বনাশ করেছ।

ছদ্ম-বিরক্তি আর গাম্ভীর্যে অবধূতের মুখখানা ভরাট। স্ত্রীকেই বললেন, এ-সব আলোচনার মধ্যে তোমাকে থাকতে বারণ করেছি না? এখনো যদি কেউ চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রেন্ট অ্যাক্টে ফেলে কোর্টে কেস ঠুকে দেয় —পার পাবো? যাক, সুবু এলো, মাছ মাংস তো কিছু ঘরে নেই বোধহয় —বাজারে যেতে হবে না?

কল্যাণী জবাব দিলেন, ওঁর আর খাওয়ার মেজাজ আছে কিনা কে জানে —বাজারে যেতে হলে এক্ষুনি চলে যাও, এরপর কখন রান্না হবে কখন

খাওয়া হবে—একটা রিক্সা ধরতে পারো কিনা দ্যাখো—

অবধূত লাল জামার পকেটে হাত দিয়ে টাকা বার করলেন। ছ'খানা একশ টাকার নোট। একটা নোট আবার পকেটে রেখে বাকি ক'টা কল্যাণীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন, এগুলো রাখো—

ভাইকে বললেন, যাবি নাকি আমার সঙ্গে?

দাদার রোজগার কত, ভাইয়ের পক্ষে তা-ও আঁচ করা শক্ত হলো।—তুমিই যাও, আমি বসে এর সঙ্গে একটু গল্প করি।

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী বলে উঠলেন, আমার এখন গল্প করার সময় নেই, সব কাজ পড়ে আছে—তার থেকে সঙ্গে গিয়ে পছন্দ মতো বাজার করে আসুন—মেঘলা দিন আছে, মাথাও ঠাণ্ডা হবে।

দু'ভাই বেরুলেন। বেশ খানিকটা হাঁটলে তবে রিক্সা পাওয়া যেতে পারে। সুবীর চ্যাটার্জী একটু ধাঁধার মধ্যে পড়েছে। মানুষটা আর যা-ই হোক বোকা নয়।...যত রূপসীই হোক, ওই বয়সের মেয়ের কথাবার্তা অমন পাকা-পোক্ত আর সরস ইঙ্গিতবহ হয় কি করে ভেবে পাচ্ছে না। ভাবার ধৈর্য কম। ঝপ করে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা দাদা, ওর বয়েস ঠিক-ঠিক কত বলো তো?

—ওর মানে কার?

—তোমার বউয়ের?

—বয়েস যা-ই হোক, আমার বউকে তোর বউদি বলতে অসুবিধে হচ্ছে?

—হচ্ছে। পুরনো দিন আর নেই, বয়সে ছোট বা সমান-সমান হলেও আজকাল যে যার নাম ধরেই ডাকে—

—ও...তাই ডাকিস।

—বয়েস কত বললে না?

—যদি বলি প্রায় আঠাশ...বিশ্বাস হবে?

—একেবারে না।

—তাহলে তোর যা খুশি তাই ভেবে নে, আরো বছর দশেক বাদে যদি একই রকম দেখিস তখন হয়তো বিশ্বাস হবে।

রিক্সায় যেতে যেতে অবধূত ভাইয়ের মুখ চোখ কপাল ভালো করে লক্ষ্য

করেছেন। ভাগ্যের ছিটে ফোঁটাও দেখছেন না। বুদ্ধিভ্রংশ মানুষ যেমন এক বগ্‌গা ছোটে, এও তেমনি দ্রুত অধোপথে ধেয়ে চলেছে। ভাই না হয়ে আর কেউ হলে বিরক্তই হতেন।…মা বলেছিলেন, এই ভাইয়ের যদি মতি ফেরাতে পারিস এই পৃথিবীতে আমি আর কিছু চাই না। অনেক দুঃখে কোনো মা নিজের ছেলের সম্পর্কে এ-রকম বলে।

জিজ্ঞেস করলেন, বাইরে যদি চাকরি বাকরি ঠিক করতে পারি যাবি তো?

—বাইরে মানে কত বাইরে?

—এই ধর ইউ. পি-তে?

—নাঃ, অত দূরে পোষাবে না।

—চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে তো রাউরকেল্লা ছুটেছিলি?

—তখন মাথায় একটা ঝোঁক চেপেছিল, পরে মনে হয়েছে হয় নি ভালোই হয়েছে।

অবধূত ব্যাপারটা অন্য ভাবে বিবেচনা করলেন।…ষোল বছর বাদে দেখা হওয়ার যোগ ছিল, এর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে। তাই ভাই ছুটেছিল রাউর-কেল্লা ইণ্টারভিউ দিতে আর তিনি পুরী যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়ে-ছিলেন। দেখা হওয়ার যোগটাই শুধু কার্য কারণ সম্পর্ক। এই যোগের ওপর দুজনের কারোরই কোনো হাত ছিল না। অবধূতের কেন যেন মনে হলো এই যোগটা শুভ নয়।

…এক দিনের জায়গায় বিনা অনুরোধে সুবীর চ্যাটার্জী তিন দিন থেকে গেল। খাওয়া-দাওয়া ব্যবস্থা ভালো। আরো ভালো দাদার মদের বোতল। আলমারিতে ওই বোতল দেখেই দুচোখ চকচক করে উঠেছিল। আর অবধূত ভেবেছেন, সময়ে কাচের আলমারি থেকে বোতল ক'টা সরিয়ে রাখা উচিত ছিল। অনুমতি দিতে হয় নি, সন্ধ্যা পার হতেই বোতল নামিয়ে বসতে দেখেছেন।…চাকরি যাবার পর থেকে এত ভালো জিনিস সুবীর চ্যাটার্জী আর চোখেও দেখে নি। গেলাস এনে কাঁচাই শুরু করেছে। অবধূত কল্যাণীকে ডেকে বলেছেন একটা জলের জাগ আর কিছু খাবার এনে দাও, লিভার পচে মরবে দেখছি।

—হাতের কাছে একটা গেলাসই পেলাম, আর একটা গেলাসও আনতে বলো···তোমারও চলবে তো ? ভাইয়ের সদয় মুখ।

—নাঃ তোর সঙ্গে চলবে না। অবধূতের ঠাণ্ডা জবাব এবং প্রস্থান।

···সব থেকে ভালো দাদার এই বউ। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। দেখার তৃষ্ণা আরো বাড়ে। এটা ওটা চাওয়ার হলে বার বার তাকে ঘরে আনার চেষ্টা। প্রথম সন্ধ্যায় জলের জাগ রেখে যাবার খানিক বাদে ডিশে গরম মাংসের বড়া দেখে দারুণ খুশি।—বাঃ, দাদাকে তো দারুণ রসেবশে রেখেছ দেখছি—এ জিনিস (হাতের গেলাস দেখিয়ে) তোমারও চলে ?

—এখন পর্যন্ত চলে না।

—তন্ত্র পথে সুরা তো সাধনার অঙ্গ, তাহলে আমার সঙ্গেই হাতেখড়ি হোক না ?

—হাতে খড়ির সাধ থাকলে আপনার সঙ্গে কেন, তান্ত্রিকের সঙ্গেই হবে। তিন দিনে দাদার কাজ-কর্মের ধারা যতটা সম্ভব লক্ষ্য করেছে। তাঁর চিকিৎসার দিকটা মানতে রাজি কিন্তু আর যে কারণে লোকের আনা-গোনা দেখছে তার সবটাই ভাঁওতাবাজী মনে হয়েছে। এই ভাঁওতাবাজীর জোরেই হয়তো এমন বউ ঘরে আনা সম্ভব হয়েছে। ভাগ্য বটে লোকটার। হিংসেয় বুকের ভিতরটা চিনচিন করে জ্বলে। লুব্ধ দুচোখ বার বার অন্দর মহলে চক্কর দেয়। বেশিক্ষণ না দেখলে কোনো দরকারের অছিলায় সামনে এসে দাঁড়াতেই হয়।

—এক কাপ চা হবে ?

কল্যাণী উল্টো-মুখে বসে কুটনো কুটছেন। হবে, ঘরে গিয়ে বসুন, হারুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—হারু কে ?

—কাজের লোক। সংক্ষিপ্ত জবাব।

ওদিক ফিরে বসা বলেই লুব্ধ চোখের অবাধ্য হতে আরো সুবিধে। কিন্তু তারও তো মেয়াদ আছে।—তুমি নিজেই নিয়ে এসো না, সেই থেকে মুখ বুজে বসে আছি··· এত কি কাজ, কারো তো আর অফিসের তাড়া নেই !

কল্যাণী আস্তে আস্তে ঘুরে তাকিয়েছেন।—আচ্ছা, নিয়ে আসছি···

চায়ের পেয়ালা হাতে মিনিট দশেক বাদে ঘরে ঢুকেছেন। খুশি মুখে সেটা নিতে গিয়ে আঙুলে আঙুল ঠেকেছে।

—থ্যাংক ইউ. বসো···

বাধ্য মেয়ের মতো কল্যাণী বসেছেন।

পেয়ালায় চুমুক দিয়েই উচ্ছ্বাস।—বাঃ, ওয়াণ্ডার ফুল। সকালের থেকেও ভালো হয়েছে।

—সকালে পাশে আপনার দাদা ছিলেন তো, তাই অত ভালো লাগে-নি।

হেসে উঠতে গিয়ে বিষম খেতে হয়েছে, পেয়ালার চা-ও একটু চলকে পড়েছে।—দেওরের সঙ্গে এ-রকম করেই কথা বলা দরকার, বুঝলে? ···আচ্ছা, কাল এসেই আমি দিব্ব 'তুমি' চালিয়ে দিলাম, কিন্তু তুমি সেই থেকে আমাকে আপনি-আপনি করে পর করে রাখছ কেন?

নিরীহ গোছের আয়ত দুচোখ সোজা মুখের ওপর।—আপনার বিবেচনায় আমি তো একেবারে ছেলেমানুষ।

চেহারায় না হোক, হাব-ভাব কথাবার্তায় অন্তত ছেলেমানুষ ভাবা যাচ্ছে না। ইঙ্গিতটা রমণীর মতোই সুপরিণত সুডৌল লাগছে। সরল গোছের হাসি-ছোঁয়া চাউনির গভীরেও সরস কিছু চিকচিক করে উঠছে। সুবীর চ্যাটার্জীর শরবিদ্ধ দশা। হঠাৎই কিছু মনে পড়ল যেন।—ভালো কথা, দাদাকে কাল তোমার বয়েস জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল, প্রায় আঠাশ, আমার তো বিশ্বাসই হয় না—সত্যি নাকি?

—বললেন বুঝি? উঠে দাঁড়ালেন, সত্যি কিনা আপনি তাই নিয়ে গবেষণা করুন, আমি হাতের কাজ সারি।

—শোনো শোনো! সম্ভব হলে হাত ধরে আটকানোর তাগিদ।—গবেষণা করতে হলে তোমাকেও তো সামনে বসে থাকতে হয়—

দু'পা গিয়েও আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন। ঠোঁটে হাসি, চোখেও, কিন্তু কথাগুলো তির্যক-গম্ভীর।—বড় ভাইয়ের বউয়ের বয়েস দিয়ে কি হবে? আশীর্বাদ করি লক্ষ্মণের মতো পায়ের দিকে চেয়ে থাকার মতি হোক।

সুবীর চ্যাটার্জী আরো শরাহত। আরো পরিতুষ্ট। তিন রাত বাদে চলে

যাবার পর অবধূত ঘুরে ফিরে বার কয়েক কল্যাণীর নির্লিপ্ত মুখখানা লক্ষ্য করেছেন আর মিটিমিটি হেসেছেন। শেষে জিজ্ঞেস করেছেন, কি-রকম বুঝলে? ভায়ার তোমাকে খুব মনে ধরেছে?

কল্যাণী তেমনি জবাব দিলেন, মনে হয়।

অবধূত তখন এই ভাই সম্বন্ধে যা জানতেন সবই বললেন। বিমাতার আকূতির কথাও জানালেন, বলেছিলেন এই ভাইয়ের যদি মতি ফেরাতে পারিস এই পৃথিবীতে আমি আর কিছুই চাই না। একটু থেমে তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন, কি করা যায় বলো তো?

—কিছু করার আছে মনে হয় না, মাথা একটু বেশিই বিগড়ে গেছে, সহজেই বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারেন—যাবার আগে বলে গেছেন কয়েক দিন আনন্দে কাটানোর মতো তাঁর একটা জায়গা হলো।

—তার মানে আবার আসবে?

—মানে তো তাই দাঁড়ায়।

অবধূত সকৌতুকে নিরীক্ষণ করলেন একটু।—তুমি যেন একটু ঘাবড়েছ মনে হয়?

—হুঁঃ! এক শব্দে নস্যাৎ করে দিয়ে চলে গেলেন।

স্ত্রীর এমন জোরের উৎসের হদিস আজও পান নি। কতবার তো তাঁকে একলা ফেলে রেখে এ-দিক ও-দিকে চলে গেছেন, অনেক সময় নিজেই একটু-আধটু উতলা হয়েছেন, দিনকাল ভালো নয়···রূপের তৃষ্ণায় মানুষ যত পাগল হয় ততো বোধহয় আর কিছুতে নয়। কিন্তু ফিরে এসে মনে হয়েছে তিনি নিরর্থক ভেবেছেন। তিনি থাকুন বা না থাকুন স্ত্রীটি যে সর্বদাই এক নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে বসে আছেন।

বিমাতা নমিতা দেবীও একবার কোন্নগরে এলেন। অবধূতই নিজে কলকাতা গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছেন। চাঁদুর বউ দেখে তিনি আনন্দে আটখানা। বউয়ের বয়স নিয়ে তিনিও ধাঁধাঁয় পড়েছিলেন। কল্যাণী সানন্দে তাঁর সেবা-যত্ন করেছেন। এখানে দিন-কয়েক থেকে তাঁর আশা বেড়েছে আর বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে, এই শক্তিমান তান্ত্রিক ছেলে মন করলে তাঁর নিজের ওই অপদার্থ ছেলের মতি ফেরাতে পারে। অবধূতের হাত ধরে আবার তাঁকে

সেই একই অনুরোধ করেছেন।

...কিন্তু এই মা-ই যখন শুনলেন সুবু এখানে এসে তিন রাত থেকে গেছে, তাঁর ভিতরে অস্বাচ্ছন্দ্যের একটা ত্রস্ত আঁচড় পড়েছে। তক্ষুনি মনে হয়েছে ওই ছেলের তিনদিন থেকে যাওয়ার মতো আকর্ষণ এখানে আছে। মুখ কালো করে বলেছেন, পেটের ছেলে, কি আর বলব অত প্রশ্রয় দিবি না, কিছু যদি করতে পারিস আসা-যাওয়া করুক—এখানে থাকার দরকার কি!

অবধূত হেসে বলেছেন, ছোট ভাই থাকতে চাইলে না বলব কি করে, বাড়ি তো আমার খুব ছোট কিছু নয়, থাকলে অসুবিধের কি আছে।

অসুবিধে কি সেটা নমিতা দেবী আর মুখ ফুটে বলতে পারেন নি।

এক এক করে আরো চারটে বছর পার হয়েছে। বৈমাত্রেয় ছোট ভাই সুবু মূর্তিমান উপদ্রবের মতোই হয়ে উঠেছে। প্রতি মাসেই একবার করে আসে। দুদিন তিনদিন পাঁচদিনও থেকে যায়। দিনে দুপুরেও মদের বোতল নামিয়ে বসে। আলমারিতে চাবি লাগানো থাকলে সোজা এসে দাদার কাছে চেয়ে নেয়। অবধূত একবার কাচের আলমারি থেকে বোতল সরিয়ে স্টিলের আলমারিতে রাখতে চেয়েছিলেন। কল্যাণী আপত্তি করেছেন, সরাবে কেন, ভাইকে মুখের ওপর বলে দাও এখানে এ-সব চলবে না।

—আমার চলে যখন ওকে ও-কথা বলি কি করে?

—তাহলে ওগুলো ওখানেই থাকবে।

ভাইকে কবিরাজি চিকিৎসা শেখাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বছরচারেক মন ঢেলে শিখলে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবি, চাকরির ধান্দায় কারো কাছে ঘুরতে হবে না। অত লেখাপড়া শিখেছিস পারবি না কেন? প্রস্তাব সরাসরি নাকচ। ভাইয়ের সাদা-সাপটা জবাব, অত লেখা-পড়া শিখেছি বলেই পারব না। কবিরাজি শিখে শেষে আমি কবিরাজ হয়ে বসব তুমি এটা ভাবলে কি করে? তাছাড়া টিউশানিগুলো গেলে চার বছর আমার চলবে কি করে?

—চলার ব্যবস্থা আমি করতে পারতাম, কিন্তু তোর আঁতে লাগছে যখন

সে আলোচনায় গিয়ে আর লাভ কি···।

একবার দেখা গেল ভাইয়ের অন্য ব্যাপারে বরং আগ্রহ একটু বেশি। জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা দাদা, তান্ত্রিকরা সত্যি খুব শক্তিশালী হয় ?

—সত্যিকারের তান্ত্রিক মানেই শক্তিশালী।

—তুমি সত্যিকারের তান্ত্রিক নও ?

—আমি তন্ত্রের ত-ও জানি না।

—সে-রকম শক্তিশালী তান্ত্রিক তুমি দেখেছ ?

—দেখেছি।

—আমাকে দেখাতে পারো ?

—তোর ভাগ্যে থাকলে দেখবি, ইচ্ছে করলেই তাঁদের দেখা মেলে না।

একটু চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করেছে, আচ্ছা সম্মোহন, বশীকরণ —এ-সব ব্যাপারগুলো কি ?

নিজের অগোচরে চোখ তার মুখের ওপর একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল।—আমি জানি না।

—এ-সব তন্ত্রসাধনার মধ্যে পড়ে না ?

—কোনো সাধকই এ-সব নিচুস্তরের জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে না।··· কেন, তোর এ-সব শেখার ইচ্ছে হয়েছে ?

হাসতে লাগল।—তুমি তন্ত্রের কিছু জানো না বলছ কিন্তু তোমারই যা দাপট দেখছি, ও-সব ছোট-খাট ব্যাপারগুলো জানলে তো আরো ঢের বেশি মওকা পেতে।

কল্যাণীর কাছ থেকেও কিছু জ্ঞান-লাভের বাসনা হয়েছিল। যেমন বীরাচার সাধনার ব্যাপারখানা কি, তান্ত্রিকেরা ভৈরবী নিয়ে উপসনা করে কেন, এদের সঙ্গে যারা বৈষ্ণবী নিয়ে উপাসনা করে তাদের তফাৎ কি। কল্যাণীর স্পষ্ট জবাবে উৎসাহ জল।—ও-সব জানতে হলে আপনার দাদার কাছে যান, আমি ভাত ডাল সুক্তো মাছ মাংস পোলাও পর্যন্ত জানি···।

অবধূত বিরক্ত হন, আবর কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে বেশ মজাও পান। প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে এ ভাই ক্রমে স্নায়ুর ওপর চেপে বসছে এটুকু প্রকাশ করতেও আপত্তি। নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ।···ওই ভাই জেনেছে দাদা শনি

মঙ্গলবারে শ্মশানে কাটায়। যখন আসে এবং থাকে শনি বা মঙ্গলবার একটা পড়েই। এমনি এক শনিবারে অবধূত নিজেই প্রস্তাব করেছিলেন, আজ আর শ্মশানে না গেলাম, থাক—

কল্যাণী প্রায় ঝলসে উঠলেন, কেন যাবে না? ওর সাধ্য কি—কি করবে?

আরো মাস তিনেক বাদে সকালে শ্মশান থেকে ফিরে দেখেন স্ত্রীটি খুব গম্ভীর। আগের বিকেলে ভাই এসেছে। অবধূত নিজে থেকে কিছু বললেন না। কল্যাণীও দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ হবার আগে পর্যন্ত নির্বাক। দুপুরে ঘরে এসেই বললেন, দ্যাখো, তোমাকে একটা কথা না বললেই নয়, তোমার ভাইকে এখনো যদি ভালো মতো সমঝে না দাও মুশকিলে পড়বে, দিনে-দিনে সে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

অবধূত উদ্‌গ্রীব, কেন কাল রাতে সে কিছু করেছে নাকি? তুমি ভয় পেয়েছে।

কল্যাণী ফুঁসেই উঠলেন, কি? ভয়? আমি? ওকে?…হ্যাঁ, ভয় আমি পাচ্ছি সেটা ওর জন্যে—ও তোমার ভাই বলে—বুঝলে? সময় থাকতে ওকে দূরে সরতে বলো!

না, কল্যাণীর এই মূর্তি অবধূত বিয়ের বারো বছরের মধ্যে দেখেন নি। পরে জেরা করেও তাঁর মুখ থেকে আর কোনো কথা বার করতে পারলেন না।

…এরপর কে তাঁকে যন্ত্রণা দিল, কার ইঙ্গিতে এমন এক অস্বাভাবিক পদ-ক্ষেপ, নিজেই জানেন না। কল্যাণীর এমন শক্তির উৎস যে তাঁকেই বার বার মনে পড়তে লাগল। গুরু কংকালমালী ভৈরবকে। একটা আশ্চর্য রকম আকর্ষণ বোধ করতে লাগলেন তিনি। জীবনে এই গোছের অনু-ভূতিগুলোই বোধহয় অলৌকিক ব্যাপার, যার কোনো ব্যাখ্যা নেই যুক্তি নেই।

তক্ষুনি ঠিক করলেন কালই তিনি বক্রেশ্বর যাবেন, মহা-ভৈরব গুরুর থানে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে হলো, তিনি গেলে কি হবে? সুবু শোধরাবে কি করে? ভাবতে লাগলেন।

সন্ধ্যার পর ভাই মদ নিয়ে বসেছে। কল্যাণীর আজও আতিথেয়তায় ত্রুটি

নেই। ভাজা ভুজি নিজে রেখে গেছেন কি হারুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন জানেন না। দাদাকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাই দরাজ অভ্যর্থনা জানালো।—এসো, চলবে নাকি ?

অবধূত এগিয়ে এসে বসলেন। এই প্রথম বললেন, চলতে পারে—তুই তো এরই মধ্যে ছ'আনা ফাঁক করে এনেছিস দেখছি···

শব্দ করে হাসল একটু, তারপর জোর হাঁক দিল, কল্যাণী! দাদার জন্য একটা গেলাস—!

অবধূত বললেন, বউদিকে তুই নাম ধরে ডাকা শুরু করে দিয়েছিস ?

—হোয়াট নট্ ? সি ইজ থ্রি ইয়ারস্ ইয়ংগার দ্যান মি, আই অ্যাম থার্টি ফাইভ সি ইজ থারটি ট্যু···ছো ষ্টিল্ লুকস্ টুয়েন্টি—উই ওয়ান্ট টু বি গুড ফ্রেণ্ডস—আমি তাকে আমার নাম ধরে ডাকার পারমিশান দিয়ে দিয়েছি। দরাজ হাসি। ইউ আর এ লাকি ওল্ড ম্যান দাদা, ইউ আর দি ট্রেজারার অফ এ জেম অফ এ ওয়াইফ।

গেলাস হাতে কল্যাণী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শেষটুকু শুনলেন। ভিতরে এসে গেলাস টেবিলে রেখে চলে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেওরের জোরালো বাধা, ও-কি চলে যাচ্ছে কেন ? সামনেই দাদা বসে আজ আর লজ্জা কি ? কল্যাণী ঘুরে দাঁড়ালেন।

—প্লীজ, একটু বসে যাও।

চলে গেলেন। অবধূত দেখছেন। ভাইয়ের দুচোখে মত্ত বাসনা গলগল করে ঠিকরে বেরুচ্ছে।

নিঃশব্দে নিজের গেলাস তুলে নিলেন তিনি। কল্যাণী এলো না সেই খেদেই যেন প্রেয় আধ-গেলাস তরল পদার্থ এক চুমুকে জঠরে চালান করে বড় মাপের আর একটা ঢেলে নিল। এরও আধা-আধি শেষ হতে অবধূত বললেন কাল ভোরে আমি এক জায়গায় যাচ্ছি, তুইও যাবি ?

—হেল্! এ জায়গা ছেড়ে আমি আর কোথাও যেতে চাই না···বাট হোয়্যার ?

—বক্রেশ্বরে।

—সেটা আবার কোথায়—সেখানে কি ?

—তুই একবার একজন শক্তিমান তান্ত্রিকের খোঁজ করছিলি—সেখানে তিনি।

এ-কথায় সুবুকে নড়েচড়ে বসতে দেখলেন। মনোযোগ দেবার জন্য নিজের মাথাটা বার দুই জোরে ঝাঁকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, সেখানে তিনি আছেন?

—আছেন।

—খুব শক্তিমান?

—খুব।

—যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন?

—ইচ্ছে করলে পারেন।

—লোক ভালো?

—দয়ার অবতার।

—যাব, নিশ্চয়ই যাব—কিন্তু তোমার সামনে আমি তাঁকে কিছু বলতে পারব না। আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়ে তুমি সরে যাবে।

—তাই যাব।

আবার সংশয়।—কিন্তু তিনি যে শক্তিমান তার প্রমাণ তুমি নিজে পেয়েছ?

—পেয়েছি।

—কি প্রমাণ?

—কল্যাণীকে সেখানেই প্রথম দেখেছিলাম। মনে-প্রাণে তাঁকে চেয়েছিলাম। তাঁর দয়াতেই পেয়েছি।

ভাইয়ের চোখে আবার লোভের ফোয়ারা দেখলেন অবধূত।

পরদিন সকালের গাড়িতে দুজনে রামপুরহাট এলেন। সেখান থেকে সোজা বক্রেশ্বরে। যশোদাকান্তকে ধরে অবধূত যা বলার বলে রাখলেন। আর ভাইকে আগেই জানিয়েছেন রাতের আগে তান্ত্রিক বাবার দেখা মেলে না। হোটেল-ঘরে বসে সন্ধ্যার মুখে দুজনে মিলে খানিকটা মদও খেয়েছেন। ভাই একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তান্ত্রিক বাবার কাছে মদ খেয়েও যাওয়া চলে?

—সব চলে।

রাতের খাওয়া সারা হতে বললেন, চল্ এবারে।

অনেকটা পথ গিয়ে ভাই থমকে দাঁড়ালো। অনেকদূরে একটা চিতা জ্বলছে।

এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে ?

—শ্মশানে। কোনো ভয় নেই, চল্।

সুবু দাদার গা ঘেঁষে এগোতে লাগল। তার গলাটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে।

যশোদাকান্ত ঘরের প্রদীপ জ্বেলে ধুপ ধুনো দিয়ে অপেক্ষা করছিল। অবধূতের আদেশ পেয়ে চলে গেল।

ভাইকে নিয়ে কংকালমালী ভৈরবের ঘরে ঢুকলেন। কংকালমালী ভৈরবের ছবির মূর্তি দেখেই সুবু সভয়ে থমকে দাঁড়ালো। পাশের ভৈরবীর ছবি অবশ্য সুন্দর মিষ্টি। কিন্তু তাঁদের মাথার ওপর মা-কালীর ছবিখানা আবার ভয়াবহ মনে হলো তার। যেন সদ্য টাটকা রক্ত খাওয়া মুখ।

অবধূত প্রণাম সেরে ভৈরবগুরুকে দেখিয়ে বললে, ইনিই সেই শক্তিমান মহাতান্ত্রিক।

—কিন্তু এ তো ছবি !

—তাহলেও জাগ্রত ! রাতে তুই ওই পাটিটা পেতে এ-ঘরে থাকবি। যা চাস একমনে প্রার্থনা করবি।

—কিন্তু দেখে তো মনে হয় ইনি প্রচণ্ড রাগী !

—প্রচণ্ড। আবার তুষ্ট হলে তেমনি দয়ালু।

ভাইয়ের কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসছে।—আমরা দুজনেই এ-ঘরে থাকি না দাদা—

—না। কঠিন গলায় অবধূত বললেন, তাতে কোনো ফল হবে না, বরং ক্ষতি হবে।

এ কি করছেন, কেন করছেন অবধূত নিজেও জানেন না। যা মনে হচ্ছে করে চলেছেন, বলে চলেছেন।

তিনি বাইরে শুয়ে। সুবু ভিতরে। ওর ছটফটানি বাইরে অনুভব করতে পারছেন। এক-একবার গলা পাচ্ছেন, দাদা ঘুমোলে···?

—কথা নয়, একমনে প্রার্থনা কর।

স্তব্ধ পরিবেশ। থেকে থেকে শেয়াল ডেকে উঠছে।

—দাদা ঘুমোলে?

অবধূত আর সাড়া ছান নি।

রাত একটা। এই শ্মশানের রাত একটার চেহারা অন্যরকম। আর ছট-ফটানি টের পাচ্ছেন না। ডাকছেও না। অবধূত উঠে বসে ঝুঁকে দেখলেন। ঘুমিয়ে পড়েছে।

তিনিও বাইরের পাটিতে গা এলিয়ে দিলেন। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। তাঁর ধারণা কিছু ঘটবে বলেই কেউ তাঁকে এখানে টেনে এনেছে।

ঘটল। রাত মাত্র ছটো তখন।

ঘরের মধ্যে আচমকা একটা আর্তনাদ শুনে ছিটকে উঠে বসলেন!

—দাদা! বাঁচাও-বাঁচাও! মেরে ফেলল—বাঁচাও!

অবধূত উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন স্ববু টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে। তাঁকে দেখে ছহাতে আঁকড়ে ধরল।—দাদা বাঁচাও, ওই তান্ত্রিক আমাকে ত্রিশূল হাতে তাড়া করে কালীর মুখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, থামলেই ত্রিশূল দিয়ে বুকে পিঠে খোঁচা দিয়ে আবার নিয়ে যাচ্ছে!

অবধূত তাকে ধরে জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে বললেন, কি পাগলের মতো বকছিস তুই?

স্ববুর ভয়ার্ত মুখ, কাগজের মতো সাদা, ঘাড় ফিরিয়ে একবার ঘরের দিকে চেয়েই সন্ত্রাসে বলে উঠল, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না—ও তান্ত্রিক না পিশাচ!

বজ্র-কঠিন গলায় অবধূত বললেন, ফের ও-কথা বলবি তো তোর জিভ আমি টেনে ছিঁড়ব।

স্ববু সভয়ে এবার দাদার দিকে তাকালো। একটা হাত সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে অবধূত আবার তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। একটা আঙুল সোজা তুলে গুরুর ফটো দেখালেন।—ওই মহাতান্ত্রিক কংকালমালী ভৈরব · দশ বছর বয়সে কল্যাণীকে নিজের কোলে বসিয়ে দীক্ষা দিয়েছেন·· নিজের প্রাণের থেকে তাকে বেশি ভালোবাসেন···তাকে নিয়ে তোর মনের কু-চিন্তা এখানে জমা দিয়ে যা, নইলে কেউ তোকে রক্ষা করতে পারবে না!

আবার তাকে বাইরে টেনে এনে বসিয়ে দিলেন। থর থর করে কাঁপছে। ঘামছে। কুঁজো থেকে জল এনে চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিলেন। বললেন, এখন সবে রাত দুটো, কোথাও যাওয়া যাবে না—সকাল হোক। আশ্চর্য, এরপর অবধূতই ঘুমিয়ে পড়লেন। শান্তির ঘুম। ভোরে জেগে দেখেন সুবু পাশে নেই। কোথাও নেই।

…এই পর্যন্ত বলে অবধূত খানিক ঝিম মেরে বসেছিলেন। তখনো মধ্য রাত। থেকে থেকে শেয়াল ডাকছে। কংকালমালী মহাভৈরবের দাওয়ায় আমি আর উনি মুখোমুখি বসে। মুখ তুলতেই আমার উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন, তারপর ?

ভারী গলায় জবাব দিলেন, অলৌকিক বিশ্বাস করি না বলি, কিন্তু তার-পর যা ঘটে তার কোনো ব্যাখ্যা আমি নিজের ভিতর থেকে আজও পাই নি।…শুনে আপনি হয়তো বলবেন, এ-ও তো সাইকোলজিকাল বা অটো-সাজেশনের ব্যাপার—কিন্তু আমার প্রশ্ন ঠিক মুহূর্তটিতে এমন ব্যাপার কেন ঘটে, কে ঘটায় ? তাছাড়া নিছক সাইকোলজিকাল বা ইমোশনাল ক্রাইসিস হলে কল্যাণী তার ওপর এমন নির্ভর করতে পারে কি করে ? এত জোর পায় কোথায় ?

অধীর আগ্রহে তাগিদ দিয়েছি, তারপর সুবুর কি হলো আপনি আগে বলুন—

শোনার পর আমারও মুখে কথা সরে নি।

…টানা ছমাসের মধ্যে সুবুর আর দেখা পান নি অবধূত। ভেবেছিলেন তার রোগ সেরে গেছে।…সকাল থেকেই আকাশের অবস্থা ভালো ছিল না সেদিন। আকাশ কালিবর্ণ। তারই মধ্যে অবধূতকে কলকাতা রওনা হতে হয়েছিল। এক ভক্তর কঠিন অসুখ, তারা এসে হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে গেছে। এও ঘটনার সাজ ছাড়া আর কি।…দুপুর না গড়াতে, আকাশটা মাথার ওপর ভেঙে পড়ার পাঁচ সাত মিনিট আগে সুবু এসে হাজির। এসে এ-ঘর ও-ঘর খোঁজ করে দাদাকে পেল না। কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করল, অবধূতজী কোথায় ?

দাদা নয়, অবধূতজী। গলার স্বরে ব্যঙ্গ। কুটিল গম্ভীর চাউনি। এতদিন

বাদে দেখে দুচোখে পিচ্ছিল লোভ।

—কলকাতায়।

—কখন ফিরবে?

—জানি না, কেন?

—তার সঙ্গে আমার একটু বোঝাপড়া ছিল, এর মধ্যে আমিও কিছুদিন দুই একজন তান্ত্রিকের সঙ্গে ঘোরাফেরা করলাম···বুঝলে?

কল্যাণী ঠাণ্ডা জবাব দিলেন, আমার বুঝে কি লাভ!

প্রবল বৃষ্টি নামতে দেখে ঘর-দোর সামলাতে চলে গেলেন। শুধু বৃষ্টি নয়, ঝড়ও। অনেকক্ষণ বাদে ঝড় থামল, কিন্তু বৃষ্টির তোড় বাড়তেই থাকল। ডুবিয়ে ভাসিয়ে সব একাকার না হওয়া পর্যন্ত এ বৃষ্টি থামবে না···সেই বৃষ্টিতেও আকাশের এক-দিকে লাল আভা। তাতে পৃথিবী ডোবানোর সংকেত বুঝি। ··সন্ধ্যের আগেই সুবু মদ নিয়ে বসেছে। কল্যাণী নিজে ঘরে না এসে হারুকে দিয়ে এটা-ওটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাত আটটা বাজল। ন'টাও বেজে গেল। চারিদিক জলে ভাসছে। অবধূতের এর মধ্যে ফেরার কোনো প্রশ্নই নেই।

রাত দশটা নাগাদ কল্যাণী দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার খাবারটা এখানে দিয়ে যাব?

সুবু ঘোলাটে চোখে তাকালো। কল্যাণীর হঠাৎ মনে হলো সে যেন তার খাবারটাই সামনে দেখেছে। কথাও কানে এলো, সেই থেকে ঘরে আসছ না কেন, ভয় পাচ্ছ?

কল্যাণী ধীর পায়ে ঘরে এসে দাঁড়ালেন।—ভয় কাকে পাব?

সুবু চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন।—তুমি কাউকেই ভয় করো না—না?

—না।

চোখের পলকে এগিয়ে দরজা দুটো বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। বৃষ্টি আর বজ্রপাতের শব্দে সেই শব্দও ঢেকে গেল। এত মদ খাওয়া সত্ত্বেও সুবু একটুও টলছে না। বলল, খুব ভালো কথা, এমন বীরাঙ্গনাই আমার পছন্দ, দাদা আমাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে মানসিক বিকৃতি ঘটিয়ে আর ভয় পাইয়ে হত্যা করার মতলবে ছিল, আমি তার চরম শোধ নেব না?

আজ তোমাকে কে রক্ষা করে দেখি—

বলতে বলতে ক্ষিপ্ত আক্রোশে দু'হাতে জাপটে ধরে বুকে টেনে নিতে গেল। কল্যাণী একটু বাধা দেবার চেষ্টা করতেই ঠাস করে গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল। দাঁতে দাঁত ঘষে আবার তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, আজ খুন করে পেতে হলেও তোমাকে আমি পাব।

পরের মুহূর্তে যেন একটা ইলেকট্রিক শক খেয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে দাঁড়ালো। দুই চোখে দিশাহারা আতঙ্ক, গলায় আর্তনাদ।—এ কি! এ-কি এ-কি! বাঁচাও বাঁচাও! মেরে ফেলল—খেয়ে ফেলল—বাঁচাও!

উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলল! সেই অন্ধকার, দুর্যোগের ঘন-ঘটার মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল।

কল্যাণী নির্বাক দাঁড়িয়ে চার-দিক দেখছেন। ওই লোকের এমন ত্রাস আর আতংক দেখে কিছু ঘটে গেল অনুভব করেছেন, কি ঘটল তাই বোঝার চেষ্টা। ফর্সা গালে পাঁচ আঙুলের দাগ দগদগে লাল হয়ে আছে।

অবধূত ফিরলেন পরদিন বিকেলের দিকে। গত দিনের দুর্যোগে ট্রেন চলাচল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কল্যাণী তক্ষুনি কিছু বললেন না। একটু জিরিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে জল-টল খাবার পর কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতার রোগী কেমন?

অবধূত জবাব দিলেন, বয়সটাই রোগ, কিছু করার আছে মনে হয় না।··· তুমি আমার জন্য ভাবছিলে তো?

—এই ঝড় জলে রওনা হতে পারবে না বুঝেছিলাম।···তাছাড়া ভাবার সময়ও খুব পাই নি, তোমার ভাই এসেছিল···তার মুখ দেখেই মনে হয়েছিল মতলব ভালো না —

অবধূত হাঁ হয়ে চেয়ে রইলেন। কল্যাণী এরপর ঠাণ্ডা মুখে সবই বললেন। একটি কথাও গোপন করলেন না।

অবধূত স্তম্ভিতের মতো বসে। অনেকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করলেন ও দরজা বন্ধ করে এই কাণ্ড করার সময়েও তোমার ভয় করল না?

—একটুও না। সন্ধ্যার দিকে একটু অশান্তি হচ্ছিল।···মাকে খানিক ডেকে শিবঠাকুরের দিকে মন দিলাম। মনে হলো ঠিক আমার চোখের সামনে

সেই রকম দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ফিক-ফিক করে হাসছেন। ব্যাস, আমার সব অস্বস্তি অশান্তির শেষ।···কিন্তু ভীষণ কিছু দেখেই তোমার ভাই উন্মাদের মতো ঝড়-জলের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেছে।

মাসখানেক পরে। সকাল তখন ন'টা হবে। অবধূত বাইরের বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছিলেন। বছর আট সাড়ে আটের একটি ছেলের হাত ধরে এক মহিলা বাঁশের ছোট গেট সরিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। অবধূত খেয়াল করেন নি কিন্তু কল্যাণী তখুনি কি বলার জন্য বাইরে এসে-ছেন, দেখে অস্ফুট স্বরে বললেন, কেউ এলো···

অবধূত মুখ তুলে দেখলেন সিঁড়ির কাছে ছেলের হাত ধরে দ্বিধান্বিত মুখে মহিলা দাঁড়িয়ে। কালোর ওপর ভারী সুন্দর মুখশ্রী। কিন্তু ছেলেটার দিকে তাকিয়েই অবধূত থমকালেন। মনে হলো বাচ্চা বয়সের সুবু এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

ডাকলেন, এসো, তোমার নাম কি বকুল তো ?

মহিলা ভ্যাবাচাকা খেয়ে চেয়ে রইল একটু। তারপর মাথা নাড়ল, অর্থাৎ তাই।

—এসো।

ঈষৎ বিস্ময়ে কল্যাণীও দেখছে তাঁকে। এই নাম কখনো শোনে নি। তাঁর থেকে তুই এক বছরের ছোট অর্থাৎ বছর একত্রিশ বত্রিশ হবে বয়েস। কপালে ছোট সিঁদুর টিপ, সিঁথিতেও সূক্ষ্ম সিঁদুরের আঁচড়। উঠে এসে উপুড় হয়ে প্রথমে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অবধূতকে প্রণাম করল, পরে কল্যাণীকেও।

দ্বিধান্বিত গলায় বকুল জিজ্ঞেস করল, সুবীর চট্টোপাধ্যায় আপনার ছোট ভাই ?

—হ্যাঁ···কেন ? বোস—

বসল না। উদ্গত আবেগ সংযত করে বলল, তিনি খুব অসুস্থ, হাসপাতালে আছেন, অবস্থা খারাপ, কাল থেকে অক্সিজেন চলছে, ফিরে গিয়ে দেখতে পাব কি না জানি না···তবু আপনাদের এক্ষুনি একবার যেতে হবে, তিনি পাগলের মতো আপনাদের খুঁজছেন।

কল্যাণী নির্বাক। অবধূত স্তব্ধ।—জিজ্ঞেস করলেন তার কি হয়েছে ?
শুনলেন কি হয়েছে।···মাসখানেক হলো হঠাৎ মাথার গণ্ডগোল। ঘুমের মধ্যে এমন কি জেগে থেকেও ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে আর্তনাদ করতে থাকে, পাগলের মতো পালাতে চেষ্টা করে। কি দেখে বকুল জেনেছে।···এক-জন তান্ত্রিক ভৈরব বিকট মূর্তিতে তাকে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া করে, ত্রিশূ-লের খোঁচা মেরে মেরে রক্তে-ভেজা জীবন্ত কালীর মুখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। মাথার গণ্ডগোল ভেবে ডাক্তার দেখানো হয়েছে, কিন্তু রোগ বাড়ছেই। ভয়ে ত্রাসে উন্মাদের মতো ছোটে। রাত দশটার পরে এ-রকম বেশি হয়।—সেদিন ঘুমের মধ্যেও এমনি ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে ওঠে আর পালাতে গিয়ে দাওয়া থেকে পড়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। হাস-পাতালের ডাক্তার বলল, ব্রেন-কংকাশন। অপারেশনের পর থেকেই দিনে দিনে অবস্থা খারাপ হচ্ছে। জ্ঞান হলে বকুলকে চিনতে পারে, চিৎকার করে বকাবকি করে কেন এখনো কোন্নগর থেকে দাদাকে আর বউদিকে ধরে নিয়ে আসছে না। অজ্ঞান অবস্থায়ও তাদের ডাকে। গতকাল যা গেছে [illegible] না পেরে বকুল তার মায়ের কাছে লোক পাঠিয়ে দাদার কোন্ন-গ[illegible]ড়ির হদিস জেনেছে। আজ এসেছে।
[illegible]ড় নিঃশ্বাস ফেলে অবধূত জিজ্ঞেস করেছেন মা ওর খবর [illegible]ছেন ?
··না আমি অসুখের কথা কিছু বলি নি।
—তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নিচ্ছি। কল্যাণীকে বললেন, কিছু টাকা বার করো।
প্রস্তুত হয়ে দেখেন কল্যাণীও যাবার জন্য তৈরি।—তুমিও আসছ তাহলে ?
—এ-সময়ও আমি যাব না, বলো কি !
দেড়গুণ ভাড়া গুনে সোজা ট্যাক্সিতে এলেন। হাসপাতাল। সাধারণ কেবিনে সুবুর প্রায়-নিশ্চল দেহ পড়ে আছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। অক্সিজেন চলছে। ড্রিপ নার্স জানালো যে কোনো মুহূর্তে কিছু হয়ে যেতে পারে, ব্লাডপ্রেসার একেবারে নেমে গেছে।
প্রায় আধ-ঘণ্টা বাদে সুবু বড় বড় করে তাকালো হঠাৎ। দাদাকে দেখল।

স্পষ্ট টনটনে গলায় বলল, এসেছ !···বউদি এলো না ?
কল্যাণী সামনে এসে দাঁড়ালেন।
দৃষ্টি ঠিক চলছে না, তবু তন্ময় হয়ে দেখার চেষ্টা।—আমাকে দয়া করো, আমার মাথায় তোমার হাত রাখো।
কল্যাণী আরো এগিয়ে গেলেন। মাথায় হাত রাখলেন। হাত রেখে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন।
—আ-আ—ঃ, শান্তি···শান্তি।
বিকেল চারটে নাগাদ সব শেষ।

৮

অবধূত নিজের ভাগ্য কখনো দেখেন নি, কখনো যাচাই করেন নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কখনো ভালো করে নিজের কপাল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন নি। দুর্ভাগ্য মানুষকে তাড়া করে ফেরে এমন একটা কথা শোনা ছিল। কিন্তু নিজের বেলায় দেখছেন এর বিপরীতটাও তার থেকে কম সত্যি নয়। একে তিনি সৌভাগ্য বলবেন কিনা জানেন না। কারণ এর সঙ্গে আত্ম-তৃপ্তির যোগ স্বাভাবিক, তা তাঁর নেই। কিন্তু কোথায় ছিলেন, আজ ভাগ্য তাঁকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে! নাম যশ খ্যাতি অর্থ ধাওয়া করে আসছে। কাছের লোক দূরের লোক তাঁকে দুঃখ জমা দেবার মতো একটা মানুষ ভাবছে। শক্তির আধার ভাবছে। নিজের ভাগ্য গণনা না করেও তিনি বুঝতে পারছেন কর্মের আরো প্রবল স্রোতের মুখে তিনি ভেসে চলেছেন, ভেসে যাবেন।
কিন্তু এর সঙ্গে তার নিজস্ব শক্তির যোগ কোথায় ? অনেক রোগের তিনি হদিস পান, ওষুধ সম্পর্কে বিচার বিবেচনাও প্রখর, মানুষের দিকে চেয়ে কিছু লক্ষণ ধরতে পারেন, তাপ পরিতাপ সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। কিন্তু এ-সবের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব শক্তির যোগ কোথায় ? অথচ কল্যাণীর দিকে চেয়ে মনে হয় শক্তি বলে কোথাও কিছু আছে। যা তার নেই।

সুবুর মৃত্যুর পর তিনি বড় রকমের একটা নাড়াচাড়া খেলেন। স্ত্রীর পাশে নিজেকে এমন শক্তিশূন্য আর কখনো মনে হয় নি। তাঁর এই অস্তিত্বও যেন স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল। বক্রেশ্বরের ভৈরবী মা মহামায়া তাঁকে যেটুকু দিয়েছেন সেটা এই মেয়ের মুখ চেয়ে। কংকালমালী ভৈরব তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন, তাঁর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তা বড় আদরের এই মেয়ের জন্য। আজ তাঁর যা কিছু তার সবই কল্যাণীর জন্য। শক্তি কি জানেন না, কিন্তু এই শক্তির বন্ধনে আটকে আছেন।

ভাইয়ের মৃত্যুর পর একটা নীরব আক্রোশ তাঁকে যেন পেয়ে বসল। শক্তির দৌড় দেখার আক্রোশ। কল্যাণীর দোষ নেই, কিন্তু ভাইয়ের এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর উপলক্ষ তো বটে। কল্যাণী যা বলেন তিনি তাঁর বিপরীত করেন। তাঁকে সাহায্যের জন্য ডেকে ওষুধ বানাতে বসলে বিকেল গড়ায়। এরই ফাঁকে-ফাঁকে কল্যাণী যা এনে দেন, বিরক্তি দেখিয়ে দিব্বি খেয়ে নেন, স্ত্রীর নিরম্বু উপোস চলছে তা যেন খেয়ালই নেই। লোক আসার বিরাম নেই। হঠাৎ তাদের সেবার নেশায় পেয়ে বসল। তাদের জন্য হারুকে নিয়ে তিন মাইল দূরের বাজার যাও, রাঁধো-বাড়ো খাওয়াও। অসময়ে লোক আসার জন্য কল্যাণীর নিজের অন্নও কতদিন তুলে ধরে দিতে হয়েছে। সব থেকে নিঃশব্দে নিষ্ঠুর তিনি রাতের নিভৃতে। যে বাসনা সুবুকে পাগল করেছিল সেই গোছেরই একটা লোভের বাসনা নিজের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন, চোখে মুখে স্থূল আচরণে পরস্ত্রীকে ভোগের দখলে টেনে আনার উল্লাস প্রকট করে তুলতে চান। তিনি চান স্ত্রীর এই ধৈর্যের শক্তিতে ভাঙন ধরুক, সে বিদ্রোহ করে হার মানুক।

···শেষে কল্যাণী একদিন শুধু বললেন, তোমার হলো কি বলো তো? তুমি হঠাৎ এ-রকম হয়ে গেলে কেন?

—পছন্দ হচ্ছে না? অবধূত হেসে উঠেছেন।—তাহলে তোমার শক্তির অস্ত্র হাতে নাও, তোমার শিবঠাকুরকে ডেকে বলো তিনি বিহিত করুন, পারেন তো সুবুর মতো শাস্তি দিন আমাকে।

কল্যাণী হাঁ করে মুখের দিকে চেয়েছিলেন খানিক। তারপর বললেন, তুমি একটা পাগল, লোকের চিকিৎসা না করে নিজের চিকিৎসা করাও।

…যে মানুষকে দেখে এখন শত শত মানুষ রোজ মাথা নত করে, হাত জোড় করে—তাঁকে কল্যাণী অনায়াসে বলে বসল, তুমি একটা পাগল ·। কিন্তু এই এক কথায় অবধূতের কাঁধ থেকে যেন এক অপদেবতা বিদায় নিল। চিত্ত বিষণ্ণ তবু। নিজের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। ক্রীতদাস মূর্তি। রমণীর ক্রীতদাস। সেই রমণী নিজের স্ত্রী।

শিকল ছেঁড়ার তাগিদে আবার দূরে পালানোর মন। এখানকার পসারের পরোয়া একটুও করেন না। লোকসানের হিসেব করেন না। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম আবেগের তাড়নায় চট করে নড়তেও পারলেন না। সুবু বকুলকে বিয়ে করেছিল কিনা জানেন না। ও চলে যাবার আগে বকুলের কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দেখেছিলেন। অবধূত বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামান না। বকুলকে অসহায় ভ্রাতৃ-বধূই ভাবেন। তার প্রতি দরদ আর কর্তব্য তাঁকে সাময়িকভাবে আটকে ফেলল। সুবুর এক মাসের চিকিৎসায় আর অপা-রেশনে বকুল একেবারে নিঃস্ব। শেলাইয়ের দোকান থেকে কি-ই বা রোজগার ছিল। বকুল নিজে মুখ ফুটে কিছু বলে নি, অবধূত খোলাখুলি জিজ্ঞেস করে জেনেছেন।

তার জন্য আরো বিশেষ করে ওই সাড়ে আট বছরের মিষ্টি দুষ্টু ছেলেটার জন্য মন চিন্তাচ্ছন্ন। ওদের সম্পর্কে বিমাতার সঙ্গে পরামর্শ করতে গেছলেন। কিন্তু ওই মহিলা কঠিন, নিস্পৃহ। স্পষ্ট বলে দিয়েছেন তাঁর ওখানে ঠাঁই হবে না, বাড়ি তিনি মেয়ের নামে উইল করে দিয়েছেন।

কল্যাণীর পরামর্শ মতো অবধূত ওদের কোন্নগরে নিজের কাছে এনে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বকুল রাজি হয় নি। সবিনয়ে বলেছে আমার জন্য ভাববেন না দাদা, ধার দেনা মিটিয়ে এই দোকান দিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে খেয়ে থাকতে পারব…কিন্তু ছেলেটার জন্য আমার এখন থেকে অন্য ভাবনা, নবছরও বয়স হয় নি এখনো, কি দুরন্ত আর অবাধ্য ভাবতে পারবেন না, আপনি আর দিদি সব অপরাধ ক্ষমা করে ওর ওপর একটু আশীর্বাদ রাখুন, আপনাদের আশীর্বাদই আমার সব থেকে সম্বল।

অবধূতের ধারণা, কেন সুবুর এত বড় অঘটন ঘটল বকুল সেটা আঁচ করতে পেরেছে। ছেলেটার নাম তপন, তপু। একটু বেশি মাত্রায় দুরন্ত

যে, মুখ দেখলেই বোঝা যায়। চঞ্চল ছুচোখ যেন সারাক্ষণ হাসে, আর কিছু করার মতলব ভাঁজে। ওকে নিজের কাছে এনে রাখার কথা বলতে পারতেন, কিন্তু ছেলেটাকে ছেড়ে ওর মা থাকে কি করে। তাছাড়া ছেলে কোল-ছাড়া হলে এই বয়সের সুশ্রী গরিব মা-ও কলকাতা শহরে খুব নিরাপদ নয়। বকুল কালো বটে কিন্তু ভারী সুশ্রী। জোর করেই অবধূত তার ধার দেনা মিটিয়ে দিয়েছেন। আর বলেছেন ছুটি-ছাটা হলেই তপুকে নিয়ে সে যেন কোন্নগরে তাঁর ওখানে কাটিয়ে আসে।

ঈষৎ আগ্রহ-ভরা ছুচোখ তুলে বকুল জিজ্ঞাসা করেছিল, দিদি বিরক্ত হবেন না···?

অবধূত হেসে জবাব দিয়েছেন, তোমাদের বরাবরকার মতো কোন্নগরে রাখার এ প্রস্তাবটা তাঁরই ছিল। বকুল বলেছে, সামনের ছুটিতে ছেলেকে নিয়ে সে কোন্নগরে গিয়ে দিদির কাছে থাকবে।

···তবে সপ্তাহে ছু-তিন দিন অন্তত দোকান দেখার জন্য তাকে কলকাতায় যাতায়াত করতে হবে।

অবধূত এই কারণেই বেরিয়ে পড়তে পারেন নি।

কিন্তু ওরা আসার পর অবধূত যেন আর এক মায়ার বন্ধনে পড়ে গেলেন।···

হ্যাঁ, যেমন মিষ্টি আর তেমনি ছুরন্ত বটে ছেলেটা। আর ছুঃসাহসও বটে। অবধূতের অনেকবার ইচ্ছে হয় ওর কপালটা ভালো করে দেখেন। চোখে পড়ে না এমন অনেক সূক্ষ্ম আঁচড়ের কারিকুরি। তাঁর বিবেচনায় এটা ভালো লক্ষণ নয়। হাতের দিকে আপনা থেকে যেটুকু নজর গেছে তাতেও খটকা লেগেছে। না, সাহস করে তিনি সজাগ চক্ষু নিয়ে ওর কপাল বা হাত দেখেন নি। ছুখিনী মায়ের ছেলে, কি দেখতে কি দেখবেন ঠিক কি। এ-ক্ষেত্রে তাঁর কর্তা না সাজাই ভালো।

জেঠুর সঙ্গে তপুর খুব ভাব! জেঠু হেসে হেসে সম-বয়সীর মতো ওর সঙ্গে গল্প করে, ওর মনের কথা শোনে। জেঠুর টক-টকে লাল জামা-কাপড় ওর দারুণ ভালো লাগে। জেঠু এ-রকম জামা-কাপড় পরে কেন এ নিয়ে কৌতূহল আর প্রশ্নের অন্ত নেই। বড় মা-কেও ওর দারুণ পছন্দ। কল্যাণী-কেই জিজ্ঞেস করে, তুমি এমন আগুনপানা সুন্দর হলে কি করে?

একটা ধাক্কা নীরবে সকলকেই সামলাতে হয়। এই রূপের আগুনে ওর বাপ পুড়ে মরেছে। কল্যাণী হাসি মুখেই বলেছেন, আগুন আবার সুন্দর হয় কি করে রে ?

—বাঃ, আগুনের থেকে সুন্দর আর কোনো রং আছে !

অবধূতের গম্ভীর মন্তব্য, রং সুন্দর হলে কি হবে, পোড়ায় যে···?

—সেই জন্যই তো আগুন আমার আরো ভালো লাগে।

এই ছেলেকে নিয়ে এরই মধ্যে অবধূত তু তুটো অঘটন থেকে বেঁচেছে। এখানে আসার দিন কতকের মধ্যে বাড়ির কাছের পুকুর দেখে তপুর সাঁতার শেখার সাধ হয়েছে। হারু সাঁতার শেখাবে কথা দিয়েও দেরি করছে দেখে তার আর ধৈর্য থাকল না। তুপুরে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে গিয়ে হাফ-প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরা অবস্থাতেই পুকুরে নেমেছে। সাঁতার মানেই হাত-পা ছোঁড়া জানে। তাই করে গভীর জলে গিয়ে হাবুডুবু। উদ্বাস্তুদের কারো কারো চোখে পড়েছিল বলে রক্ষা। তাকে যখন তুলে আনা হয় আধ-মরা দশা। ছদিন লেগেছে সুস্থ হতে। তার পরেই ঘোষণা করেছে, অনেকটা নাকি শেখা হয়ে গেছে, হারু কাকা জলদি সাঁতার শিখিয়ে না দিলে আবার একলাই পুকুরে নামবে।

অবধূত নিজে নিয়ে গিয়ে ওকে সাতদিন ধরে সাঁতারে পোক্ত করে তবে নিশ্চিন্ত।

আর একদিন তার মনে হয়েছে জেঠুর বাড়ির এক-তলা ছাদ থেকে নিচে লাফ দিতে পারাটা সহজ ব্যাপার। তক্ষুনি সেই বীরত্ব দেখানোর ঝোঁক। শব্দ শুনেই অবধূত কল্যাণী আর বকুলের ত্রাস। তপু মাটিতে শুয়ে পড়েছে, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত। অবধূত ওকে শ্রীরামপুরে এনে এক্সরে করে তবে হাঁপ ফেলেন। ফ্র্যাকচার হয় নি, তবে সাংঘাতিক ভাবে মচকে গেছে।

অবধূত নিজেই চিকিৎসা করেছেন। পায়ের গোড়ালির দিক কদিন পর্যন্ত ফুলে ঢোল। সাত দিনের মধ্যে দাঁড়াতেও পারে নি। অবধূত রক্তাক্ত মুখ করে বলেছেন, তুই এরপর আমার হাতে মার খাবি।

মিষ্টি হাসি, তুষ্টু চাউনি। তারপর জবাব।—মার খেলে আমার কিছুই হয় না, মা তো এক-একসময় মেরে মেরে শুইয়ে ফেলে।

ভিতরটা মোচর দিয়ে উঠেছিল অবধূতের। কপালটা আত্মিক মনোযোগে লক্ষ্য করবেন?···হাতটা একবার দেখবেন? না, থাক।

—বলিস কি, এত দুষ্টুমি কেন করিস? ? ? ? ?

—দুষ্টুমি হয়ে যায় কি করব।···দু-তিন মাস আগে মা এমন মার মারল যে রাতে একেবারে তিন ডিগ্রী জ্বর।

—কেন, তুই কি করেছিলি?

—পাথর ছুঁড়ে একটা লোকের মাথা দু ফাঁক করে দিয়েছিলাম। মাকে সে গালাগাল কচ্ছিল আর শেলাইউলি বলেছিল।

অবধূত শুনে থ।

ওরা চলে যেতে বাড়ি যেন একেবারে ফাঁকা। কল্যাণীও ঘুরেফিরে অনেক বার বলেছেন, ছেলেটা যেন বাড়িটাকে একেবারে ভরাট করে রেখেছিল।

মাস দেড়েক পরের এক শনিবার। অবধূত জানলা দিয়ে দেখেন, লজ্জা-লজ্জা মুখ করে তপু বাঁশের গেট সরিয়ে ঢুকছে। কিন্তু পিছনে আর কাউকে দেখতে পেলেন না। তখনো ভাবলেন, ও ছুটে এসেছে, মা ওর পিছনে আসছে।

কিন্তু বাইরের বারান্দায় এসেও দেখেন ওর সঙ্গে আর কেউ নেই।

—কি রে, কার সঙ্গে এলি?

—একলাই।

গলা শুনে কল্যাণীও এসে দাঁড়িয়েছেন। বলে উঠলেন, তোর মা তোকে একলা ছাড়ল?

ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, মা জানেই না।

দুজনেরই চক্ষুস্থির। তপুর জোরালো কৈফিয়ৎ, রবিবাবের পর সোম মঙ্গল বারেও তার স্কুল ছুটি। জেঠুর বাড়ি যাবার জন্য মাকে এতবার করে বলল কিন্তু মা কানেই নিল না—এদিকে সে সাঁতার ভুলে যাচ্ছে, তাই চুপিচুপি একলাই চলে এসেছে।

অবধূত হাসবেন না ওর মায়ের চিন্তায় উতলা হবেন!—তুই কলকাতা থেকে এ-পর্যন্ত চিনে একলা চলে এলি!

—সহজ তো। বাসের পয়সা আগেই যোগাড় করে রেখেছিলাম। হাওড়া স্টেশনে এসে লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম কোন্ গাড়ি কোন্নগরে যাবে। গাড়ি ছাড়ার আগে ট্রেনে উঠে পড়লাম। টিকিট তো নেই, এক-একটা স্টেশন এলেই নেমে পড়ি, আবার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ি। হাওড়া থেকে কটা বা স্টেশন!

অবধূত তক্ষুনি এক ভক্তকে ডাকিয়ে এনে বকুলের কাছে চিঠি লিখে তাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মঙ্গলবার বিকেলে তাকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। বকুলকে বললেন, ওকে মার-ধোর করবে না, ও আর এ-রকম করবে না বলেছে।

ছেলের তক্ষুনি প্রতিবাদ।—আমি বলেছি কয়েকটা দিন স্কুলে ছুটি পেলে মা যদি তোমার আর বড় মার কাছে নিয়ে আসে তাহলে আর এ-রকম করব না।

রাগের মুখে ওর মা পর্যন্ত হেসে ফেলেছিল।

এরপর একদিন দু দিন না হোক, একসঙ্গে চার পাঁচদিনের ছুটি পেলেই ছেলে নিয়ে বকুলকে কোন্নগর আসতে হয়। চলে গেলে অবধূত প্রত্যেক-বারই কল্যাণীকে বলেন, এ আবার কি মায়ায় জড়িয়ে পড়ছি আমরা।

জবাব না দিয়ে কল্যাণী শুধু হাসেন। অবধূত নিজের ভিতরে চোখ চালান। এই দুরন্ত মিষ্টি ছেলেকে একমাত্র বংশধর ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। অনেকটাই তাঁর ভিতর জুড়ে বসে আছে। দিন যায়। একে একে বছর গড়ায়। দিনে দিনে ছেলেকে নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তা আর নালিশ বাড়ছেই। এ ছেলেকে নিয়ে তার এক মুহূর্ত শান্তি নেই। পাড়ার যত দুষ্টু ছেলেরাও মোড়ল। দল বেঁধে মারামারি করে। কোনো কথা শোনে না। এই ছেলে এখানে রাখা আর ঠিক নয়, তাকে বাইরের খুব কড়া কোনো হস্টেলে পাঠানো দরকার।

প্রস্তাবটা অবধূত উড়িয়ে দিতে পারেন না। কিন্তু একটু খটকা লাগে অন্য কারণে। বলেন, কিন্তু স্কুলে তো বরাবর ফার্স্ট সেকেণ্ড হচ্ছে শুনি?

বকুল বলে সেই জন্যেই আমার আশা দাদা, বাইরে গেলে ও হয়তো মানুষ হবে, কিন্তু এখানে থাকলে ও বয়ে যাবে।

তপুর পনেরো বছর মাত্র বয়েস তখন। অবধূতের ভিতরে আবার ওর কপাল আর হাত দেখার তাড়না। কিন্তু থাক। এখনো সাবালক হয় নি, সমস্ত চিহ্নই বদলাতে পারে। তপুকেই বলেন, তোকে আর কলকাতায় রাখব না ভাবছি, বাইরের কোনো ভালো হস্টেলে পাঠিয়ে দেব। ওর মা আর কল্যাণীর সামনেই জ্যাঠা-ভাইপোতে আলাপ।

—দাও। ভালোই হবে, একটু স্বাধীনতার মুখ দেখব।

—স্বাধীনতার মুখ দেখবি মানে, রীতিমতো কড়া হস্টেলে রাখব।

হাসি।—এমন হোস্টেল কোথায় আছে? মা-কে তো বলেই দিয়েছি, বাইরে পাঠালে সাত দিনের মধ্যে আমি হাওয়া হয়ে যাব···আর আমার কোনো পাত্তাই পাবে না তোমরা, একবার পাঠিয়ে দেখুক না—

বকুল বলে উঠেছে, তুই কি কখনো আমার দুঃখ দুশ্চিন্তা বুঝবি না?

—নাকে কেঁদো না তো, হস্টেলে থাকব না বলা সত্ত্বেও এক-কথা তুমি বার বার বলো কেন? আমি কখনো অন্যায় করি?

অবধূত হঠাৎ গর্জনই করে উঠেছেন, এই বেয়াদপ। মায়ের সঙ্গে ফের ও-রকম করে কথা বলবি তো কান ছিঁড়ে নেব!

তপু গুম।

পরে ভেবে-চিন্তে অবধূত বকুলকে বলেছেন, পাঠাবার চেষ্টা কোরো না, যে ছেলে, সত্যি মুশকিল হতে পারে।

আরো দু'টো বছর কেটে গেল। অবধূত কখনো বেরোন, কখনো বা ঘরে স্থিতি হন।

তপুর বয়েস সতরো। ফার্স্ট ডিভিশনে বেশ ভালো নম্বর পেয়েই পাশ করেছে। অংক আর সায়েন্সের পেপারে লেটার পেয়েছে। এবারে ফিজিক্স অনার্সে বি. এস-সি পড়বে। অবধূতের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়েছে, ওর বাপটাও রীতিমতো ভালো ছাত্র ছিল। আবার আনন্দে সেই রাতে ফিস্টও লাগিয়ে দিয়েছেন। কল্যাণীকে বলেছেন তপুকে খুব ভালো করে খাওয়াও।

কিন্তু মুখ শুকিয়ে বকুল এক ফাঁকে যা বলল, শুনে অবধূত বেশ উতলা। সেটা সত্তর সালের সবে শুরু। নক্সালরা তৎপর হয়ে উঠেছে। বকুলের ধারণা, তপু তাদের খপ্পরে পড়ছে। পুলিশ এর মধ্যে দু'বার তাকে থানায়

নিয়ে গেছে। অবশ্য জেরার পর ছেড়েও দিয়েছে। বকুল বলল, ওর কথা ভাবলে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যায় দাদা।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তপুকে নিয়ে তিনি জেরায় বসেছেন।—এ-সব কি শুনছি?

—ছাড়ো তো, মায়ের বেশি-বেশি ভাবনা। আমি অন্যায় কিছু করছি না।

—থাপ্পড় খাবি তুই আমার হাতে—এক পড়াশুনা ছাড়া তোর অন্য কিছু করার দরকার কি? তুই এ-সব মুভমেন্টের কি বুঝিস?

সতেরো বছরের ছেলের মুখে অদ্ভুত হাসি।—বোঝার কি আছে বলো জেঠু—স্বাধীনতার নামে যে ভাঁওতাবাজী চলছে তা-ই বিশ্বাস করব!

—তা বলে এ-সব মারামারি কাটাকাটিতে বিশ্বাস করবি?

—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো জেঠু, ও-সবের মধ্যে আমি নেই। নক্সাল নাম নিয়ে অনেক মুখ্যু লোকও ঢুকে গেছে। দরকার ছাড়া মারামারি কাটা-কাটির মধ্যে যাব কেন?

—দরকার পড়লে যাবি?

জবাবে হাসি। অবধূত অনেক কথাই এরপর বলেছেন। কিন্তু ফল হয়েছে মনে হয় নি।

তপু কলকাতায় গিয়ে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে বি. এস-সি পড়া শুরু করল। তার পরের তিন-সাড়ে তিন বছরের খবর অবধূত আর রাখেন না। কারণ ঘরের বন্ধন ছেঁড়ার তাড়নায় এবারে তিনি যাকে বলে নিরুদ্দিষ্টই হয়েছেন। তিন বছরের ওপর দ্বার-ভাঙার কাঁকুড়ঘাটির মহাশ্মশানে কাটিয়েছেন। ফলে অনুভব করেছেন, ঘটনার সাজে ডাক পড়েছিল বলেই তিনি সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, আর মেয়াদ ফুরোতে ফিরে আসতেও বাধ্য হয়েছেন। ঘরের বন্ধন ছেঁড়ার মানসিক তাগিদ এরপরে আর কখনো অনুভব করেন নি।

কোন্নগরে ফিরে তপুর খবর শুনে তিনি ভীষণ বিচলিত। শুধু তপুর নয়, বকুলেরও। তারও নাকি শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে আধখানা হয়ে গেছে। জীবন যুদ্ধে এবারে সে হারই মেনেছে। জীবন্মৃত দশা।···বেশি নয়, মাস তিন-

চার মাত্র আগের কথা। বি. এস-সি ফাইন্যাল পরীক্ষার পরেই তপু কোথায় ডুব দিয়েছে কেউ জানে না। পুলিশ দল-বলসহ তাকে খুঁজছে। তাদের নামে শুট-অ্যাট-ফাইট অর্থাৎ ধরতে না পারলে দেখামাত্র গুলি করার অর্ডার বেরিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অপরাধের অভি-যোগ। পুলিশ বকুলের ডেরায় এসে তছনছ করেছে, সব ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়েছে। তাকে অনেকবার করে টেনে হিঁচড়ে থানায় নিয়ে গেছে, জেরার নামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রেখে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। ···না বকুল বিশ্বাস করে না তার ছেলে জঘন্য কোনো অপরাধ করেছে, দলের সঙ্গে ছিল বলেই অন্যদের সঙ্গে তার নামেও হুলিয়া বেরিয়েছে।

তপু ফেরার হবার তিন-চারদিন বাদে কল্যাণী ওর লেখা ছোট্ট একটা চিঠি পেয়েছিলেন। লিখেছে, বড়-মা, বাধ্য হয়েই আমাকে সরে যেতে হচ্ছে, কপালে কি আছে জানি না, মা-কে দেখো! কল্যাণী ফাঁপরে পড়ে-ছেন। তখন পর্যন্ত তাঁর কেবল হারু ভরসা। অবশ্য পাড়া-প্রতিবেশীরাও ভরসা। বাবা নেই বলে তারাও সর্বদা মাতাজীর খোঁজ খবর নেয়।··· কল্যাণী ততদিনে মাতাজী হয়ে বসেছে। হারুকে নিয়ে কলকাতায় এসে তাঁর চক্ষুস্থির। বকুল শয্যাশায়ী। তাঁকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। তারপর সব বলেছে' কল্যাণী তাকে নিজের কাছে এনে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে বলেই সে আসে নি। বলেছে, পুলিশ তপুর খোঁজে জাল ফেলে বসে আছে। আত্মীয়-পরিজন কোথায় কে আছে খোঁজ করছে। বকুল বলেছে কেউ কোথাও নেই, কোন্নগরে গেলে সেখানেও পুলিশের উৎপাত শুরু হবে।···তপু হঠাৎ কখনো বড় মায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে কিনা জানে না। তাই কোন্নগরে গিয়ে তার ওখানকার আশ্রয় সে বিপন্ন করতে চায় না।

কল্যাণী আর যায় নি। বকুলও আসে নি। খুব নিঃশব্দে কল্যাণী ব্যবস্থা যা করার করেছেন। এখান থেকে লোক পাঠিয়ে, আগের থেকেও ভালো করে বকুলের দোকান সাজিয়ে দিয়েছেন।···কিছুদিন আগে তপুর বি. এস-সি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। কল্যাণী কাগজে খবর পড়ে অবাক হয়েছেন। এত কাণ্ডের মধ্যে থেকেও ওই দস্যি ছেলে কিনা ফিজিক্সে

ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে !

অবধূতও এরপর কলকাতায় গিয়ে খুব সাবধানে বকুলের সঙ্গে দেখা করেছেন। এমনকি চোখে পড়ার ভয়ে রক্তাম্বর ছেড়ে সাদা পোশাকে গেছেন। বকুল তাতেওমিনতি করে বলেছে, আপনি আর নিজে আসবেন না—জানাজানি হলে সকলেরই ক্ষতি।

দিন বসে থাকে না। একে একে আরো চারটে বছর কেটে গেল। ছিয়াত্তর সালের এপ্রিল মাস সেটা। শ্মশানের ধারে রাত এগারোটা অনেক রাত্রি। অবধূত আর কল্যাণী জেগেই ছিলেন। কার্তিককে কি দরকারে কলকাতা পাঠানো হয়েছিল। বাবার সে পাকাপোক্ত চেলা এখন। দরজায় খুট খুট কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ভাবলেন সে-ই ফিরে এসেছে। অথচ এই রাতে তার ফেরার কথা নয়।

দরজা খুলেই অবধূত চমকে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। অবছা অন্ধকারে কে একজন রিভলবার তাক করে আছে, তার পিছনে আরো একজন কেউ। সামনের লোকের চাপা হিস হিস গলা, টুঁ-শব্দটি নয় ! তারপরেই হি-হি হাসি।—এই রে, জেঠু তুমি ! আমি ভেবেছিলাম বড়-মা দরজা খুলবে। ঘুরে তাকিয়ে বলল, এসো রিনা চটপট ঢুকে পড়ো। এগিয়েও থমকালো।—বাড়িতে বাইরের কেউ নেই তো জেঠু ?

তপন···তপু ! তার সঙ্গে একটি মেয়ে। হাতে ছোট স্যুটকেশ। নীরবে বিস্ময়ে মাথা নেড়ে অবধূত দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। রিনা নামে মেয়েটি ভিতরে পা দিতে তপুই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করল।

ঘরে এসে তুজনেই ওরা তাঁকে আর কল্যাণীকে প্রণাম করল। কল্যাণীও অবধূতের মতোই হাঁ। তপুর চেহারা খুব বদলায় নি। তবে চুল একেবারে ছোট করে ছেঁটে ফেলার দরুন মুখের মিষ্টি ভাব একটু কমেছে। আর বেশ রোগা হয়েছে। মেয়েটির বয়েস একুশ-বাইশ, মোটামুটি সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবতী। এক-নজর তাকালেই বোঝা যায় অন্তঃসত্ত্বা। এই অচেনা বাড়িতে এ-রকম তুজনের সামনে পড়ে বেশ বিব্রত কুণ্ঠিত মুখ।

কিন্তু তপুর কোনো সংকোচের বালাই নেই। মুখে সেই আগের মতোই

মিটি মিটি হাসি।—একেবারে হাঁ হয়ে গেলে যে তুজনেই! এই হলো রিনা, আমার বিয়ে করা বউ। আবার হাসি।—বিয়েটা অবশ্য সিঁতুর পরিয়ে আর মালা-বদল করে যে-যার ইচ্ছে মতো করেছি, তার জন্য রিনার মনে একটু খুঁতখুঁতুনি আছে, আমি ওকে বলেছি জেঠুর কাছে গেলে উনি তন্ত্র-মতে আমাদের দারুণ বিয়ে দিয়ে দেবেন'খন। যাক কথা পরে, সকাল থেকে এ-পর্যন্ত আমাদের পেটে দানা পড়ে নি, কি দেবে দাও, যা-হোক কিছু পেলেই হলো—

কল্যাণী ব্যস্ত পায়ে চলে গেলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর রিনাকে শুইয়ে দিয়ে এ-দিকের ঘরে এলেন। অবধূত রিভলবার আর চামড়ার পাতের কেসের মতো জিনিসটা তাঁর হাতে দিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, এগুলো খুব সাবধানে রেখে দিও।

কল্যাণী দেখলেন কেসের মতো জিনিসটায় গুলি। তাঁর কপালে ঘাম দেখা দেবার দাখিল। ওগুলো শাড়ির আড়াল করে বসলেন।

অবধূত বললেন, মাকে ও-ভাবে কষ্ট দিয়ে কি পেলি—মায়ের খবর রাখিস হতভাগা?

—আমি সব খবরই রাখি জেঠু, তোমার খবরও রাখি···তুমি তিন বছরের ওপর নিপাত্তা হয়ে ছিলে, এটা আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না।

—যাক, এখন কি ব্যাপার কি অবস্থা বল। এখনো পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে?

তপু হাসল।—অন্য সব অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে এখন তো আমি আরো বড় আসামী। খুন আর অ্যাবডাকশন তুই কেসই ঝুলছে।

কল্যাণী বলে উঠলেন, তুই এ-সব করেছিস?

—নিজেকে আর রিনাকে বাঁচানোর জন্য খুন করেছি বড়মা, রিনাকে অ্যাবডাক্ট করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যে ·।

এর পরের ঘটনা শুনে তুজনেই স্তব্ধ।···বাড়ি ছাড়ার পর তপু তার দল-বল নিয়ে শেয়াল কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়িয়েছে। একদিন তুদিন নয়, তিন বছর। শেষের একটা বছর সঙ্গে রিনা।···লোক বুঝে ছোট-খাটো হামলা তারা করেছে, বিপাকে পড়ে কাউকে কাউকে জখম করেও

পালাতে হয়েছে, কিন্তু খুন কাউকে করে নি তখন পর্যন্ত। খুন কাউকে সত্যিই করতে হয় না, ভয় দেখিয়েই অনেক কাজ হাসিল করা যায়। কিন্তু শেষের দিকে যা করত সেটা কোনো রাজনীতির ব্যাপার নয়, নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদেই ওটুকু করতে হতো। ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, পুলিশের গুলি খেয়ে অনেক মরেছে, অনেকে ধরা পড়ে জেলে পচছে।

…রিনা কলকাতায় তাদের পাড়ার মেয়ে। ওর বাবা ছা-পোষা কেরানি। দুটো ছেলে আর এই মেয়ে। ছেলে দুটো তেমন লেখা-পড়ার সুযোগ না পেয়ে ফ্যাক্টরির কাজে ঢুকেছিল। বাপ তখন অসুস্থ, রিটায়ার করেছে। তপু যে-বছরে বি. এস-সি পরীক্ষা দেয় সে-বছরই রিনা হায়ারসেকেণ্ডারি পরীক্ষায় পাশ করেছিল। তপুর সঙ্গে আলাপ ছিল না, কিন্তু মুখ-চেনা ছিল। সেই তখন থেকেই পাড়ার জনাকয়েক আর বেপাড়ার একজন পয়সাঅলা গুণ্ডা গোছের ছেলে রিনার পিছনে লেগেছিল। তপু তাদের একবার আচ্ছা করে সামলে দিতে আর বেপাড়ার ওই পয়সাঅলা বড়-লোকের গুণ্ডা [illegible] আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে দিতে ওরা কিছুদিন চুপ মেরে ছিল। রিনা বাড়িতে কিছু বলে নি। বলে কি লাভ। কিন্তু তপুর প্রতি ভারী কৃতজ্ঞ ছিল। তখন একটু-একটু আলাপ ছিল।

কিন্তু তার পরেই তো তপুকে গা-ঢাকা দিতে হয়।

হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর রিনা প্রায় বছর তিনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পড়িয়ে সামান্য কিছু রোজগার করত। এই সময় একজন তাকে টাইপ শিখতে পরামর্শ দিল। কিন্তু রাত আটটার আগে রিনার ফুরসত ছিল না। প্রাইভেট টিউশনি আর বাড়িতে রান্না করে সময় পেত না। আটটা থেকে ন'টা বাড়ির আধ মাইলের মধ্যে টাইপিং স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু ওই বড়লোকের গুণ্ডা ছেলে যে এ-ভাবে ওঁত পেতে ছিল জানত না। আবার ওকে তারা উত্যক্ত করতে শুরু করেছিল। চিঠিতে হুমকি দিত। কিন্তু রিনার এ-সব গায়ে মাখলে চলবে কেন ?

টাইপ-স্কুল থেকে এক বৃষ্টির রাতে ফেরার সময় ওরা তাকে জোর করেই গাড়িতে তুলে নিল। চোখের পলকেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। রিভলবার

পিঠে ঠেকিয়ে সেই বড়লোকের গুণ্ডা ছেলের দল ওকে গাড়িতে তুলে নিল। একটু-আধটু দূরে যারা ছিল ভালো করে তারা কেউ কিছু বুঝতেই পারল না। পরে জেনেছে ওই ছেলে আগে আরো তুটো মেয়ে তুলে নিয়ে পালিয়েছে। বুকে রিভলবার ঠেকিয়ে নিজেই নিজের কেরামতির কথা শুনিয়ে রিনাকে শাসিয়েছে, মুখ বুজে থাকলে প্রাণে বাঁচবে—তু-দশ দিন পরে হয়তো বাড়িতেও ফিরতে পারবে, নইলে খতম হতে হবে ?

একটু হেসে বলল, ওদেরও কি বরাত ছ্যাখো জেঠু, ডায়মণ্ড হারবারের যে জঙ্গলে আমার ঘাঁটি তার কাছাকাছি একটা ছোট বাংলোয় রিনাকে এনে তোলা হয়েছে। আরো তো কত জায়গা আছে, রিনার বরাত ভালো না হলে ওরা ওখানেই আনবে কেন ? আমাদের তখন সর্তক প্রহরা, কে আসছে যাচ্ছে সর্ব-দিকে নজর রাখতে হয়। আমি দেখি নি, আমার দলের একজনের সন্দেহ হলো ফুর্তি করার জন্য মোটরে করে একটা মেয়েকে তুলে আনা হয়েছে, কারণ যতদূর মনে হয় রাতের অন্ধকারে জোর করেই তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ওই বাংলোয় ঢোকানো হয়েছে।

···খবর পেয়ে দলের পাঁচজনকে নিয়ে নিঃশব্দে তপু বাংলোয় হানা দিল। ওই ছেলের দল তখন একটা ঘরে মদের বোতল খুলে বসেছে, আর ওই বড়লোকের গুণ্ডা ছেলে অন্য একটা ঘরের দরজায় রিনাকে বশে আনতে চেষ্টা করছে আর হুমকি দিচ্ছে, টুঁ-শব্দ করলে বা কোনো রকম বাধা দিলে ওই ছেলেরা এসে তাকে ধরবে এবং সে যা করার ওদের সামনে করবে।

তপুর দলের ছেলেরা নিঃশব্দে গিয়ে তার সঙ্গীদের ওপর চড়াও হলো। রিভলবার তুলে ইশারায় একেবারে বোবা হয়ে থাকতে হুকুম করল। তারা যমদূত দেখে হকচকিয়ে গিয়ে নির্বাক।

রিভলবার হাতে তপু সশব্দে দরজা খুলল, রিনার পরনে তখন কেবল শায়া, ছেঁড়াখোঁড়া শাড়িটা মাটিতে পড়ে আছে। সেই অবস্থাতেই ধস্তাধস্তি চলছে। রিনা মরিয়া হয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা করছে। চমকে সেই গুণ্ডা ছেলে ছিটকে উঠে দাঁড়ালো, তু'হাত দূরে রিভলবার হাতে শমন দেখে স্থির।

···কিন্তু গণ্ডগোল করে ফেলল রিনা। আবার তাকে দেখে তপুও কয়েক

মুহূর্তের জন্য হত-চকিত। তারই মধ্যে রিনা ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে বাঁচাও বলে চেঁচিয়ে উঠল। সেই কয়েক পলকের সুযোগে ওই গুণ্ডা ছেলে পকেট থেকে রিভলবার বার করে তাক করল। রিনাকে ভয় দেখাবার জন্যেই ওটা সঙ্গে রেখেছিল বোধহয়। কিন্তু এত দিনে তপুর পিছনেও চোখ গজিয়েছে, মুহূর্তের মধ্যে তার হাতের রিভলবার গর্জে উঠল। ওই বদমায়েশের ভোগের সাধ চিরদিনের জন্য মিটে গেল। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

গুলির শব্দে কে কাকে মারল ভেবে না পেয়ে সবাই ছুটে এলো। সেই ফাঁকে ওখানকার ফুর্তিবাজরা অন্ধকারে প্রাণের দায়ে দিশেহারার মতো ছুটে পালালো। এরপর বাধ্য হয়ে রিনাকে নিয়ে তাদেরও গা-ঢাকা দিতে হয়েছে। মাঝের একদিন বাদ দিয়ে তার পরের দিন সমস্ত কাগজের প্রথম পাতায় খবর বেরুলো, চার বছর আগের নক্সালপন্থী সমাজ বিরোধী আসামী তপন চ্যাটার্জী সদলে অতর্কিতে কলকাতার ওমুক জায়গা হানা দিয়ে রিনা রায় নামে একটি অবিবাহিতা তরুণীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। জানা গেল সেখানেই তার ঘাঁটি ছিল। ওই পাড়ারই একটি তরুণ দল তাদের অন্য পাড়ার এক বন্ধুর গাড়িতে সেদিকে পিকনিকের উদ্দেশে গিয়েছিল। বিপদের আঁচ পেয়ে তারা ওই গাড়ির পিছু নেয় এবং ঘাঁটির সন্ধান পায়। মেয়েটিকে জঙ্গলে একটি পরিত্যক্ত পড়ো বাংলোয় তোলা হয়েছিল পিকনিকের দলটি হানা দিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। তপন চ্যাটার্জী গুলি চালিয়ে গাড়ির মালিক বন্ধুটিকে হত্যা করার ফলে অন্যরা পালাতে বাধ্য হয় ইত্যাদি। মৃত ছেলেটির নাম সুধীর দত্ত, বয়েস আঠাশ। এক অবস্থাপন্ন পরিবারের দ্বিতীয় এবং কনিষ্ঠ সন্তান।

...তপু রিনাকে তার বাপের কাছে যে ভাবে হোক পাঠাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রিনা একেবারে বেঁকে বসেছিল। সে আত্মহত্যা করবে তবু আর বাড়ি ফিরবে না। তপুকে বলেছে আমাকে বিয়ে কর, যে ভাবে রাখ আমি সেভাবেই থাকব। বাবার কাছে ফিরে গেলে ওই হায়নার দল আবার আমাকে ছিঁড়ে খাবে।

তপু হাসি মুখেই জেঠুকে বলেছে কলকাতায় থাকতেই রিনাকে তার ভালো লাগত। দূর থেকে দেখত। সামান্য আলাপ হবার পর আরো ভালো লেগে-

ছিল। ওই গুণ্ডার দলকে কলকাতায় একবার ঢিট করার পর থেকে রিনাও তাকে শ্রদ্ধা করত।

প্রায় একটা বছর যে কি ভাবে কেটেছে ওরাই জানে। দল তো ভেঙেই গেছে। কিন্তু গোপনে সাহায্য করার মতো অবস্থাপন্ন লোক ছিল। রিনাকে নিয়ে কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে গা-ঢাকা দিতে হয়েছে ঠিক নেই। ফলে অনেক সময়েই সাহায্য পেতে দেরি হয়েছে। তখন এক বেলা খাওয়া জোটে নি এমন সমন দিনও গেছে। নাম ভাঁড়িয়ে প্রাইভেট টিউশানি যোগাড় করে ক'দিন না যেতে ভাঁওতা দিয়ে আগাম টাকা নিয়ে সরে পড়তে হয়েছে। তপু হেসে উঠল, কিন্তু বিয়ে করলে যে আবার সাবধান হওয়া সত্ত্বেও ছেলে-পুলে আসার ঝামেলা পোহাতে হবে এ-কি আর হিসেবের মধ্যে ছিল! তাই রিস্ক নিয়ে তোমার কাছে না এসে করি কি। মায়ের কাছে রাখা যাবে না, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের নজরে পড়বে। রিনার বাবার তো এই অবস্থা, তার ওপর হারানো মেয়ে ফিরেছে জানা-জানি হলে সেখানেও একই বিপদ। আপাতত সব দায় তোমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমি সরে পড়ব···কিন্তু আমি বড় ক্লান্ত জেঠু, অন্তত পাঁচ সাত দিনের বিশ্রাম দরকার, ক'টা দিন সকলের চোখ থেকে আমাকে আগলে রাখতে পারবে না?

সমস্ত রাত অবধূত ছটফট করেছেন আর পায়চারি করেছেন। বিছানায় গা পর্যন্ত দিতে পারেন নি। পরদিন সকালে চা খেতে খেতে তপুকে বলেছেন, এখানে তোর লুকিয়ে থাকার কোনোরকম চেষ্টা করারই দরকার নেই। এখানে তোকে চেনে একমাত্র হারু তাকে সমঝে দিলে সে মুখ সেলাই করে থাকবে। আর কার্তিক নামে একটি ছেলে থাকে, সে জানবে তুই আমার নিকট আত্মীয়, মধ্যপ্রদেশে থাকিস, দরকারী কাজে বিদেশে চলে যেতে হচ্ছে বলে এখানে বউ রেখে যাচ্ছিস।

···বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে চুরিয়ে থাকলেই বরং লোকের সন্দেহ হবে। এটাই ভালো পরামর্শ মনে হলো তপুরও। কিন্তু ও ভেবে পাচ্ছিল না, জেঠু কথা যখন বলছিল, ওর মুখের ওপর তার দৃষ্টিটা এমন স্থির আর তীক্ষ্ণ কেন? মুখ কপাল সব যেন ফালা-ফালা করে দেখার চেষ্টা। জিজ্ঞেস করেছিল,

কি হলো …?

—বোস আসছি। উঠে হাত-দেখার বড় ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা নিয়ে এলেন। কিন্তু হাত নয়, একাগ্র মনোযোগে ওটা কপালের কাছে এনে আগে কপাল দেখতে লাগলেন। দেখছেন তো দেখছেনই। শুধু কপাল কেন, নাক, কান, কানের পিছন এমন কি গলা পর্যন্ত। সামনে বসে রিনাও হাঁ করে দেখছে …জ্যাঠশ্বশুরের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমছে, দুচোখ অস্বাভাবিক রক-মের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

কপাল-মুখ দেখার পর তেমনি মনযোগ দিয়ে হাত দেখতে লাগলেন। একবার জিজ্ঞেস করলেন, তোর ঠিক বয়েস এখন কত?

—একেবারে ঠিক তো বলতে পারব না, চব্বিশ চলছে। হেসে উঠল, কিন্তু জেঠু রাগ কোর না—এসব আমি কিছুই বিশ্বাস করি না।

অবধূতের পাথর মূর্তি।—তোর বিশ্বাসের দরকার নেই, আমি নিজের বিশ্বাসের কিছু খুঁজছি। এই দেখার ঝোঁকে এক ঘণ্টারও বেশি কেটে গেল। অবধূত তার পরেও গম্ভীর। কেবল পায়চারি করছেন। কপালে ঘাম। মাঝে মাঝে আরো দুই একবার তপুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। চাউনি তেমনি তীক্ষ্ণ, তীব্র। তপু ধরেই নিল, শিগগীর তার ফাঁড়া-টাড়া অর্থাৎ ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা জেঠু তাই দেখছে। হয়তো তার বিবে-চনায় ভালো দেখছে না বলেই এত উতলা এমন গম্ভীর। কিন্তু তপু বে-পরোয়া, জীবন-মৃত্যুর মাঝখানেই তো কবে থেকে দাঁড়িয়ে আছে।

কেবল কল্যাণী বুঝছেন। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন, কেমন দেখছ?

—পরিষ্কার। আগে সাহস করে সেভাবে দেখি নি কখনো, কিন্তু এখন মনে হয় আগের থেকেও ঢের বেশি পরিষ্কার। কিছু সময়ের জন্য ঝামেলা তারপর সব পরিষ্কার, দীর্ঘ আয়ু…কেবল একটু শোকের চিহ্ন আছে, সেও ওর নিজের বা রিনার শরীরগত কিছু নয়। কোনো নিকট জনের কিছু হতে পারে।

…ইতি মধ্যে এক ফাঁকে তিনি রিনার হাত আর কপালও যত্ন করে দেখেছেন।

কল্যাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার নিজের দেখা আর

বিশ্বাস নিশ্চয় ঠিক, শিবঠাকুর নিশ্চয় আর আমাদের বা বকুলকে কোনো বড় দুঃখের মধ্যে ফেলবেন না।

পেটো কার্তিক এসে দেখল এবং জানলো বাবার বাড়িতে আত্মীয় অতিথি এসেছে, তাকে ক'দিন রাতে বোসেদের বাড়িতে থাকতে হবে। স্ত্রী নিয়ে বাইরের ভক্তরা কেউ দু'পাঁচ দিন বাবার কাছে গেলেও তাকে রাতে বোসেদের বাড়িতে আস্তানা নিতে হয়। কিন্তু সে-জন্য নয় কার্তিক হত-ভম্ব আর উতলা বাবার মধ্যে একটা চাপা অস্থিরতা আর উত্তেজনা দেখে। আধফর্সা মুখ সর্বদা লাল, কোনো কাজে মন দিচ্ছেন না, কেবল ভাবছেন আর পায়চারি করছেন।

শনি মঙ্গলবার নয়, পর পর তিন রাত তিনি শ্মশানে কাটিয়েছেন। তাঁকে দেখে মনে হয়েছে জীবনে তিনি এমন সমস্যার মধ্যে কখনো পড়েন নি। কেবল পায়চারি করেন আর ভাবেন! সন্ধ্যার পরেই শ্মশানে চলে যান। ঘাবড়ে গিয়ে কার্তিক মাতাজীকেই জিজ্ঞেস করেছে, মা বাবার হঠাৎ হলো কি—অসুখে পড়ে যাবেন যে!

মাতাজীও ভীষণ গম্ভীর। দু'কথায় জবাব দিয়েছেন, জানি না।

তপুও একটু অবাক হয়ে বলেছে, জেঠু যে আজকাল দেখি প্রায় শ্মশান-চারী হয়ে পড়েছে—তিন বছরের ওপর বাইরে কাটিয়ে আসার পর থেকেই এ-রকম হয়েছে বুঝি?

কল্যাণী জবাব দেন নি।

সেই রাতে অবধূত রিনাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। সে আসতে হাসি মুখেই বললেন, বোস—।

রিনা কাছে বসে জিজ্ঞেস করল, আজ আপনার শ্মশান যাওয়া নেই?

—না, আজ আর না।...আমার শ্মশান যাওয়া নিয়ে তপু কিছু বলে-টলে নাকি?

—বলে এ-রকম করলে শরীর ভেঙে যাবে, বড়মা'র বাধা দেওয়া উচিত। ...আপনাকে যত ভালোবাসে আর শ্রদ্ধা করে পৃথিবীতে এমন আর কাউকে না।

অবধূতের গলার স্বরে কৌতুক।—কি রকম?

রিনা হেসে জবাব দিল, বলে দেবতা-টেবতা জানিও না বিশ্বাসও করি না, নরদেবতায় বিশ্বাস করি—আমার কাছে জেঠু সেই দেবতা।

অবধূত হেসে উঠলেন, শুনে তোমার কি মনে হলো?

—আমারও তাই বিশ্বাস করতে ভালো লাগল।

সেই রাতেই অবধূত বেশ একটা মজার অনুষ্ঠান করলেন। নিজে বসে তপু আর রিনার আনুষ্ঠানিক বিয়ে দিলেন। বললেন, বিয়ের খাওয়া কাল দুপুরে।

এক কল্যাণী ছাড়া আর কেউ জানেন না, শেষ রাতে উঠে অবধূত নিঃশব্দে বাড়ি ছেড়ে বেরুলেন। যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়া করাই ছিল, ট্যাক্সি যেখানে অপেক্ষা করার কথা সেখানেই অপেক্ষা করছে। সকাল পাঁচটার মধ্যে তিনি এসে দরজার কড়া নেড়ে বকুলের ঘুম ভাঙালেন।—এই সময়ে বকুল তাঁকে দেখে বিষম চমকে উঠেছিল। অবধূত ভিতরে এসে বসলেন না, কেলল বললেন কোনো ভয় নেই, তপু এসেছে, আমার কাছে আছে আজই চলে যাবে, তুমি খেয়ে দেয়ে বেলা একটা দেড়টার মধ্যে চুপচাপ কোন্নগরে আমার বাড়ি চলে যাবে—এখন আর কোনো কথা নয়, আমাকে একটা দরকারে কাজে এক্ষুনি এক জায়গায় যেতে হবে।

বকুল বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে। অবধূত বেরিয়ে এসে আবার ট্যাক্সিতে উঠলেন। সেখান থেকে সোজা পার্ক স্ট্রীটে তাঁর এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের কোয়ার্টার্স-এ। তার বদ্ধ পাগল মেয়েকে তিনি ভালো করে-ছিলেন। সেই থেকে ওই পরিবারটি তাঁর বিশেষ ভক্ত এবং অনুগত। তাঁকেও ঘুম ভাঙিয়ে তোলা হলো। অবধূত তাঁর সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলে ভোর সাড়ে ছ'টার মধ্যে আবার ট্যাক্সিতে।

সাড়ে আটটার মধ্যে একরাশ বাজার করে আবার কোন্নগরে নিজের বাড়িতে। তপু আর রিনা ভাবল জেঠু এই বাজার করতেই সকালসকাল বেরিয়েছিল! পেটো কার্তিকও তাই ভেবেছে।

খুব ফুর্তির মধ্যেই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো। খানিক বাদেই তপু আর রিনা—হতবাক। কলকাতা থেকে বকুল-মা এসে হাজির। তপু আকাশ থেকে পড়ল, মা তুমি এখানে, এ কি কাণ্ড। বকুলও তেমনি

অবাক। হকচকিয়ে গিয়ে বলল, কেন, দাদা যে সকালে নিজে গিয়ে তুই এসেছিস বলে আমাকে আসার কথা বলে এলেন।

অবধূত হেসে তাদের নিরস্ত করলেন, এ-সব নিয়ে পোস্টমর্টেমের দরকার নেই—বকু, এই তোমার ছেলের বউ রিনা, ছাখ কি মিষ্টি মেয়ে?

বকুল আবারও বিমূঢ়।

বিকেল চারটের মধ্যে শুধু বাড়ির লোক কেন, পাড়াসুদ্ধু হতচকিত। অবধূতের বাড়ি পুলিশে ঘেরাও করেছে। রিভলভার উঁচিয়ে পাঁচজন পদস্থ কর্মচারী এসে তপুকে হাত-কড়া পরিয়ে গ্রেপ্তার করল। আর সকলেই হতভম্বের মতো দেখল, তাদেরও যে ওপরওলা তিনি অবধূতের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

নির্বাক নিস্পন্দ সকলে। বকুল আর রিনা থর-থর করে কাঁপছে। তারা বিবর্ণ পাংশু। তপুই সকলের আগে ব্যাপার বুঝেছে। দুচোখে গলগল করে ঘৃণা ঠিকরোচ্ছে। পৃথিবীর আর যে-কেউ এমন বিশ্বাসঘাতকতা করলে এত বজ্রাহত হতো না, এত ঘৃণা করত না। সেই ঘৃণার আগুন শুধু চোখে নয়, গলা দিয়েও ঠিকরোচ্ছে।—তুমি? তুমি? তুমি এ-কাজ করেছ তাহলে? এই জন্যেই ভোর না হতে তোমার কলকাতায় ছোটা দরকার হয়েছিল? আমার মা-কেও এমন দৃশ্য দেখাবার লোভ সামলাতে পার নি?

তাকে তুলে নিয়ে যাবার আগে আরো বলেছে। বলেছে, কাউকে হত্যা করার জন্য আমি কখনো অস্ত্র হাতে তুলি নি, কেবল দুজনের প্রাণ বাঁচাতে একটা খুন করেছি—কিন্তু জেনে রেখে দাও যদি আমার ফাঁসি না হয় আর যদি আমি কখনো ফিরি আর তোমার ঈশ্বর যদি ততদিন বাঁচিয়ে রাখে—খুব ঠাণ্ডা মাথায় আমি আর একটা হত্যা করব···সেদিন কোন্ ইষ্ট তোমাকে রক্ষা করতে পারে আমি দেখব।

তপুকে নিয়ে ওরা চলে গেল।

ধুপ করে একটা শব্দ হতে সকলে সচকিত হয়ে দেখে রিনা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। অবধূতই আগে ছুটে এসে তাকে তুলে ধরতে গিয়ে বাধা পেলেন। বিকৃত গলায় বকুল বলে উঠল, ও যেমন আছে থাক, আপনি আগে বলুন তপু এ কি বলে গেল—যা বলে গেল

তা ঠিক কিনা ?

বজ্র-গম্ভীর ধমকের সুরে অবধূত বলে উঠলেন, সেটা জানতে বুঝতে হলে একটু অপেক্ষা করতে হবে—আমি কেন কি করেছি এই স্নায়ু নিয়ে বোঝা তোমার পক্ষেও সম্ভব নয়। পেটো কার্তিকের দিকে তাকিয়ে হুংকার ছাড়লেন, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, জল নিয়ে আয়!

ওই মুখের দিকে চেয়ে বকুল বিহ্বল বিভ্রান্ত। বাবার এই মূর্তি কার্তিকও কখনো দেখে নি। সে উর্ধ্বশ্বাসে জল আনতে ছুটল।

রিনা ঠাকুরঘরে শুয়ে আছে, কল্যাণীর কোলে তার মাথা। জলের ঝাপটায় জ্ঞান ফিরতে অবধূতের ইশারায় কল্যাণী তাকে এ-ঘরে নিয়ে এসেছে। তার বিমূঢ় দৃষ্টি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে সে কেবল ভয়ংকর রকমের দুঃস্বপ্ন দেখে উঠেছে একটা।

অবধূত শোবার ঘরে গেছলেন, একটু বাদে ফিরে এলেন। থমথমে মুখ, ঘরে পাড়ার দু'একজন মহিলা ছিল। তাঁদের বললেন, আপনারা এখন বাইরে যান মা, আমার এ-ঘরে একটু কাজ আছে। তাঁরা তক্ষুনি চলে গেলেন। অবধূত পেটো কার্তিক আর হারুকেও চলে যেতে বললেন। তারপর দু'হাত কোমরে তুলে ঝুঁকে রিনার দিকে তাকালেন। খুব কোমল গলায় বললেন, একটু ভালো বোধ করছিস তো মা···? তোর বড় মায়ের ঠাকুরঘরে দাঁড়িয়ে বলছি, আমি কি এমন কিছু করতে পারি যাতে তপুর —আমাদের একমাত্র বংশধরের এতটুকু ক্ষতি হয়—এর পরের ম্যাজিক তোকে আর তোর শাশুড়িকে যদি আমি না দেখাতে পারি, তাহলে এই ছ্যাখ, এটা চিনিস ?

রিনার মুখে কথা নেই। চিনেছে। তপুর সেই রিভলবার। বকুল বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছে। তার দিকে চেয়ে অবধূত বললেন, এটা তোমার ছেলের, তপু আমাকে রাখতে দিয়েছিল, গুলিও আছে।···শোনো বকুল, রিনা শোন্—আমি যা করেছি সেটাই যদি তপুর বাঁচার একমাত্র পথ না হয়, খুব শিগগীরই সমস্ত অপরাধের দাগ ধুয়ে মুছে ফেলে সুস্থ জীবনের পথ ধরে তোমাদের কাছে ফিরে না আসে—তাহলে এই ঘরে দাঁড়িয়ে

আমার মহাগুরুর নাম নিয়ে শপথ করছি—আমার জীবনের সমস্ত শিক্ষা ভুল জেনে তপুর দেওয়া এই জিনিস দিয়েই আমি আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করব। তীব্র চোখে কল্যাণীর দিকে তাকালেন, তুমি কি বলো? ওদের শুনিয়ে দাও—আমার এ শপথ তুমিও মেনে নেবে কি নেবে না?

কল্যাণী স্থির চোখে তাঁর দিকে তাকালেন। বললেন, মেনে না নিতে বাধা কোথায়, তুমিও জানো আমিও জানি এ-শপথ রক্ষা করার দরকার হবে না। গুরুর আদেশ যা পেয়েছ তা মিথ্যা হতে পারে না।

রিনা আস্তে আস্তে উঠে বসল। সে বা বকুল কেউ কিছু বুঝছে না। এই দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে বুকের তলায় কি যেন একটু আশার মতো উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

অবধূত নিজেও আস্তে আস্তে তাদের সামনে মেঝেতে বসলেন। বললেন আমি যা করেছি তা না করলে শেয়াল কুকুরের মতো তপুকে যারা তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তাদের কারো গুলিতে খুব শিগগীরই তার মৃত মুখ আমাদের দেখতে হতো, মা হয়ে তোমাকে বা জ্যাঠা হয়ে আমাকে তার মুখাগ্নি করতে হতো।

গলা দিয়ে অস্ফুট একটা আর্ত শব্দ বার করে বকুল শিউরে উঠল।

অবধূত বলে গেলেন, ওই রিনাকে জিজ্ঞেস করো কি যন্ত্রণা আর উদ্‌বেগ নিয়ে আমি তপুর আর ওর কপাল দেখেছি আর হাত দেখেছি। কেউ যেন তপুর সমূহ একটা ফাঁড়া আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। প্রাণঘাতী ফাঁড়া, কিন্তু আবার সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবার লক্ষণও স্পষ্ট। তারপর সুস্থ সুন্দর লম্বা স্বাভাবিক জীবন। রিনার হাত বা কপালেও কোনোরকম বৈধব্যের বা দীর্ঘদিন স্বামীর কারণে দুর্ভোগের চিহ্ন নেই। যা আছে সেটা সাময়িক, বড় জোর পাঁচ ছ'বছরের। একটু বাদেই বুঝলাম, কি হলে বা কি করলে এমন একটা ফাঁড়া কেটে যেতে পারে। ও ধরা দিলে পুলিশের হাতে গুলি খেয়ে মরার ভয় নেই। আর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও ওর হতে পারে না, তাহলে সুস্থ সুন্দর লম্বা স্বাভাবিক জীবন যাপনের এমনসব স্পষ্ট চিহ্ন থাকত না।

...ক'টা দিন আমার কি যে সংকট গেছে তোমরা জানো না। যদি

আমার বিচারে ভুল হয় তাহলে সর্বনাশ, আর ভুলের ভয়ে যদি চুপ করে বসে থাকি তাহলে আরো সর্বনাশ। তপু রিনা তুজনেই জানে তিন-তিনটে রাত এরপর আমি শ্মশানে কাটিয়েছি। আমার মহাভৈরবগুরুর কাছে ভৈরবী মায়ের কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করেছি, আমার মন স্থির করে দাও, আমার দৃষ্টি আরো মুক্ত করে দাও—আমার সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে আমাকে শুধু সত্য দেখার শক্তি দাও। তাই তাঁরা দিয়েছেন। নিজের ভিতরে থেকেই গুরুর গলা কানে এসেছে, হতভাগা দেরি করছিস কেন —আয়ু আছে তবু ছেলেটা বেঘোরে মরবে! ও ছেলে নিষ্পাপ ওর ক্ষতি কে করবে—কেবল কল্যাণীকে সব বলেছি। সে-ও আমার সঙ্গে একমত। বলেছে ভুল হতে পারে না, তুমি যা করার করো।

···কাল রাতে ওদের আমি নিজের মনের মতো করে বিয়ে দিয়েছি। রাত থাকতে উঠে ট্যাক্সি নিয়ে তোমার কাছে চলে গেছি। সেখান থেকে আমার ভক্ত এই মস্ত পুলিশ অফিসারের কাছে গেছি। তাঁকে কেবল একটু অনুরোধ করেছি, লক-আপে তপুর ওপর যাতে কোনো রকম অত্যাচার না হয় সে দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে। সব শোনার পর তাঁরও মনে আশঙ্কা। জিজ্ঞেস করেছেন, ফাঁসী না হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে না আপনি ঠিক জানেন?

বলেছি ঠিক জানি।

এর পরের অধ্যায় কিছুটা গতানুগতিক। অবধূত একদিনের জন্যও কোর্টে যান নি। আসামী তপন চ্যাটার্জীকে বুঝতেও দ্যান নি, তার হয়ে সওয়াল করার জন্য এমন একজন নামজাদা উকিল কে দিলে—কে এমন জলের মতো টাকা খরচ করছে। নিজের উকিলকেই সে এ-কথা জিজ্ঞেস করেছিল। উনি বলেছেন, তপুরই একজন মস্ত বড়লোক বন্ধুর বাবা—নাম বলতে বাধা আছে। তপু অবিশ্বাস করে নি, আঁচও করেছে কে হতে পারে, এ-রকম একজন বিরাট অবস্থাপন্ন বন্ধু তার আছে—মা তাকে জানে— মায়ের চেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে খুনের কোনো অভিযোগই শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি। বাপের বাড়ির

পাড়ার যে ছেলেরা মৃত গুণ্ডা সুধীর দত্তর দল থেকে রিনাকে অপহরণ করেছিল, পুলিশ তাদের ওপর চড়াও হয়ে কোর্টে টেনে এনেছে। রিনা তাদের সনাক্ত করেছে। অবধূতের পুলিশ অফিসারের দাপটে তাদের হৃৎকম্প। কোর্টে তারা অপরাধ স্বীকার করেছে। জেরায় পড়ে সুধীর দত্ত আরো কিছু কুকার্য ফাঁস করে দিয়েছে। তপুর উকিল এটাও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন যে আত্মরক্ষা আর রিনাকে রক্ষা করার জন্যই তপন চ্যাটার্জী সুধীর দত্তকে গুলি করতে বাধ্য হয়েছিল। রিনা শান্ত মুখে সুন্দর সাক্ষী দিয়েছে।

তপন চ্যাটার্জী শেষ পর্যন্ত খুনের দায় থেকে রক্ষা পেল বটে। আর পুলিশের ভক্ত অফিসারটির চেষ্টায় নক্সালের ছাপটাও উবে গেল। সমাজ-বিরোধীর কার্যকলাপ আর লুঠতরাজের অভিযোগ খণ্ডন করা গেল না। বিচারের দায়ে তার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হলো।

তাকে ভ্যানে তোলার সময় ব্যাকুল মুখে যতটা সম্ভব ভিড় ঠেলে সামনে গেছল। তপু চেঁচিয়ে বলেছে, মা জেঠুকে এবার তৈরি থাকতে বোলো। মা আর রিনার প্রতিক্রিয়া বোঝার আগেই পুলিশ তাকে ভ্যানে টেনে তুলেছে।

বকুল এরপর অনেকবার অনুনয় করে বলেছে, দাদা, তপুর সঙ্গে আমার একবার দেখা করার ব্যবস্থা করে দিন, সব বলে তো ওর ভুল ভাঙাতে হবে।

অবধূত হাসি মুখে তাকে নিরস্ত করেছেন।—কিচ্ছু দরকার নেই, সময়ে সব হবে। পাঁচ বছরের জন্য আমার ওপর তোমরা ওকে জ্বলতে দাও, আখেরে তাতে দু'তরফেরই লাভ বই লোকসান হবে না।

বকুল আর রিনা তাঁর এ-কথা আদেশ বলেই মেনে নিয়েছে।

অবধূত শাশুড়ী-বউয়ের থাকার জন্য সেই বড় পুলিশ অফিসার ভক্তর মারফৎ ভালো একটা ফ্ল্যাটও যোগাড় করেছেন। রিনার সন্তান কোন্ নার্সিং হোমে হবে, কোন্ ডাক্তার দেখবে সে সব ব্যবস্থাও তিনি নিজে করেছেন। তাঁর কথায় বকুল জলের দরে তার শেলাইয়ের দোকান বিক্রি করে দিয়েছে। অবিশ্বাসের আর ঠাঁই কোথায়? দাদা বলেছেন, জেল

থেকে বেরুলেই তপুকে হরিদ্বার আর দেরাহুনে গিয়ে সকলকে নিয়ে পাকাপাকি ভাবে থাকতে হবে—তপুর জন্য সেখানে একটা ভালো কাজ তিনি ঠিক করেই রেখেছেন। না কলকাতায় বা কোথাও কোনো রকম রাজনীতির হাওয়ার মধ্যে তপুকে তিনি আর রাখবেন না। আপাতত সব খরচ তাঁর।

...তপুর জন্য উনি হরিদ্বার আর দেরাহুনে ভালো কাজ ঠিক করেছেন তা-ও বক্রেশ্বরে মহাভৈরব বাবার ডেরায় বসেই শুনেছি। আজ নয়, বহু বছর আগেই, তপুর যখন মাত্র ষোলো সতেরো বছর বয়েস—তখন থেকেই এ সংকল্প তাঁর মাথায় ছিল। তপু ওই বয়সে নক্সালদের সঙ্গে আর আরো কাদের সঙ্গে মিশছে শোনার পর থেকেই তাঁর দুশ্চিন্তা। তখনই ঠিক করেছিলেন ওকে কলকাতায় রাখবেন না। কিন্তু তখনো প্ল্যান কিছু ঠিক হয়নি। সেই সময় হরিদ্বারের ভক্ত পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী—বাবার দয়ায় যার সেখানে এখন তিন-তিনটে হোটেল—সে দেখা করতে এসেছিল। কথায় কথায় ভাইপোর কথা শুনে সেই সোৎসাহে প্রস্তাব দিয়েছিল, তার হাতে ছেড়ে দিলে ওই ভাইপোর দায়িত্ব সে নেবে। পাঁচ-সাত বছর শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে সব কটা হোটেলের জন্য একজন জেনারেল ম্যানেজার পোস্ট করে তাকে বসিয়ে দেবে। বাবার ভাইপোকে পেলে সে বর্তে যাবে।...

তপুর বিচারের রায় বেরুবার পর পূর্ব কথা স্মরণ করিয়ে অবধূত তাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠি পেয়েই সে সানন্দে জবাব দিয়েছে, আগের ব্যবস্থা তো ঠিক আগেই। এখন সে দেরাহুনেও একটা আধুনিক হোটেল করার কথা ভাবছে। বাবার ভাইপোকে পেলে সে নির্দ্বিধায় সেটা করবে আর সব কটা হোটেলের জেনারেল ম্যানেজারের পদে তাকে বসিয়ে দেওয়া ছাড়াও দেরাহুন হোটেলের চার আনার লাভের অংশও লিখে দেবে। বাবা সত্বর ভাইপোকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, বিশ্বস্ত আপনার-জনের তার বড় অভাব। ফলে ভাইপোর সম্পর্কে অবধূত তাকে আবার বিস্তারিত লিখেছেন। তার উত্তরে পুরুষোত্তম ত্রিপাঠী জানিয়েছে, বাবার ইচ্ছেই তাঁর কাছে আদেশ—সে অপেক্ষা করবে।

একটু হেসে অবধূত বলেছিলেন, মানুষের মন কোথায় নামে আবার কত

ওপরেও ওঠে দেখুন।···মাস ছয় আগে পুরুষোত্তম হরিদ্বার থেকে কোন্নগরে এসে হাজির। ভাইপোকে নেবার তাগিদ আমার থেকে তার বেশি। তার সব ব্যবস্থা পাকা, দেরাদুনে জমি কিনে আধুনিক হোটেলের বাড়ির কাজও শুরু হয়ে গেছে—আমার ভাইপোর অপেক্ষায় এখন সে উন্মুখ হয়ে আছে।···আমি ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কত মাইনে দেবে? তাইতেই ঘাবড়ে গিয়ে আমতা-আমতা করে চলেছে, ভেবেছিলাম শুরুতে মাসে তিন হাজার টাকা করে দেব, আর বছরে নতুন হোটেলের চার আনা অংশ···তবে বাবা যদি আরো বাড়াতে বলেন, আমি সেটাই ঠিক ধরে নেব। আমিই উল্টে লজ্জা পেয়েছি, তুমি যা ভেবেছ সেটা ঠিকের থেকেও অনেক বেশি।

···রিনার একটি মেয়ে হয়েছে। এখন সাড়ে চার বছর বয়েস। বেশ ফুটফুটে মেয়ে শুনলাম।

এরপর কেবল সেই দিনটির প্রতীক্ষা সকলের। তপুর জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রতীক্ষা।

৯

মনের তলায় আর কোনো রকম উৎকণ্ঠা বা উদ্‌বেগ ছিল না। কেবল এমন এক জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক দেখার জন্য ভিতরটা উন্মুখ হয়ে ছিল।

বক্রেশ্বর থেকে দুদিন আগেই ফিরেছি আমরা। যদিও অবধূত জানতেন তপু নির্দিষ্ট দিনের আগে ছাড়া পাবার কোনো তদ্‌বিরই করবে না। তাঁর দিক থেকে আরো দুটো দিন থেকে যাবার সদয় আমন্ত্রণ আসবেই জানতাম। বলেছেন, আরো দুটো দিন থেকে শেষ দেখে যান, তপুটার জন্য আপনাকেও কটা দিন কাছে পেলাম।

কাছে পাওয়ার আনন্দ তাঁর বেশি কি আমার সে-কথা আর তুললাম না। আমি সানন্দে রাজি।

সেই দিন এলো। আমি আর অবধূত সামনের বারান্দায় বসে। কল্যাণী মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছেন আবার কাজে চলে যাচ্ছেন। পেটো কার্তিক ঘন ঘন ঘর বার করছে, আর চাপা উত্তেজনায় এক-একবার আমাদের দিকে থমকে থমকে তাকাচ্ছে! সক্কালে এখানে এসেই বলেছে, দোকানে বলে এসেছি আমি আজ যাচ্ছি না—

অবধূত জিজ্ঞেস করেছেন, কেন আজ কি?

—আজ আপনার জামার পকেটে ওই রিভলবার কেন?

—আমার পকেটে রিভলবার বলে তুই দোকান কামাই করবি?

—হুঁঃ, আপনার পকেটে রিভলবার জানলে তামাম কোন্নগরের লোক দোকান-পাট বন্ধ করে এখানে ছুটে আসবে।

অবধূত বলে উঠেছেন, ও বাবা অত দরকার নেই, আমাকে রক্ষা করার জন্য তুই একলা থাকলেই যথেষ্ট।

আমদের হাব-ভাব দেখেই হয়তো কার্তিকের মনে এখন খুব একটা দু-র্ভাবনা নেই।···কিন্তু পুলিশে ধরিয়ে দেবার ফলে যে আত্মীয় বলে গেছে জেল থেকে বেঁচে বেরুতে পারলে তার প্রথম কাজ হবে বাবাকে খুন করা—সেই লোক আজ জেল-ফেরত এখানে আসছে—কার্তিক উত্তেজনা চেপে রাখে কি করে? তাছাড়া বাবার কাণ্ডর কি কোনো কিছু বোঝার উপায় আছে—এইদিনে তাঁর পকেটের ভারী জিনিসটা যে রিভলবার সে কি ও জানে না!

পৌনে দশটায় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। নিজের অগোচরে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। পেটো কার্তিক গেটের সামনে। গাড়ি থামার আওয়াজ পেয়ে কল্যাণীও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। অবধূত চেয়ারে গা ছেড়ে বসে আছেন।

প্রথমে নাতনীর হাত ধরে বকুল নামল। তারপর রিনা। শেষে তপন—তপু।

আমি দেখছি। দোহারা লম্বা মিষ্টি চেহারা, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। দূর থেকে তার দৃষ্টি চেয়ারে বসা জেঠুর দিকে।

পেটো কার্তিক তাড়াতাড়ি বাঁশের গেটটা খুলে দিল।

ওরা এলো। একে একে দাওয়ায় উঠল। অবধূত এইবার উঠে দাঁড়ালেন। নাতনীর হাত ছেড়ে প্রথমে বকুল অবধূতের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল! তারপর রিনা। তপু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে অবধূত তার দিকে এগিয়ে দিলেন। গম্ভীর।—নে, লোড করা আছে।

তপু থমকে দাঁড়ালো। অপলক চেয়ে রইল খানিক। অবধূতও। একটা উদ্গত অনুভূতি দমন করতে না পেরে তপু তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। দু পা জড়িয়ে ধরে কপাল ঘষতে লাগল।

অবধূত মিটি মিটি হাসছেন।—দিনেরবেলায় সকলের চোখের ওপর বুক ফুলিয়ে চলে আসতে তাহলে ভালোই লাগছে বলছিস?

···এমন এক দৃশ্য দেখার ভাগ্য কি জীবনে বেশি আসে? বকুলের চোখে জল। রিনার চোখে জল। পেটো কার্তিকের চোখের কোণও চিকচিক করছে। কেবল কল্যাণী অল্প অল্প হাসছেন আর তপুর দিকে চেয়ে আছেন। আর অবধূত হাসছেন আর তপুকে দেখছেন।

তপু তখনো অবধূতের পায়ে কপাল ঘষছে।

আরো একটা বছর ঘুরেছে। তার মধ্যে প্রথম ছমাসে অবধূতের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নি, ফোনে দু চারবার কথা হয়েছে। কয়েক ঘণ্টার জন্য পেটো কার্তিক একবার এসেছিল। কলকাতায় কি কাজ পড়েছিল সময় করে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেছল। তখন খুবই বিমর্ষ দেখেছি ওকে। বলেছে, বাবা আর মাতাজী কিছু একটা মতলবে আছেন সার · আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কোন্নগরের বাড়িতে মাঝে মাঝে কোথাকার সাধুরা আসছে—কোনো সঙ্ঘ-টঙ্ঘের হবে কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই বাবার ধমক, তোর সবই জানতে হবে তার কি মানে। তারপর কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ মাতাজী তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে আমার আর সুষমার নামে চল্লিশ হাজার টাকা ট্রান্সফার করে বসলেন, আর হারুর নামে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে দিলেন—এ-সব কি ব্যাপার বলুন তো, আমার দারুণ অস্বস্তি হচ্ছে—

বলেছি, সুখবর তো, অস্বস্তির কি আছে। তাছাড়া টাকা থাকলে সময়ে বিলি ব্যবস্থা করাই তো উচিত।

কিন্তু এ-কথায় পেটো কার্তিকের দুশ্চিন্তা লাঘব হয় নি।

···আমারই কি হয়েছে?

গেলবারের কালীপুজোর রাতে কথায় কথায় ভদ্রলোক বলেছিলেন, তাঁর একটি কর্মের গাছে কোন্ ফল ধরে—বিষফল না অমৃত, তাই দেখার প্রতীক্ষাতে বসে আছেন। যে-ভাবে বলেছিলেন মনে হয়েছে তারপরেই তাঁর কাজ শেষ—ছুটি। অমৃতফলই যে ধরেছে, এক দুখিনী মা তার ছেলে পেয়েছে, জীবন-যুদ্ধে জর্জরিত এক মেয়ে নির্ভয় হবার মতো স্বামী পেয়েছে।···তারপর থেকেই আমার মনের তলায় একটা অনাগত শংকা থিতিয়ে ছিল। যাঁকে অনেক ভাগ্যে হঠাৎ পেয়েছি তাঁকে হঠাৎই হারানোর শংকা।

এবারে অবধুতের বাড়িতে আর কালীপুজো হয় নি। কর্ত্রী নেই, কর্তা নেই, কে করবে কালীপুজো? বছরের পরের ছমাস ধরেই তাঁদের বাড়ি তালাবন্ধ।···তাঁরা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রী হয়েছেন এ-রকম চিন্তা অবশ্য তখন ছিল না। আমার বা পেটো কার্তিক কারোরই না। কারণ তার বাবা-মা দুজনেই দেরাদুন ছুটেছিলেন তপুর মেয়েটার মারাত্মক অসুখের খবর পেয়ে। বকুল আর রিনা কাকুতি-মিনতি করে ওঁদের লিখেছিলেন পত্র পাঠ চলে আসতে—তাঁরা না এলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাঁদের দু-জনকেই ছুটতে হয়েছে। মাস তিনেক পর্যন্ত তিনখানা করে চিঠি লিখে কার্তিক হয়তো একখানা চিঠির জবাব পেয়েছে—তপুর মেয়ের খবর ভালো নয়, এখন নড়তে পারছেন না, কবে পারবেন তা-ও জানেন না। পেটো কার্তিক এসে অভিমান ভরে আমাকে খবরটা জানিয়ে গেছে। বলেছে, আত্মীয় এমনই জিনিস সার, যে-মাতাজী কোথাও নড়েন না তিনিও আত্মীয়ের টানে তিনমাস ধরে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বসে আছেন।···না, তপুর মেয়ের কি অসুখ কি বৃত্তান্ত বাবা সে সম্পর্কে কিছুই লেখেন নি।

···আরো তিনমাস বাদে পেটো কার্তিক একদিন আমার কাছে এসে হাউ-

মাউ করে কেঁদেছে। বাবার কাছে চিঠি লিখে-লিখে জবাব না পেয়ে ও পুরুষোত্তম ত্রিপাঠীকে লিখেছিল। তার জবাব এসেছে। বাবা আর মাতাজী তিনমাস যাবৎ দেরাদুন বা হরিদ্বারে নেই। তার ধারণা ছিল তপুবাবুর মেয়েটি মারা যাবার পরে তাঁরা কোন্নগরেই ফিরে গেছেন।

শুনে একটু চমকে উঠেছিলাম। কারণ কি একটা শোনা কথা যেন কানে বাজছে।···হ্যাঁ কংকালমালী মহাভৈরবের ডেরার দাওয়ায় বসে অবধূতই বলেছিলেন। তপুর প্রসঙ্গে অমন সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত নেবার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ওর কপাল আর হাত দেখার কথা।···মনে হয়েছিল, আগের থেকেও ঢের বেশি পরিষ্কার। কিছু সময়ের জন্য ঝামেলা তারপর সব পরিষ্কার—সুস্থ জীবন, দীর্ঘ আয়ু···কেবল একটু শোকের চিহ্ন আছে··· কোনো নিকটজনের কিছু হতে পারে। হ্যাঁ এ-কথাই অবধূত বলেছেন, তখনকার উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তায় সেই নিকটজন কে হতে পারে তা নিয়ে অবধূত মাথা ঘামান নি।

প্রীতিভাজনেষু,

এখানে একটিই বাগ্‌দেবীর পুজো অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। জনাকতক নবীন-প্রবীণ সাধু আর জনাকয়েক বাঙালী অবাঙালীর আড়ম্বরশূন্য ছোট ব্যাপার দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। বড় ভালো লাগছিল। হঠাৎ এই দিনে আপনাকেই কেন মনে পড়ল জানি না। আমার সাময়িক আবাস অর্থাৎ চালা-ঘরে ফিরে এসে লিখতে বসলাম। এখনো এখানে বেশ শীত, আমার রসনা ভালো জিনিস পেলে এখনো সিক্ত হয় জেনেই বোধহয় কল্যাণী সুগন্ধ আতপ, মুগের ডাল আর নানাবিধ আনাজ সেদ্ধ সহযোগে কাঁচা উনুনে কিছু চাপিয়েছে। লিখতে বসে বেশ সুঘ্রাণ নাকে আসছে। হঠাৎ একটু টিপ্পনীর স্বর শুনলাম, এখনো আবার পিছু টান কেন···কাকে?

কলম থামিয়ে তাকালাম। আমি তো মশাই লেখক বা কবি-টবি নই, তার ওপর কল্যাণীর এখন আমাকে মনের ঘরে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার সংকল্প—তাই আপনাদের সংসার সর্বস্ব মানুষের মতো ভালো লাগাটা আমার উচিত নয়। কিন্তু কি করব, কল্যাণীর স্নান-সারা, পিঠে খোলা চুল ছড়ানো স্নিগ্ধ মূর্তিটি বড় ভালো লাগল—হাতে আবার খিচুড়ি নাড়ার খুন্তি গোছের একটা কি। শিশির-ছোঁয়া তাজা যুঁই ফুলের

মতো লাগছিল ওকে। আপনি হলে আরো ভালো উপমা দিতে পারতেন। বললাম, কাকে লিখছি!

শুনে আক্ষেপসূচক মিষ্টি বাক্য—আ-হা, ভদ্রলোক হয়তো খুব ভাবছেন আমাদের জন্য—লেখো।

বুঝুন, পিছু-টান নাকি কেবল আমার।

ওপরের ঠিকানা দেখে হয়তো অবাক হচ্ছেন। কিন্তু এই রাতের পর থেকে এ-টুকুর হদিস দেবার সুযোগও হয়তো আর থাকবে না। কারণ কাল সকাল থেকেই আমরা গর-ঠিকানার পথ-যাত্রী। কল্যাণীর বিবেচনায় যে-পথের শেষ মনের ঘরে। লোকে বলে কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। আমার হয়েছে কর্ত্রীর ইচ্ছেয় কর্ম।

কয়েক জায়গায় ঘুরে মাস দেড়েক হলো এখানে এসেছি। কল্যাণীর পিছু টান নেই, কিন্তু শীতের ভয়ে আমার শরীরের জন্য চিন্তা আছে। হঠাৎ বেশি শীত এখন আর তেমন বরদাস্ত করতে পারি না। তাই এখানে এসে সাময়িক বিরতি। কল্যাণীর দৃঢ় বিশ্বাস, আস্তে আস্তে সইয়ে নিতে পারলে আমার এই দেহটাকেই সে আবার পঞ্চ-তপ অথবা তাপ সহনযোগ্য করে তুলতে পারবে।

তপুর অমন ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটা বাঁচল না। লিউকিমিয়া হয়েছিল। বকুল আর রিনা ভেবেছিল আমরা গিয়ে অসাধ্য-সাধন করতে পারব। কিন্তু ঘটনার সাজ তো আমরা সাজাই না আর যা করার করেও অন্য কেউ—আমাদের ক্ষমতা কতটুকু বলুন তো? তবু প্রাণ-পণ চেষ্টা আমি করেছিলাম, কল্যাণীর চেষ্টার রীতি জানি না—কিন্তু এ-টুকু জানি চেষ্টা সে-ও করেছিল। কিন্তু যা হবার হয়েই গেল। মাঝখান থেকে যে-টুকু জানি বলে গর্ব সেটাই বেদনার কারণ হয়ে উঠল। আপনার মনে আছে, তপুর কপাল আর হাত দেখে দেখে আমার মনে হয়েছিল, শুধু কারো বিয়োগজনিত একটা শোকের চিহ্ন ছাড়া ভবিষ্যত জীবনে ওর আর দুর্দৈর্ব কিছু নেই। · তখন ভাবি নি, কিন্তু মুনিয়ার অসুখের খবর পেয়ে এখানে এসে স্পষ্ট বুঝলাম তপুর কপালে আর হাতে কোন্ শোকের চিহ্ন। তখন কেবলই মনে হলো, আমাদের আগে থেকে এই জানার শক্তিটা অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। যে সাজায় যে ঘটায় আগে ভাগে এই জানাটা যে তার অভিপ্রেত নয়, এ নিজের বুকের তলার যন্ত্রণা দিয়ে যেমন বুঝেছি তেমন আর কখনো বুঝি নি। যাক, মন খারাপ করবেন না, আমার বিদ্যার এটুকুই সান্ত্বনা যে আমি এ-ও জানি, আবারও ওদের ছেলেমেয়ে হবে—ওরা সুখে থাকবে।

…আচ্ছা মনের ঘরটা কি ব্যাপার বলুন তো মশাই? কোন্নগরে থাকতেও কল্যাণী প্রায়ই তাগিদ দিত, এবারে মনের ঘরের দিকে পা-বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত হও, আর

বেশিদিন না কিন্তু। আমি ভেবে পাই নি সেটা কোন্ দিকে কোন্ পথে। এই পৃথিবী তার আকাশ বাতাস ফুল ফল জল মাটি—আমার তো খুব ভালো লাগে। এখান থেকে আরো ভালো মনের ঘর আর কোথায় পাব? কল্যাণী হাসে, বলে, ওই যে সব-সময় তোমার এক খোঁজ—কে ঘটায় কে সাজায় কে করে—তাঁর হদিশ পেতে হলে তোমাকে সব-দিক ছেড়ে ওই মনের ঘরের দিকে পা বাড়াতে হবে। ওই মনের ঘরই শক্তির ঘর। সব-কিছুর কলকাঠি ওখান থেকেই নড়ে। হয়তো হবে। আমি জানি না বুঝি না এমন ব্যাপারের কি লেখাজোখা আছে? ভাবি, আমার মহাভৈরব গুরু কংকালমালী কি সেই ঘরের দিকেই পা বাড়িয়েছেন? ভৈরবী মা মহামায়া কি সেই ঘরের দিকেই পা বাড়িয়েছেন? হবে বা। শক্তির টান শক্তি বোঝে। ভৈরব-গুরুর মধ্যে এক-রকমের দুর্বোধ্য শক্তি। ভৈরবী মায়ের মধ্যেও দেখেছি। কল্যাণীর মধ্যেও যে দেখেছি আমার ঈর্ষাকাতর সত্তা অনেক—অনেক দিন পর্যন্ত তা স্বীকার করতে চায়নি। আর অস্বীকার করি না। ওর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছি। তাইতেই ভারী শান্তি। ও যদি আরো বড় শক্তির হদিস আমাকে দিতে পারে, দোসর হয়ে সেই মনের ঘরের দিকে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আমার পা বাড়াতে আপত্তি কি? আরো লেখা কল্যাণীর ভাষায় পিছু-টানের মতো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। এখানেই থামলাম। ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। আপনাদের—কালীকিংকর অবধূত।

....সমাপ্ত